উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্য্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স: বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (মেজর কোর্স)

কোর্সের শিরোনাম: ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

কোর্স কোড: 6CC-BG-04

প্রথম মুদ্রণ: মার্চ, ২০২৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission-Distance Education Bureau

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম
(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স: বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (মেজর কোর্স)

কোর্সের শিরোনাম: ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

কোর্স কোড: 6CC-BG-04

মডিউল : ১, ২, ৩, ৪

Module : 1, 2, 3, 4

কোর্স বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (মেজর)	কোর্স লেখক Course Writer	কোর্স সম্পাদনা Course Editor
মডিউল : ১ Module : 1 মডিউল : ২ Module : 2	**ড. দিলীপকুমার নাহা** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বারাসাত সরকারী কলেজ	**ড. নীহারকান্তি মণ্ডল** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুরলীধর গার্লস কলেজ
মডিউল : ৩ Module : 3	**ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	
মডিউল : ৪ Module : 4	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য** সহযোগী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	**অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল** বিভাগীয় প্রাধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ফরম্যাট এডিটিং

গীতশ্রী সরকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপিকা, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ড. প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
সায়নদীপ ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অন্যন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (NBG)
ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

কোর কোর্স : 6CC-BG-04
মডিউল : ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

মডিউল ১ : বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন

একক ১	ভাষা	9
একক ২	ভাষাবংশ	15
একক ৩	ভাষাতত্ত্ব	23
একক ৪	বাংলা লিপির উদ্ভব	31
একক ৫	বাংলা লিপির বিবর্তন	38

মডিউল ২ : ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব

একক ৬	ধ্বনিতত্ত্ব	47
একক ৭	বাংলা ধ্বনির পরিচয়	52
একক ৮	ধ্বনিপরিবর্তন	64
একক ৯	শব্দার্থতত্ত্ব	79
একক ১০	শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ ও ধারা	83
একক ১১	বাংলা শব্দের রূপতত্ত্ব	90
একক ১২	বাংলা পদগঠন প্রক্রিয়া	99

মডিউল ৩ : ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ

একক ১৩	বচন, লিঙ্গ	117
একক ১৪	পুরুষ	130
একক ১৫	কারক ও বিভক্তি	133
একক ১৬	বাক্যগঠন	140
একক ১৭	বাংলা বানান	144

মডিউল ৪ : সম্পাদনা ও প্রতিবেদন রচনা

একক ১৮	সম্পাদনা	159
একক ১৯	সম্পাদনার নীতি	166
একক ২০	অঙ্গসজ্জা	178
একক ২১	সাংবাদিকতা	186
একক ২২	প্রতিবেদন	199
একক ২৩	প্রতিবেদন রচনা	210

মডিউল ১

ভাষা, ভাষাবংশ, ভাষাতত্ত্ব, বাংলা লিপির উদ্ভব, বাংলা লিপির বিবর্তন

একক ১ ❑ ভাষা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ভাষার স্বরূপ

১.৪ ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

১.৫ সারসংক্ষেপ

১.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে জানা যাবে:

- ভাষা বলতে কী বোঝায়, ভাষার স্বরূপ কী?
- ভাষার জন্ম কীভাবে হয়েছে?
- মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মুখ থেকে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টিকে কেন ভাষা বলা যায় না?
- ভাষার বিভিন্ন বিশেষত্বের কথা।

১.২ প্রস্তাবনা

ভাষা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের শেষ নেই। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কাজে বাগ্‌ধ্বনি হয়ে উঠেছে মানুষের সর্বপ্রধান মাধ্যম। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহায় ভাষা। পৃথিবীর অন্য প্রাণীকুলের সঙ্গে মানুষের প্রধান পার্থক্য গড়ে দিয়েছে ভাষা।

আমরা বর্তমান এককে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর বক্তব্যের আলোকে ভাষার স্বরূপ সন্ধান করব।

১.৩ ভাষার স্বরূপ

জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে মুখের ভাষার সঙ্গে মানুষের অচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে যখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন গড়ে তুলছে, তখন থেকেই ভাষা তার কাছে পারস্পরিক ভাব-সম্বন্ধ রচনার সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়েছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে দেশ-কাল-জাতি নির্বিশেষে সব মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যা, পারিবারিক সম্বন্ধ, সামাজিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক চিন্তা-মনন, হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ভাষা। আমাদের

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষা এক অপরিহার্য উপাদান। জীবনের প্রয়োজনে ভাষার সৃষ্টি; আবার বলা চলে, জীবন থেকে রস সংগ্রহ করেই ভাষার যাবতীয় বিকাশ ও পরিপুষ্টি-সাধন।

বিবর্তনের ধারায় মানুষ ও প্রাণীকুলের সঙ্গে প্রথম ও প্রধান পার্থক্য গড়ে দিয়েছে কে? উত্তর হল— ভাষা। ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস হকেট স্পষ্টভাবেই এই কথাটি জানিয়েছেন, "ভাষা হলো মানুষের এমন এক অভিজ্ঞান যা অন্য প্রাণী থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।" পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশের ধারায় শুধু এই বিশেষ অভিজ্ঞানের কারণে মানুষ আজ সবাইকে অনেক পেছনে ফেলে গৌরবের শিখরে পৌঁছে গেছে।

১.৪ ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ভাষা কী? ভাষা কাকে বলে?— মানুষের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে। সাধ্যমতো মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে। আধুনিককালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার বিজ্ঞানসম্মত স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

ভাষাবিজ্ঞানী Edger H. Sturtevant ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে: "A language is a system of arbitary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact."

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার একটি সুচিন্তিত, সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হল— "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।"

ভাষার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষের পারস্পরিক ভাববিনিময় ও সহযোগিতার প্রয়োজন মেটাতে হয় ভাষাকে কেন্দ্রকরে। সমাজ বা সমষ্টি-জীবনের বাইরে ভাষার অস্তিত্ব নেই। ড. রামেশ্বর শ'-এর কথায় বলা যায় যে, "সমাজ থেকে আজন্ম বিচ্ছিন্ন একক মানুষ কোনো ভাষা শিক্ষা বা সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, যদিও ভাষা ব্যক্তিমানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত হয়, তবু সামাজিক উপযোগিতাই ভাষার পরোক্ষ স্রষ্টা।" সমাজের পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে বলেই পৃথিবীর এক-এক জনসমাজে এক-এক ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

ভাষা মানুষের সহজাত সম্পদ নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়ার মতো মানুষের মুখে ভাষার বিকাশ ঘটে না। ভাষা-ব্যবহারকারী মানুষের সংসর্গে থেকে, অনুকরণের চিরন্তন প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিশুকে একটু একটু করে ভাষা তথা বাগ্‌ব্যবহার রপ্ত করতে হয়। দেখা গেছে মনুষ্য সমাজের বাইরে নির্জন কোনো স্থানে, মুখে ভাষা ফোটার আগেই কোনো শিশুকে যদি রেখে দেওয়া হয় যেখানে

মানুষ নেই, মানুষের বাগ্ব্যবহার নেই, ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনও নেই, তবে শিশুটির বাগ্যন্ত্রের গঠন অসম্পূর্ণ থাকবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই সে ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে না। এক আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। মানব সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মানব শিশু গভীর অরণ্যে এক বাঘের দ্বারা লালিত-পালিত হয়। দীর্ঘদিন এরূপ অবস্থায় তার জীবন কাটে। যখন তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তখন দেখা যায়, দীর্ঘকাল বাঘের সংস্রবে থেকে সে বাঘের মতোই আওয়াজ করতে শিখেছিল, কিন্তু মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত না। এই ঘটনা বুঝিয়ে দেয় যে, মানব-শরীরে জন্ম থেকেই বাগ্যন্ত্র ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যথাবিধি থাকলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলি অর্থবহ ভাষার সৃষ্টি করতে পারে না। ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। জন্মের পর পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রভাবে ও অন্য মানুষের কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি শুনে শুনে শিশু অনুকরণের দ্বারা নিজের বাগ্যন্ত্রের ব্যবহার-বৈচিত্র্য শেখে।

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল 'Poetics' নামক গ্রন্থে 'মাইমেসিস' বা অনুকরণ তত্ত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তাঁর মতে, শৈশবকাল থেকে মানুষ অনুকরণের মধ্যে দিয়েই শেখে। "He is the most imitative creature in the world." মানুষই পৃথিবীর প্রধান অনুকরণশীল প্রাণী। সব শিল্প ও সাহিত্য অনুকরণের ফল। অ্যারিস্টটলের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, মানুষের মুখের ভাষাও একান্তভাবে অনুকরণের ফসল। ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পৈতৃক সম্পদ নয়, যে জন্মের পর আপনা থেকেই সে মানুষের অধিকারে চলে আসবে। যে-ভাষার পরিমণ্ডলে শিশু বড় হবে, সেই ভাষার শব্দ-ধ্বনিকেই সে আয়ত্ত করতে থাকবে, তার বাগ্যন্ত্রও সেই চাহিদা পূরণের উপযোগী হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'র কথাই ধরা যাক। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা আসলে আইরিশ পিতা-মাতার সন্তান। জন্মের পরই বাঙালি পরিবারে কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীর কোলে গোরা প্রতিপালিত হতে থাকে। আর দশজন বঙ্গভাষীর মতো বাংলা ভাষাই হয়ে উঠেছিল তার মাতৃভাষা। আইরিশ পিতামাতার সন্তান হওয়ার কারণে সে ছোটবেলা থেকে আইরিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করেনি, বা তার কথিত বাংলায় আইরিশ উচ্চারণের বিশেষত্বও দেখা দেয়নি। পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের অনিবার্য প্রভাবে গোরা বাংলা ভাষার অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে যদি নিজের আইরিশ পিতা-মাতার কাছে মানুষ হত বা ভিন্ন ভাষার পারিবারিক পরিমণ্ডল পেত, তবে ফল অন্য রূপ হত। এ থেকেই বোঝা যায়, ভাষা মানুষের সহজাত সম্পদ নয়, ভাষা সম্পূর্ণ ভাবেই এক অর্জিত সম্পদ। বাগ্যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথ ব্যবহার করে অনুকরণের মধ্য দিয়ে ছোটবেলা থেকে মানুষ বাগ্ধ্বনি সৃষ্টি করতে শেখে।

মানুষ মননশীল প্রাণী। চিন্তাবৃত্তি ও মননশীলতার সঙ্গে ভাষার অভিন্ন সম্বন্ধের কথা হাজার হাজার বছর আগেও অনেক মনীষী আলোচনা করেছেন। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো মন্তব্য করেছেন : "thought is the same language"। চিন্তা ও ভাষার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ যে, "thought

is the conversation of the soul with herself which takes place without voices." অর্থাৎ চিন্তা হল আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন। চিন্তার সঙ্গে ভাষার প্রভেদ এই যে, "while the stream which, accompanied by sound, flows from thought through the lips, is called language." অর্থাৎ যখন চিন্তা-প্রবাহ ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন তা হয়ে ওঠে ভাষা।

প্রকাশ-মাধ্যম রূপে ভাষার অতুলনীয় গুরুত্ব প্রসঙ্গে সকল ভাষাবিজ্ঞানীই ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে ড. রামেশ্বর শ'-এর মন্তব্য স্মরণযোগ্য: তিনি বলেন "বিবর্তনের ধারায় প্রথমে জড়ের বিকাশ, জড়ের পর প্রাণ, প্রাণের পর মন। এই মনের বিকাশ মানেই মানুষের জন্ম। যে মন মানুষের অনন্যসুলভ সম্পদ সেই মনের ত্রিধা বৃত্তি—চিন্তা (thinking), সঙ্কল্প (willing), অনুভব (feeling)। মনের এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে ত্রিবিধ ক্রিয়ায়—জ্ঞানান্বেষণ, কর্মসাধনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি। ত্রিবিধ সাধনায় তার যে প্রাপ্তি তাকে সে যখন অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিতে চায় তখন নানাবিধ প্রকাশ-মাধ্যম (medium) সে অবলম্বন করে; ভাষা তার অন্যতম প্রকাশমাধ্যম।"

ভাষার নানা মৌলিক বিশেষত্বের কথা ভাষাবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনিমাত্রই ভাষা পদবাচ্য নয়। পাগলের অর্থহীন প্রলাপ বা শিশুর খামখেয়ালি অস্ফুট ধ্বনিসমষ্টি ভাষা নয়। উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে অর্থদ্যোতনা থাকা প্রয়োজন। ভাষাবিজ্ঞানীরা নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন—প্রতীকধর্মিতা ভাষার এক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।

ধরা যাক, 'গাছ' শব্দটি। এই শব্দে যে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি রয়েছে সেগুলি পৃথক ভাবে উচ্চারণ করে বা বিশ্লেষণ করে শ্রোতার সামনে 'গাছ'-এর বোধ তৈরি করা যাবে না। বাংলাভাষী মানুষের কাছে 'গাছ' ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারণ হওয়া মাত্র 'গাছ' এর রূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভিন্নভাষী মানুষের কাছে 'গাছ' কোনো বোধই তৈরি করবে না। ধ্বনির এই প্রতীকধর্মিতার দিকটা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘকাল কোনো শব্দ বহু মানুষ দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে হয়ে সুনির্দিষ্ট অর্থ দ্যোতনালাভ করে। এক সময় হয়তো খেয়াল খুশির ওপর ভিত্তি করে শব্দের অস্পষ্ট অর্থ সূচিত হয়েছিল, কিন্তু পরে তা স্পষ্ট রূপ পেয়ে যায়।

ড. সুকুমার সেন 'মানুষ' শব্দটির প্রতীক মূল্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যেই ভাষা বিষয়কে ব্যক্ত ও ভাবকে প্রস্ফুটিত করে। বিশেষ বিশেষ অর্থবান ধ্বনিসমষ্টি (অর্থাৎ শব্দ) বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ও ভাবেরই প্রতিনিধি, সেই সেই ধ্বনিসমষ্টির নয়। অর্থাৎ 'মানুষ' বলিলে আমরা 'ম + আ + ন্ + উ + ষ্' এই ধ্বনিসমষ্টি বুঝি না, বুঝি এই সমগ্র ধ্বনিসমষ্টির দ্বারা মানে উদ্বোধিত নির্দিষ্ট বিশেষ-রূপগুণসম্পন্ন প্রাণী অর্থাৎ একটি প্রস্ফুট ও সুনির্দিষ্ট বিষয়। অতএব ধ্বন্যাত্মক প্রতীকদ্যোতনাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ।"

কোনো শব্দ কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত হতে হতে নির্দিষ্ট প্রতীকদ্যোতনা লাভ করে থাকে। পরে ভিন্নভাষী মানুষের মধ্যেও তা গৃহীত হয়ে যায়। ইংরেজি 'ক্যুইজ' (Quiz) শব্দ এক সময় খামখেয়াল-বশত এক নাট্যকর্মী দ্বারা চালু হয়েছিল ডাবলিন শহরে, কোনো স্পষ্ট অর্থ ছাড়াই। এই ধ্বনিদ্যোতনার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ ছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে শব্দটি জনপ্রিয় হয় ও নির্দিষ্ট অর্থদ্যোতনাও লাভ করে।

মনুষ্যেতর প্রাণী মুখে নানা শব্দ করে, ডাকে, চিৎকার করে, পাখায় শব্দ তুলে অন্য প্রাণীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এই সব ধ্বনি ও ইঙ্গিত ভাষা-পদবাচ্য নয়। কারণ এদের মুখে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে প্রতীকদ্যোতনার অভাব। তাই শিশুর শব্দ অর্থহীন অভিব্যক্তি।

ড. সুকুমার সেন বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে: "ব্যক্ত বাক্—ভাষা—ভাষা-এ নয়, কেন না এখানে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির প্রতীকদ্যোতনা নাই। গৃহপালিত পশুর শব্দবোধ সেই মননহীন অভ্যাস হইতে লব্ধ যাহাকে মনোবিজ্ঞানে বলে কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্‌স। ইতরপ্রাণীর ডাক স্নায়বিক উত্তেজনার যান্ত্রিক অ-বোধ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মানুষের কণ্ঠধ্বনি স-বোধ উদ্যম। বিশেষ বিশেষ অর্থদ্যোতনা করিতে মানুষ বিশেষ বিশেষ ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে। ভাষার বিশেষ বিশেষ ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অর্থের নিত্যসম্বন্ধ আছে। ইতরপ্রাণীর ডাকে এমন বিশ্লেষণ চলে না।"

ভাষার স্বরূপ আলোচনায় আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, ভাষার প্রথম ও প্রধান রূপ—মৌখিক রূপ। ভাষার মৌখিক রূপটি প্রতিনিয়ত বিকাশ ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজের রূপ বদল করে চলেছে। সভ্যতার পথে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মৌখিক ভাষার দৃশ্যরূপ রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছে ও ভাষার স্থায়িত্বদানের কথা ভেবেছে। এভাবে কালের বিবর্তনের পথ বেয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে মৌখিক ভাষার লিখিত রূপ। জন্ম নিয়েছে লিপি। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, পৃথিবীতে এখনও অনেক ভাষা রয়েছে মৌখিক রূপের মধ্যেই আবদ্ধ—লিখিত রূপ তথা লিপির ব্যবহার এখনও দেখা দেয়নি। আবার অনেক ভাষা আছে যাদের নিজস্ব লিপি নেই, অন্য ভাষার লিপির ওপর নির্ভর করে লেখালেখির কাজ চলে। ভাষার আলোচনায় মৌখিক ও লিখিত দুটি রূপই গুরুত্ব পায়। অবশ্য মৌখিক রূপের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ভাষার আলোচনায় আমাদের এও মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা কোনো নির্দিষ্ট অংকে বাঁধা সম্ভব নয়। বর্তমানে পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা সাত হাজারের সামান্য বেশি। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বুকে যেমন অনেক নতুন ভাষা জন্ম নিয়েছে, তেমনি অনেক ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখনো অনেক ভাষার অকাল মৃত্যু ঘটে চলেছে। এর পেছনে রয়েছে নানা আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতা।

❑ ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

ভাষার বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে নির্দেশ করা যেতে পারে:

১. মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

২. ভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে বা জন্মসূত্রে পাওয়া সম্পদ নয়। ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সম্পদে আমাদের যেমন স্বাভাবিক অধিকার জন্মায়, ভাষায় তা নয়, চেষ্টা করে বাগ্‌যন্ত্রকে ব্যবহার করে ভাষা আয়ত্ত করতে হয়।

৩. ভাষা অবশ্য এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution)। সামাজিক পরিবেশ ও বহু মানুষের সংস্রব-বন্ধনের মধ্যে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ। সমাজ না থাকলে ভাষার প্রয়োজন হত না। একা মানুষের ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন হয় না, তাই সেক্ষেত্রে ভাষারও প্রয়োজন নেই।

৪. ভাষা নিছক শারীরবৃত্তীয় ঘটনা নয়, মানুষের চিন্তা-চেতনা-মনন-অনুভূতির প্রকাশের সঙ্গে ভাষার গভীর যোগ। ভাষা না এলে মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব হত না।

৫. ভাষার বড় বৈশিষ্ট্য ধ্বন্যারূঢ় প্রতীক-দ্যোতনা।

৬. ভাষার অন্য এক বিশেষত্ব প্রবাহমানতা ও বিকাশশীলতা।

১.৫ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা ভাষার উৎপত্তি, ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস, ভাষা বিবর্তনের দারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ভাষার সংজ্ঞা এবং ভাষার স্বরূপ প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিকদের ভাবনা, বহুমাত্রিক মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

একক ২ ❑ ভাষাবংশ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ভাষাবংশ: মূল বিষয়

২.৪ সারসংক্ষেপ

২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার প্রাচীন ইতিহাস ও উৎস সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের ধারণা।
- ভাষার বংশবৃদ্ধি কীভাবে হয়।
- প্রাচীন ভাষাবংশের আনুমানিক সংখ্যা।
- ভারতে প্রচলিত প্রাচীন ভাষাবংশ কোন্‌গুলি।
- বাংলা ভাষা কোন্ ভাষাবংশ থেকে কীভাবে এসেছে।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের পরিচয়।

২.২ প্রস্তাবনা

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিবৃত্ত সন্ধান। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও জনসমষ্টির মধ্যে এক-একটি ভাষার জন্ম সূচিত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বহু ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা জাতি-গোষ্ঠীর সংঘাত ও সমন্বয়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রাচীন ভাষা বংশগুলির বিবর্তন ঘটেছে। অনেক ভাষা-গবেষকগণ সেই সব ভাষার কুষ্ঠী-ঠিকুজী, গোত্র-কুল বিচার করে এদের নানা শ্রেণিতে বা বংশে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রতিটি ভাষার আদি বংশধারার পরিচয়, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানা জরুরি। কবে কোথায় কোন্ ভাষা থেকে সেই ভাষার উদ্ভব ঘটেছে এবং কোন্ কোন্ ভাষার সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে, এই ইতিহাস না জানলে সেই ভাষা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। ভাষাবিদ্যাচর্চার অন্যতম দিক—প্রাচীন ভাষাবংশের আলোচনা। এবার এই বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক।

এই একক-এ আমরা পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করব।

২.৩ ভাষাবংশ: মূল বিষয়

প্রাচীন ভাষাবংশ:

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশসমূহের পরিচয়-উদ্ধার ও এদের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। বর্তমান পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যাপ্রায় সাত হাজার এর কিছু বেশি। এই বিরাট সংখ্যক ভাষা হাজার হাজার বছর ধরে নানা জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের মুখে নানা বৈচিত্র্য, সংমিশ্রণ ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। আদি জননীরূপা প্রাচীন ভাষাগুলি আজ আর নেই, এদের বংশধারাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তবে অনেক মানব জাতি-গোষ্ঠী যেমন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, একাধিক ভাষাবংশধারাও নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার মুখে পড়ে লুপ্ত হয়ে গেছে বলে ঐতিহাসিকদের স্থির ধারণা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুদূর অতীতে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল, বংশবৃদ্ধির জৈবিক নিয়মে এই সংখ্যা একালে বহুগুণিত হয়েছে। বিবর্তনের পথে ভাষা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে, নতুন নতুন ভাষা সৃষ্টি করেছে।

পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি ভাষার উদ্ভবের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধানে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা তৎপর। একই সঙ্গে তাঁরা একাধিক ভাষার উপাদানকে তুলনাত্মক দৃষ্টিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দিকগুলি নির্ণয় করেন। এইভাবে তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক রীতি-পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে পৃথিবীর ভাষাসমূহের আদি উৎস নির্ণয়ের কাজ চলে। এই আদি উৎসগুলিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ। এরাই সব ভাষার জননী-রূপা।

ষোড়শ শতক থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষার কালগত বিবর্তন ও আদি উৎস সম্পর্কে কৌতূহলী হন। এই সময় বহু ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসে সংস্কৃত ভাষা চর্চা করতে গিয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে একাধিক ইউরোপীয় ও ইরান-দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডারের মিল দেখে আশ্চর্য হন। এঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, পৃথক ভূখণ্ড থাকা সত্ত্বেও এই ভাষাগুলির মধ্যে এত সাদৃশ্যের রহস্য কী? এগুলি কি তবে প্রাচীন কালে কোনো এক নির্দিষ্ট উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে—বংশ-পরম্পরায় আশ্চর্যভাবে সাদৃশ্যের চিহ্নসমূহ এখনও বজায় আছে? তাই ইতিহাসের গর্ভে থাকা সেই উৎস ভাষাটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন জরুরি।

ভাষা সম্পর্কে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সূচিত হয় ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব গবেষণার কাজ। এই জাতীয় গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ স্যার উইলিয়াম জোন্‌স (Sir William Jones)। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই আলোচনায় তিনি বহু তথ্য সহযোগে ভারত ও ইউরোপ ভূখণ্ডের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, গ্রিক ও ল্যাটিন) নিয়ে আলোচনা করেন। এই

ভাষাগুলির মধ্যবর্তী নানা সাদৃশ্যের লক্ষণ ব্যাখ্যা করে তিনি এগুলির কোনো এক সাধারণ উৎস (a common source) সম্পর্কে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। কিন্তু কী সেই সাধারণ উৎস? জোন্‌স সাহেব তা স্পষ্ট করতে পারেননি। পরবর্তীকালে উক্ত ভাষাসমূহের প্রাচীন উৎস নির্ধারিত হয়----যার নাম 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ' (কেউ কেউ বলেন ইন্দো-জার্মানিক)। ইউরোপ ও ভারতের বিস্তীর্ণ সীমায় ছড়িয়ে থাকার কারণে এই ভাষাবংশের এরূপ নামকরণ হয়। শুধু ইউরোপ ও ভারত নয়, মধ্যবর্তী ইরান বা পারস্য সাম্রাজ্যেও এই ভাষাবংশের বিস্তার ঘটেছে।

সাদৃশ্যের উপাদান সামনে রেখে বিভিন্ন ভাষায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের গুরুত্ব বিষয়ে সব ভাষাবিজ্ঞানী একমত। এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে: "একই পর্যায়ের কিংবা স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দকোষে যথেষ্ট সাম্য এবং ব্যাকরণে যথোপযুক্ত মিল দেখা যায়, অথবা একাধিক ভাষার পূর্বতন রূপ যদি একই প্রকারের হয়, তবে সেই সেই ভাষার মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক থাকিবেই। ইহা ভাষাবিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত-সূত্র।"

এই উক্তির সত্যতা পৃথিবীর সব ভাষা ও ভাষা-পরিবারের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। উপাদানগত ও ব্যাকরণগত সমতার দিকে লক্ষ রেখে ভাষাতাত্ত্বিকগণ নিশ্চিত যে, ভৌগোলিক অবস্থান যাই হোক না কেন সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক, প্রাচীন গ্রিক, প্রাচীন জার্মানিক, ল্যাটিন, আর্মানীয় প্রভৃতি ভাষা একই ভাষাবংশের সন্তান-সন্ততি।

ভাষা-গবেষকগণ গুরুত্ব দিয়েছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বহু সহস্র ভাষার মূল উৎস তথা প্রাচীন ভাষাবংশ খোঁজার কাজকে। শুধু জীবন্ত ভাষা নয়, অসংখ্য মৃত তথা লুপ্ত ভাষার কুষ্ঠিঠিকুজী উদ্ধারের জটিল দুরূহ গবেষণার মধ্য দিয়ে বিগত প্রায় দু'শ বছরের গবেষণায় প্রাচীন ভাষাবংশের পরিচয় অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে। তবে বিস্তারিত তথ্যের অভাবে পৃথিবীর সব প্রাচীন ভাষাবংশের ঠিক সংখ্যা নির্ণয় ও পরিচয়দান এখনও পণ্ডিতদের সাধ্য ও সীমার বাইরে। এই কাজ খুব সহজ নয়। গবেষকদের মধ্যে মত-মতান্তরেরও শেষ নেই।

- **ভাষার বংশবৃদ্ধি কেন হয়, কীভাবে?**

হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন মহাদেশে এই প্রাচীন ভাষাবংশগুলির কালানুক্রমিক পরিবর্তন ঘটেছে ও নানা পর্যায়ে বহু ভাষার জন্ম হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, কেন এমন ঘটে থাকে? এর উত্তরে বলা যায়, যখন কোনো ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী সংখ্যায় বেড়ে যায়, তখন জীবিকার প্রয়োজনে, প্রকৃতির কারণে বা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের কারণে সেই ভাষা-ব্যবহারকারী মানুষেরা নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্থানকালগত ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতার অমোঘ নিয়মে তখন এদের মূল ভাষাটি একাধিক উপভাষা সৃষ্টি করে। পরে উপভাষা রূপ নেয় এক স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাষায়। বহু বছরের ব্যবধানে সেই সব ভাষা আবার

নতুন ভাষার জন্ম দেয়। ভাষার শাখা-প্রশাখা বিস্তারের এই কাহিনির মধ্যে মানব-জাতিগোষ্ঠীর বিকাশ-বিবর্তন-সংমিশ্রণের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে।

মানুষের ক্ষেত্রে যেভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। বর্তমান পৃথিবীর বহু সহস্র ভাষার আদি উৎস খুঁজতে গেলে দেশ ও কালের সীমানা পেরিয়ে অতীত ইতিহাসের অল্প কিছু ভাষা-পরিবারের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছতে হয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রায়-হারিয়ে-যাওয়া ইতিহাসের মধ্যে আত্মীয়তার চিহ্নগুলি খুঁজে বের করেন ও এদের বংশধারা নির্বাচন করেন।

একটি নমুনা দেখা যাক। ধরা যাক, বাংলা ভাষার 'মা' শব্দ। এই অর্থে পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃতে 'মাতৃ', গ্রিক Mitera, ওলন্দাজি ভাষায় 'Moeder' জার্মানিতে 'Mutter' ইতালিয় ভাষায় 'Madre', আইরিশ Mathair ইত্যাদি। সাদৃশ্যপূর্ণ এমন বহু শব্দের ওপর নির্ভর করে ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করতেই পারেন যে, এই ভাষাগুলির মূল উৎস এক। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান এভাবে ভাষাবংশ ও এদের থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ভাষার বিবর্তনের পথরেখার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করে।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে জীবন্ত ও লুপ্ত উভয়ের হিসেব ধরে পৃথিবীতে প্রাচীন ভাষাবংশের সংখ্যায় আনুমানিক সংখ্যা দেড়শ। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ভাষাবংশ হলো :

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ২। সেমীয়-হামীয় ৩। বাণ্টু ৪। ককেশীয় ৫। ফিন্নো-উগ্রীয় ৬। দ্রাবিড় ৭। অস্ট্রিক ৮। ভোট-চীনীয় ৯। এস্কিমো ১০। তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু ১১। আন্দামানী ১২। কোরীয়-জাপানি ১৩। অস্ট্রেলীয় ১৪। তাসমানীয়।

উক্ত তালিকা ছাড়াও অনেক ভাষার কথা জানা যায় যাদের ঠিক বংশ পরিচয় এখনো নির্ণীত হয়নি। নীচে সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাষাবংশের পরিচয় দেওয়া হল—

- **ভারতে প্রচলিত প্রাচীন ভাষাবংশ:**

ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বহুধা বৈচিত্র্য ও সংখ্যাগত প্রাচুর্য লক্ষ করার মতো। এর মূলে আছে প্রাচীনকাল থেকে একাধিক ভাষাবংশের উপস্থিতি। উল্লেখযোগ্য মোট চারটি ভাষাবংশ রয়েছে এদেশে। নিঃসন্দেহে এটি এক বিরল ঘটনা। এখানকার ভাষাবংশগুলি হল: ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রিক ও ভোট-চীনীয়।

● **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ:** প্রাচীন ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক একে ইন্দো-জার্মানিক বা সংক্ষেপে আর্য ভাষাবংশ বলেও চিহ্নিত করেন। বাংলাভাষী মানুষের কাছে এই ভাষাবংশের ভিন্ন গুরুত্ব রয়েছে। অনেক ভারতীয় ভাষার মতো বাংলার আদি জননী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ।

এই ভাষাবংশ-থেকে-সৃষ্ট ভাষাসমূহ ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এই ভাষাবংশের জনগোষ্ঠীই বর্তমান মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকার। সংস্কৃত, গ্রিক, ইংরেজি, ফারসি, আইরিশ, ল্যাটিন প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষা এই ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকেও এই ভাষা-পরিবারের গৌরব লক্ষণীয়। বিগত প্রায় পাঁচ হাজার বছরে এই ভাষা-পরিবারের বংশধরগণ পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে। এমন কোনো মহাদেশ নেই যেখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত কোনো-না-কোনো ভাষা ব্যবহারকারী মানুষজন নেই।

ব্যবহারকারী জনসংখ্যার বিচারেও এই ভাষাবংশ অন্যান্য ভাষাবংশকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ এই ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত কোনো-না-কোনো ভাষা ব্যবহার করেন। বর্তমানে ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩২৪ কোটি। একালের প্রায় সাড়ে চারশ ভাষা এই বংশের অন্তর্গত।

ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্য এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই ভাষাবংশের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় ভাষাতাত্ত্বিক নির্দশন, বিশেষ করে লেখ্য-নিদর্শন ও সাহিত্যগত উপাদান সুপ্রচুর। ফলে গবেষণা ও আলোচনার ক্ষেত্র অনেক সমৃদ্ধ।

- **দ্রাবিড়ীয় (Dravidian) ভাষাবংশ:** দক্ষিণ ভারতে এই ভাষাবংশের বিস্তার। একালের প্রায় ৭০টি ভাষা এর অন্তর্গত। এদের মধ্যে প্রধান তামিল, তেলেগু, মালায়লম, কানাড়া ইত্যাদি। প্রায় ২২ কোটি মানুষ এই ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত। দ্রাবিড় ভাষার বিস্তার ঘটেছে প্রধানত ভারতের দক্ষিণাঞ্চল। অবশ্য উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরে এই বংশের ভাষা প্রচলিত রয়েছে। ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কায় ও বালুচিস্তানে এই বংশের বিস্তার ঘটেছে। বালুচিস্তানের পার্বত্য-অঞ্চলে-কথিত একটি ভাষা ব্রাহুই (Brahui) দ্রাবিড় বংশের অন্তর্ভুক্ত বলে ভাষাবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন। কোন্ অতীতে দক্ষিণ ভারতের কোনো যাযাবর জাতি-গোষ্ঠী ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে সুদূর বালুচিস্তানে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল। এঁদের মুখে ভাষায় এখনো দ্রাবিড়ীয় উপাদান বিদ্যমান। এমন কি মালদা, রাজমহল অঞ্চলের মালপাহাড়ি বা মাল্‌তো ভাষা কানাড়ী ভাষার উপশাখা বলে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর ধারণা।

- **অস্ট্রিক (Austric):** এর প্রধান দুটি শাখা—অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-asiatic) ও অস্ট্রোনেসীয় (Aunesian)। মোন-খ্‌-মের (Mon-kh-mer) ও কোল (kol) প্রথম শাখা থেকে এসেছে। মোন্‌-খ্‌-মের ভাষাবংশের ভাষাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, বার্মা প্রভৃতি স্থানে।

কোল ভাষাবংশের ভাষাগুলি প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে। মেঘালয়ের খাসী ভাষাও এর অন্তর্গত।

অস্ট্রোনেসীয় শাখার ভাষাগুলি প্রচলিত, মালয় দ্বীপপুঞ্জে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে। যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয়, মালয় প্রভৃতি ভাষা এর অন্তর্গত। ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৩ কোটি।

- **ভোট-চীনীয় (Tibeto-chinese):** একাধিক শাখায় এই ভাষাবংশের বিস্তার ঘটেছে। প্রায় চারশ' ভাষা জন্ম নিয়েছে এই বংশ থেকে। বর্তমানে ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি। প্রধান ভাষা চীনীয়, থাই, ভোট-বর্মী। চীনীয় ভাষার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় আনুমানিক ২০০০ খ্রিঃপূর্বাব্দ কালের কিছু প্রত্নলেখে। থাই বা তাই ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে শ্যামী ভাষা। তিব্বতী, বর্মী, বোড়ো, গারো, মিজো প্রভৃতি ভোট-বর্মী শাখার প্রধান উপশাখা। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এই ভাষাবংশের আধিপত্য।

● পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ভাষাবংশ

সেমীয়-হামীয় (Semitic-Hamitic): এই ভাষাবংশের অন্য নাম 'আফ্রো-এশীয়' (Aftro-Asiatic) ভাষাগোষ্ঠী। এর বিস্তার আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল ও এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল জুরে। প্রধান শাখা দুটি—সেমীয় ও হামীয়।

সেমীয় শাখার দুটি উপশাখা। পূর্বী উপশাখা থেকে সৃষ্ট হয় আসীরীয় ও আক্কাদীয় বা বাবিলনীয় ভাষা। আসীরীয় বহুকাল আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। লিপির বিবর্তনের ইতিহাসে সেমীয় ভাষাবংশের অবদান বিদ্যমান। বাণমুখ লিপি এই প্রাচীন সভ্যতার আবিষ্কার। এই ভাষায় কাদার টালি ও পাথরের ওপর খোদাই করা বহু প্রাচীন প্রত্নলেখ পাওয়া গেছে। সময়কাল আনুমানিক ২৫০০ খ্রিঃপূর্বাব্দ। সেমীয় ভাষা পরিবারের দুই গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হল আরবি ও হিব্রু। সেমীয় ভাষাবংশের এক শাখা ক্যানানাইট। এই শাখার প্রধান ভাষা হিব্রু। ইহুদিদের জাতীয় ভাষা খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই জনপ্রিয়। প্রাচীন বাইবেল (Old testament) হিব্রু ভাষাতেই রচিত। এক সময় হিব্রু ভাষা প্রচলিত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগে হিব্রু ভাষা ও সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটে। এই ভাষা বর্তমানে ইজরায়েল-এর রাষ্ট্রভাষা।

হামীয় শাখা থেকে সৃষ্ট হয়েছে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে এই ভাষার প্রাচীন নির্দশন পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয় ভাষাবংশ ও তার শাখা-প্রশাখা বর্তমানে সম্পূর্ণ লুপ্ত। এই ভাষাবংশের প্রধান উত্তরাধিকারী কপ্‌টিক (Coptic) ভাষা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ভাষা রূপে তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে মিশরে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকে আরবি ভাষার আগ্রাসী প্রভাব ও প্রসারের মুখে পড়ে চিরতরে কপ্‌টিক ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বাণ্টু (Bantu): মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় ১০০টি ভাষা এই বংশের অন্তর্গত। ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি। বাণ্টু পরিবারের অন্যতম ভাষা হলো সোয়াহিলি, জুলু, কাফির প্রভৃতি।

ককেশীয় (Caucasian): জর্জিয়ার ভাষা জর্জীয় এই ভাষাবংশের সন্তান।

এস্কিমো (Esquimo): উত্তর মেরুর দেশগুলিতে এস্কিমো ভাষাবংশজাত ভাষাগুলির বিকাশ।

ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। গ্রিনল্যাণ্ড, কানাডা ও আলাস্কায় এদের বসতি। মোট ১১টি ভাষা এই ভাষা বংশ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে ১টি ভাষার মৃত্যুও হয়েছে।

তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (Turk-Mpmgul-Manchu): এই ভাষাবংশের শাখা-প্রশাখা রাশিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী নানা অঞ্চলে; এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ স্থানে ছড়িয়ে আছে। তুর্ক, তাতার, উজবেক, মাঞ্চু প্রভৃতি ভাষা এই বংশের অন্তর্গত।

ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugric): ফিনল্যাণ্ড-এর ফিন্নীয়, হাঙ্গেরির হাঙ্গেরীয় ভাষা এই ভাষাবংশের সন্তান। ইউরোপে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ভাষাগুলি যে অঞ্চলে ছড়ানো তার মাঝখানে ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষাবংশের অবস্থান।

• ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের বিবর্তন ও বাংলা ভাষা:

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ইউরোপের কৃষ্ণসাগর ও ক্যাস্পিয়ান উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ও মধ্য এশিয়ার কিরঘিজ তৃণভূমি অঞ্চলে এক যাযাবর জাতিগোষ্ঠী মানুষের মুখে এই প্রাচীন ভাষাটির ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে এই যাযাবর জনগোষ্ঠী জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অন্য কোনো কারণে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রায় এক হাজার বছর ধরে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের মধ্যে এই ভাষা বংশ থেকে অঞ্চল ভেদে আনুমানিক প্রায় ১০টি ভাষার জন্ম হয়। এরা হল:

গ্রিক, জার্মানিক, ইতালিক, কেলতিক, আর্মানীয়, বালটো-স্লাবিক, হিট্টীয়, তুখারীয় ও ইন্দো-ইরানীয়।

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্যতম বংশধর। কীভাবে নানা পর্যায় পেরিয়ে একালের অন্যতম ভাষা বাংলার জন্ম হয়, সংক্ষেপে সেই ইতিহাস উল্লেখ করা যেতে পারে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে ইন্দো-ইরানীয় শাখা ইউরোপের ভূখণ্ড ছেড়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায় ও দুটি শাখায় বিভক্ত হয়—ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। এরূপ বিভাজনের পেছনে প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকা সম্ভব। প্রথম শাখাটি পশ্চিম দিকে মধ্য প্রাচ্যের অভিমুখে ও দ্বিতীয় শাখাটি সিন্ধু উপত্যকায় বহু বছর অবস্থান করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ধরে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। এরাই ইতিহাসে আর্য জাতি রূপে আখ্যাত হয়েছে। এরা প্রবল মেধা ও মনীষাসম্পন্ন বীর যোদ্ধা। শুধু যুদ্ধবিদ্যায় নয়, ভাষার সম্পদেও ছিলেন এরা বলীয়ান। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থানকালেই এদের হাতে আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের ঋগ্‌বেদ-এর বিশাল মন্ত্রসাহিত্যের প্রাচীন অংশ রচিত হয়। সূচিত হয় বৈদিক সাহিত্য। আর্যদের আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতে নতুন এক সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে। গাঙ্গেয় অববাহিকা ধরে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করতে থাকেন। উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্যসভ্যতার বিকাশ ঘটে। সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী আর্য সভ্যতার সামনে ভারতবর্ষের প্রাচীন অনার্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলে আর্যভাষার ক্রমপ্রসার।

ভারতীয় আর্যভাষার সাড়ে তিন হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা: (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan)। এর সময়কাল খ্রিঃ পূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিঃ পূর্ব ৬০০ অব্দ। (খ) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan)। এর সময়কাল খ্রিঃ পূর্ব ৬০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৯ম শতক। দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ইতিহাসকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রত্ন-প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। মধ্য-ভারতীয় আর্যের প্রচলিত নাম প্রাকৃত ভাষা। অঞ্চলভেদে প্রাকৃতের অনেক রূপ—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী ইত্যাদি। মাগধী প্রাকৃতের বিকাশ পূর্ব ভারতে। (গ) নব্য ভারতীয় আর্য (Neo Indo-Aryan)। এর সময়কাল খ্রিস্টীয় ৯ম শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই সময় থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতের খোলস ছেড়ে ভারতের নানা অঞ্চলে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটতে থাকে। হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, কোঙ্কনী, পূর্বী, পাঞ্জাবি, পশ্চিমা পাঞ্জাবি, রাজস্থানী প্রভৃতি ছাড়াও পূর্ব ভারতে মাগধী প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয় কয়েকটি ভাষা। মাগধী প্রাকৃতের পশ্চিমা শাখার অন্তর্গত—মৈথিলী, মাগবী, ভোজপুরী। এদের কথ্য অঞ্চল মূলত বিহার। আর বঙ্গ, কামরূপ ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাগধী প্রাকৃতের পূর্বী শাখায় জন্ম নেয় ওড়িয়া, বঙ্গ-অসমিয়া। অল্পকাল মধ্যে বঙ্গ বা বাংলা ও অসমিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ১২০০ বছর ধরে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

২.৪ সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশগুলির উদ্ভবের কাহিনি, ভাষাবংশগুলির বিস্তারের ইতিহাস এবং বিভিন্ন ভাষাবংশের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, প্রাপ্তিস্থান, তাদের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভাষাবংশের বিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার উদ্ভবের ধারা সম্পর্কে জানতে পারবে।

একক ৩ ❑ ভাষাতত্ত্ব

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ ভাষাতত্ত্ব: মূল বিষয়

৩.৪ সারসংক্ষেপ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- ভাষাতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়।
- প্রথাগত ব্যাকরণের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের পার্থক্য।
- ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়।
- ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে কি?
- ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিচয়।

৩.২ প্রস্তাবনা

ভাষা নিয়ে চিরকাল মানুষের মধ্যে অপার কৌতূহল। ভাষা সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিচারের সূচনাও প্রাচীনকাল থেকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে হাজার হাজার বছর আগেই ভাষাবিদ্যার আলোচনা চলেছে। সংস্কৃতে এই জাতীয় আলোচনা নিয়ে যে-ধারার উদ্ভব তার নাম ব্যাকরণ। শব্দবিদ্যা নামটিও পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি ইংরেজি grammar-এর চর্চাও শুরু হয় প্রাচীনকাল থেকেই।

অবশ্যই প্রাচীনকালে ভাষা-সম্পর্কিত আলোচনার যে রীতি-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, পরবর্তীকালে তার অনেক বদল হয়েছে। আধুনিককালে ভাষা-গবেষণার পরিসর অনেকগুণ বেড়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের অনেক শাখাপ্রশাখা তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষণের পদ্ধতি যারপরনাই পালটে গেছে।

এই আলোচনায় আমরা উপরোক্ত প্রসঙ্গ-সমূহের পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

৩.৩ ভাষাতত্ত্ব: মূল বিষয়

● ভাষা বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনার সূচনা:

ভাষা নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা একালের নতুন বিষয় নয়, হাজার হাজার বছর আগেই ভাষাচিন্তার সূচনা হয়েছে। প্রাচীনকালে ভারত ও গ্রিস দেশে দার্শনিক ও সাহিত্য-মীমাংসকদের আলোচনায় ভাষার উপাদান, গঠন, রীতি ও ব্যবহারিক বিধি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রাচীনকালে ভাষাচিন্তা এসেছে সাহিত্যের আলোচনার পরিপোষক রূপে। সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষাই ছিল যাবতীয় বিশ্লেষণ ও আলোচনার মূল অবলম্বন। পরবর্তীকালে ভাষা-সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্র ও পরিধি অবশ্যই অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। ভাষা সম্পর্কিত মানুষের মৌলিক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটেছে। ভাষার অন্তর্নিহিত স্বরূপ-বিচারে লিখিত ভাষার তুলনায় মৌখিক ভাষার অধিকতর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন পণ্ডিতগণ। মানুষের রচিত লিখিত ভাষার বয়স ছয়-সাত হাজার বছরের বেশি নয়, অথচ মৌখিক ভাষার উদ্ভব ঘটেছে লক্ষ বছর আগে—মানব সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকে। এই ভাবেই দেখা দেয় ভাষাচিন্তার আধুনিক পর্যায়। জন্ম নেয় বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান নামক নতুন এক ধারা, যা সম্পূর্ণ একালের সামগ্রী।

আধুনিক ভাষাচিন্তা বা ভাষাজিজ্ঞাসার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ড. রামেশ্বর শ' এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার বিকাশ হয় আধুনিক কালেই। তবু মানুষের ভাষাজিজ্ঞাসা ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যে বহু প্রাচীনকালেই সূচিত হয়েছিল। এমনকি, প্রাচীন ভারতে পাণিনি-প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের ভাষাবিষয়ক আলোচনার যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালে 'ভাষাবিজ্ঞান' (Linguistics), 'ভাষাতত্ত্ব', 'বাঙ্‌মীমাংসা' (Philology) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হয় নি।"

ভাষাতত্ত্বের একাধিক বিকল্প নামের মধ্যে আমরা কোন্ নামটি গ্রহণ করব? ভাষাবিদ্যাচর্চার প্রকৃত নাম কী? ভাষাজিজ্ঞাসার বহুপ্রচলিত সাধারণ নাম 'ভাষাতত্ত্ব'। একালের ভাষাগবেষকদের কাছে যে শব্দটি অধিকতর জনপ্রিয় তা হল---'ভাষাবিজ্ঞান'। সাধারণ জনমানসেও প্রশ্ন রয়েছে---'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান'—দুটো শব্দ কি একই বিষয়কে ইঙ্গিত করে? এদের মধ্যে প্রভেদ আছে কি? যদি প্রভেদ থাকে, তবে তা কীরূপ?

ভাষাবিদ্যার নানা পরিভাষা সাম্প্রতিককালে রচিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এই সব তাৎপর্য ও প্রয়োগ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। এমন কি, ভাষাবিদ্যার নানা শাখা-প্রশাখার ক্রমাগত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার আলোচনার ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বিশ্লেষণের অভিমুখ ও উদ্দেশ্যও নিয়ত নতুন নতুন দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ড. রামেশ্বর শ' ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"ভাষাজিজ্ঞাসা-দ্যোতক একাধিক শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে। ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়ই শিথিলভাবে কখনো Philology, কখনো Linguistics শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।"

ভাষা-গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি আগের মতো নেই। প্রচলিত প্রথাগত ব্যাকরণের মধ্যে ভাষাবিদ্যাকে সীমাবদ্ধ না রেখে আধুনিক কালের ভাষাবিজ্ঞানীরা নির্মোহ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে ভাষার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করে চলেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রাচীনকালে ভাষাবিদ্যাচর্চায় বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ছিল না, এমন ভাবাও ঠিক নয়। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ভাষা বিশ্লেষণের পরিসর ছিল ক্ষুদ্র। প্রাচ্যদেশে ও পাশ্চাত্যদেশের বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি ভাষার স্বরূপ নিয়ে বিচার করেছেন বা সেই ভাষার ব্যবহারিক রীতি-পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধ নিয়ে মত-মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

- **ভাষাতত্ত্ব (Philology) ও ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics):**

ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। দুটি ধারাই ভাষাবিদ্যা নিয়ে চর্চা করে, তথাপি এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য স্বীকার করা হয়।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে সংস্কৃত, গ্রিক, জার্মানি, ল্যাটিন, আবেস্তীয় ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্য পাঠের প্রতি বহু শিক্ষিত মানুষের প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়। প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আগ্রহের ফলে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের চর্চার ব্যাপক সূচনা হয়। এই কারণে ভাষাতত্ত্বের অপর নাম 'সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব'। এই চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে জার্মানি। বিংশ শতকে ভাষাবিদ্যাচর্চার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। শুরু হয় ভাষাবিজ্ঞান চর্চা। মুখ্যত আমেরিকায় এর চর্চার উদ্ভব ও প্রসার।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে কোনো একটি ভাষার উৎস, ইতিহাস, ব্যবহারকারী মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, পুথিপত্র, লিখিত সাহিত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকে। আলোচ্য ভাষাটির নিজস্ব স্বরূপ উদ্ধারে ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় কোনো একটি ভাষার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কাজকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে অন্য কোনো ভাষার ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যগত উপাদানকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। ভাষাতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি প্রয়োগ করে এক বা একাধিক ভাষার বিশেষত্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়, সেখানে উদ্দেশ্য হল বিশেষ থেকে বিশেষ-এরই অন্তরালশায়ী ভাববস্তুকে ধরা। ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রধান আকর্ষণ প্রাচীন সাহিত্য, লিখিত পুঁথি, শিলালিপি, প্রত্নলেখ প্রভৃতির দিকে। জাতির সামগ্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে ভাষাকে মিলিয়ে দেখা ভাষাতত্ত্বের প্রধান প্রবণতা।

ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) বলতে বোঝায় ভাষা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। এর প্রধান

অবলম্বন ভাষার মৌখিক রূপ। পুথি-পত্র নির্ভর লিখিত উপাদান ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য নয়। মানুষের মুখের প্রতিদিনকার জীবন্ত ভাষাই তার প্রধান ভিত্তি। তবে ভাষার সাধারণ সূত্রাবলি নির্ধারণের কাজে কখনও কখনও ভাষাবিজ্ঞানীরা লিখিত ভাষার উপাদানও পরীক্ষা করেন।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ভাষার ক্ষেত্রেও নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-নির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা-লব্ধ ফলাফলকে সূত্রবদ্ধ করার কাজ চালানো ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কোনো নির্দিষ্ট একটি ভাষার মধ্যে এর গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। সব ভাষাকে নিয়ে সাধারণ সূত্র নির্ধারণ এর লক্ষ্য। সাধারণ বিজ্ঞানের মতোই ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার গতিপথ বিশেষ (particular) সত্য থেকে সাধারণ (general) সত্যের দিকে।

বিজ্ঞানের গবেষণার আদর্শ ভাষাবিজ্ঞানও যথাসাধ্য অনুসরণ করে। ভাষা-গবেষণার কাজে গবেষকের প্রথম দায়িত্ব—তথ্য সংগ্রহ (data collection), পরবর্তী পর্যায়ে চলে তথ্য-উপাদানগুলির নথিভুক্তিকরণ (record), তারপরে চলে পর্যবেক্ষণ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ। প্রাপ্ত তথ্যের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ভাষাবৈজ্ঞানিক কোনো সাধারণ সূত্র প্রণয়নের দিকে এগিয়ে যান। তাই বলা হয়, অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ভাষাবিজ্ঞানেরও লক্ষ্য—বিশেষ করে সাধারণ সত্যে পৌঁছনো।

আবার, বিজ্ঞানের সূত্রগুলি যেমন অক্ষয় অচল নিত্য বস্তু নয়, ভাষার বৈজ্ঞানিক গবেষণাও তাই। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য-আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে গবেষণার ফল বদলে যেতে থাকে। ড. রামেশ্বর শ'-এর মন্তব্য স্মরণীয়:

"Linguistics-এও ভাষাবিশেষের আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সেখানে লক্ষ্য হল ভাষাবিশেষকে বিশ্লেষণ করে ভাষার সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া।”

ভাষাবিজ্ঞানী Merio Pei-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—"The problem of linguistics cocern mainly the spoken language though written language forms are also considered." অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র প্রধানত মানুষের মুখের ভাষা হলেও লিখিত রূপ-কেও প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়।

- **ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ:**

বর্তমানকালে ভাষা-বিশ্লেষণমূলক আলোচনাকে যে-সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়, তা হল—ব্যাকরণ (Grammar)। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্যাকরণ ও শব্দবিদ্যা এই দুটি শব্দের প্রচলন ছিল। ‘ভাষাতত্ত্ব’ বা ‘ভাষাবিজ্ঞান’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার তখন দেখা দেয়নি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আবির্ভূত আচার্য পাণিনির রচিত ব্যাকরণ ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার এক আলোকস্তম্ভ বিশেষ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী রূপে আচার্য পাণিনি সর্বজনবন্দিত, একালের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানীরাও আচার্য পাণিনির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ব্যাকরণ শব্দের ব্যাপকতা ও গভীরতা মধ্যযুগে অনেকটা খণ্ডিত হয়ে পড়েছিল। ব্যাকরণ বা Grammar তখন হয়ে উঠেছিল নির্দেশমূলক (normative) বা বিধিনিষেধমূলক (prescriptive)। ভাষার শুদ্ধ ও মার্জিত রূপ কী হওয়া উচিত এবং কীভাবে অশুদ্ধি পরিহার করে ভাষার প্রয়োগকে শুদ্ধরূপ দিতে হবে— এ সম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ জ্ঞাপন করাই ছিল ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। সমকালের ভাষার মৌখিক ও বাস্তব রূপের উপাদান বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যাকরণের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। ভাষা-শিক্ষার্থীকে নির্ভুল ভাবে ভাষা শেখানোই ছিল এর লক্ষ্য।

ধরা যাক, 'সখ্যতা' শব্দের কথা। একালের বাংলা ভাষায় এই শব্দটির ব্যবহারের ছড়াছড়ি। ব্যাকরণের নিয়মে শব্দটি হবে 'সখ্য'। শেষে 'তা' প্রত্যয় যোগ করা অসমীচীন। এজাতীয় ব্যাকরণগত ত্রুটির দিকটি ভাষাবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। তাঁর বিচারে শব্দের শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচারই ভুল। কোনো শব্দ যে-ভাবেই মৌখিক ব্যবহারে আসুক না কেন, ভাষাবিজ্ঞানী তাকেই সমান মর্যাদায় গ্রহণ করেন ও বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করেন, কেন শব্দটির এই ব্যবহার দেখা দিয়েছে। তাঁরা দেখেছেন, এর পেছনে রয়েছে সাদৃশ্যের প্রভাব। 'তা'-যুক্ত একাধিক শব্দের প্রভাবে 'সখ্য' দাঁড়িয়ে গেছে 'সখ্যতা'।

ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখেছেন সাদৃশ্যের ফলে শুধু-যে ভাষার ধ্বনি ও রূপ বদলায় তা-ই নয়, অনেক সময় তথাকথিত 'ভুল' 'অশুদ্ধ' শব্দ তৈরি হয়। যেমন—'বৈচিত্র্যতা', 'অবিশ্বাস্যনীয়' ইত্যাদি। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় এজাতীয় শব্দের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে : "যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার গঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা হয়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে।"

এই সংজ্ঞায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও প্রথাচলিত ব্যাকরণ উভয়ের বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত আছে। ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা, আর শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার করে নির্ভুল ভাষা লেখার বিধান দেওয়া— এই হল প্রথাচালিত নির্দেশমূলক ব্যাকরণের (Normative Grammar) অঙ্গ।

তাত্ত্বিক প্রভেদ ও বৈষম্যের কথা কেউ কেউ উচ্চারণ করলেও একালের প্রায় সব ভাষাবিজ্ঞানী উপলব্ধি করছেন, আসলে কার্যক্ষেত্রে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, শব্দবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির মধ্যে স্বরূপত কোনোই ভেদ নেই। এরা একে অন্যের পরিপূরক মাত্র।

ড. রামেশ্বর শ'র বক্তব্য স্মরণীয়: "আসলে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র এখন প্রসারিত হচ্ছে। ফলে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের এখন আর বিশেষ কোনো ভেদ নেই। Philology

বনাম Linguistics-এর বিরোধ এখন অচল, বাঙ্‌মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য এখন শুধুই তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়, কার্যত দুয়ের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ আধুনিক মনের অনন্ত জ্ঞান-তৃষ্ণার ফলশ্রুতি; এখন মিলন, সম্প্রসারণ, উদারতাই আধুনিকতার অভিজ্ঞান।"

ব্যাকরণ বা Grammar-এর শব্দের প্রসারিত অর্থ গ্রহণ করে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক শব্দটিকে ভাষাবিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহার করে চলেছেন।

- **ব্যাকরণ বা ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা**

ব্যাকরণ বা ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা প্রধান তিনটি ধারায় চালিত হয়। এগুলি হলো:

ক) বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণ (Descriptive Linguistics or Grammar)।

খ) ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণ (Historical Linguistics or Grammar)।

গ) তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণ (Comparative Linguistics or Grammar)।

এ ছাড়াও অন্য কয়েকটি গৌণ ধারারও অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা প্রধান ধারাগুলির বৈশিষ্ট্য ও ভাষা-বিশ্লেষণের রীতি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

ক) বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণ (Descriptive Linguistics or Grammar) : আধুনিক কালে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা ও প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষ কোনো কালবৃত্তের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে কোনো একটি ভাষার সম্যক পরিচয় পেতে হলে এই ধারার রীতিপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রচুর সংখ্যক ভাষার উপাদান পর্যবেক্ষণ করে ভাষা-সম্পর্কে ও সর্বজনীন তত্ত্ব তৈরির চেষ্টা এতে থাকে না। অথবা কোনো ভাষার অতীত ইতিহাসের বিবর্তন-রেখাও এখানে পাওয়া যাবে না।

বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের উপজীব্য: কোনো একটি মাত্র ভাষার বিশ্লেষণ যা কোনো এক বিশেষ সময়-পর্যায়ের মধ্যে সীমিত। তাছাড়া সেই ভাষার ইতিহাসের দিকে এর আগ্রহ নেই। ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণই যথার্থ বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় অন্য এক ধারার নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়, তা হলো সমকালিক ভাষাবিজ্ঞান (Synchronic linguistics)। স্থূলভাবে বিচার করলে এ দুই ধারাই সমার্থক বলে মনে হয়, যদিও কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী এ-দুয়ের মধ্যে সামান্য তাত্ত্বিক প্রভেদের কথা বলেন। তাঁরা মনে করেন, সমকালিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ, উপভাষাগত বিশেষত্ব, গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত প্রয়োগ-বিশেষত্ব উপেক্ষিত থাকে। কিন্তু সমকালিক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার এই দিকগুলিকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে।

ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস হকেট-এর উক্তিতে এই প্রভেদের কথা পাই: "Synchronic linguistic includes descriptive linguistics and also certain further types of investigation, particularly synchronic dialetology, which is the systematic study of inter-personal and inter-group differences of speech habit."

খ) ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণ (Historical Linguistics or Grammar): নামের মধ্যেই তাৎপর্য স্পষ্ট। একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে রেখে বিচার নয়, ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় ভাষার উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করা হয়। একালের ব্যবহৃত কোনো পদ, বাক্য বিশ্লেষণের সময় তার আদি রূপেরও সন্ধান করেন ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানী। অতীতে কী ছিল, পরিবর্তনের ছাপ গায়ে মেখে ভাষার উপাদানগুলি কী দাঁড়িয়েছে, তার ক্রম-চিত্র এই আলোচনায় ধরা পড়ে। যেহেতু অতীতের রূপটি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়, ফলে এই পদ্ধতিতে শুধু ভাষার একালের মৌখিক রূপে সন্তুষ্ট থাকার উপায় নেই, প্রাচীনকালের সাহিত্য-শিলালিপি প্রভৃতিতে ভাষার যে-লিখিত রূপ পাওয়া যায় তাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কালানুক্রম অনুযায়ী ভাষার ধ্বনি-রূপের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়।

ধরা যাক্, ‘ধাম’, ‘মাছ’, ‘খায়’ ইত্যাদি বাংলা শব্দ। একালের বাংলা উচ্চারণে শব্দগুলি বহু ব্যবহৃত। সমকালিক ও বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান এই শব্দগুলির বর্তমান রূপ নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানী শব্দগুলির উৎস সন্ধান করেন ও অতীতের রূপের ওপর আলোকপাত করেন। ‘ধাম’ শব্দ নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন না, দেখান সংস্কৃত ‘ধর্ম’ শব্দ প্রায় দু’হাজার বছর আগে প্রাকৃতে এসে হয়েছে ‘ধম্ম’, পরে ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন (compensatory lengthening)-এর প্রভাবে বাংলা উচ্চারণে দাঁড়িয়েছে ‘ধাম’ I ধর্ম > ধম্ম > ধাম। অনুরূপভাবে, সংস্কৃত ‘মৎস’ প্রাকৃতে এসে হয়েছে ‘মচ্ছ’, বাংলায় ‘মাছ’। মতস্য > মচ্চ > মাছ। ‘খায়’ শব্দ চর্যাগীতিতে ‘খাঅ’ (‘কুম্ভীরেঁ খাঅ’) ছিল, পরে মধ্যবাংলায় হয়েছে ‘খাএ’, বর্তমান কালে য়-শ্রুতি (y-glide)-র প্রভাবে হয়েছে ‘খায়।’

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের বিচার-পদ্ধতিকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেন। তবে, অনেক ভাষাবিজ্ঞানীই সমকালিক পদ্ধতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ না থেকে কখনো কখনো ঐতিহাসিক বা কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়-সাধন আধুনিক যুগের বড় লক্ষণ। ড. রামেশ্বর শ’র কথায় “...মিলন, সম্প্রসারণ, উদারতাই আধুনিকতার অভিজ্ঞান।”

গ) তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণ (Comparative Linguistics or Grammar): ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রায় হাত ধরাধরি করে চলে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণ। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণের সাহায্য ছাড়া ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণা অনেকটা যেন অসম্পূর্ণ থাকে। এই রীতি-পদ্ধতির ক্ষেত্রটি অন্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। পৃথিবীর প্রাচীন

ভাষাবংশসমূহ ও এদের গতিপ্রকৃতি তথা বিকাশ-বিবর্তন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া তাঁরা সম্পূর্ণ অসহায়। শুধু প্রাচীন ভাষার ক্ষেত্রে নয়, একালের যে-কোনো জীবন্ত ভাষার উৎস ও বিবর্তনের রূপরেখা ঠিকভাবে উদ্ধার সম্ভব নয়—পার্শ্ববর্তী আত্মীয়কল্প অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তুলনাত্মক পদ্ধতিতে না এগোলে।

ধরা যাক, প্রাচীন ভাষাবংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস। কয়েক হাজার বছর আগে এই ভাষা-পরিবারের সদস্যরা (গ্রিক, ইতালিক, জার্মানিক, ইন্দো-ইরানিয়, আর্মানীয়, আলবানীয় ইত্যাদি) ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে ও দশটি ভাষায় বিভাজিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাদান ও ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি মধ্যে তুলনা করে পণ্ডিতগণ এই সব ভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণের দিকে এগিয়ে গেছেন। তুলনাত্মক পদ্ধতিতে না এগোলে এদেরকে ‘সতম্’ ও ‘কেন্তুম্’ গুচ্ছে ভাগ করার প্রশ্নই উঠত না। এই ভাষাগুলির ধ্বনি ও রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করে অনুমান করা সম্ভব এদের জননী স্থানীয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী ছিল।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন বাংলার প্রথম ও প্রধান নিদর্শন ‘চর্যাগীতি’। এই প্রাচীন পুথির ভাষা যে বাংলা তা ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে প্রচুর তথ্যের সমর্থনে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু, বিতর্কের শেষ নেই। ওড়িয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণ দাবি করেন—এর ভাষা প্রাচীন ওড়িয়া। হিন্দিভাষী পণ্ডিতেরা দাবি করেন, চর্যার ভাষা প্রাচীন হিন্দি। এই বিতর্কের জট ছাড়াতে হলে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অবশ্যই তুলনাত্মক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। ওড়িয়া, হিন্দি বা বাংলার নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণাদি বিচার করে, খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতকে সেই সব লক্ষণের কতটা দেখা দিয়েছিল তা বিচার করে ও সেই উক্ত ভাষাগুলির শব্দ-প্রত্যয়-উপসর্গ-কারকবিভক্তি-বাক্যগঠন ধ্বনিরূপের বিশেষত্বের মধ্যে তুলনা করে ‘নেতি নেতি’ করে গবেষকদের এগোতে হবে। মোটকথা, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত।

৩.৪ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা ভাষাবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ-এর স্বরূপ এবং পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার বহুমাত্রিক দিক, প্রাচ্য এ পাশ্চাত্যের ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবনার বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি আলোচনায় উঠে এসেছে। এছাড়াও এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সম্পর্কে জানাতে পারবে।

একক ৪ ❑ বাংলা লিপির উদ্ভব

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ লিপির উদ্ভব-কথা: মূল বিষয়

৪.৪ সারসংক্ষেপ

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে:

- লিপির উদ্ভব কীভাবে সূচিত হয়।
- লিপির উদ্ভবের পেছনে কী কী কারণ ছিল।
- লিপির বিকাশের ধারায় প্রাচীন পর্যায়গুলি কী।
- আধুনিক সভ্য জগতের লিপিসমূহ কোন্ কোন্ প্রাচীন লিপি-পদ্ধতি থেকে হয়েছে।
- প্রাচীন ভারতে কী কী লিপি প্রচলিত ছিল।
- প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী লিপি-পদ্ধতির কথা।

৪.২ প্রস্তাবনা

মৌখিক ভাষাকে নানা চিহ্ন-প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রাচীনকালের মানুষ স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। স্থানগত ও কালগত ব্যবধান পেরিয়ে মানুষ নিজেদের ভাব-বক্তব্য বার্তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি করে লিপি-পদ্ধতি। একদিনে এই কাজ সাধিত হয়নি। বহু সহস্র বছরের পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত লিপি-পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করে করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

আমাদের এই আলোচনায় পৃথিবীর প্রাচীন লিপি-পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করব। প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতীয় লিপি সম্পর্কেও আমরা প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য তুলে ধরব। লিপির উৎস ও বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনার আগে পৃথিবীর প্রাচীন লিপিগুলির উদ্ভব ও বৈচিত্র্য বিষয়ে সাধারণ ধারণা থাকা আবশ্যক।

৪.৩ লিপির উদ্ভব-কথা: মূল বিষয়:

লিপির উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন

প্রান্তে নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু সহস্র বছর ধরে লিপির বিকাশ বিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান কালে নানা বৈচিত্র্যে গড়া যে-লিপিমালা আমরা দেখি, তা এক দিনে তৈরি হয়নি—হাজার হাজার বছর ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ সাধিত হয়েছে। লিপির উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস এখনও অনেকটাই অজানা ও অস্পষ্ট। অনেক প্রাচীন লিপি-পদ্ধতি পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়েছে, অনেক প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করা এখনো সম্ভব হয়নি। প্রাচীন সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের মধ্যে এখনও গবেষকগণ লিপি-বিবর্তনের পদচিহ্ন সন্ধান করে চলেছেন।

● লিপির উদ্ভব কথা

মনের ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মানুষ একদা সৃষ্টি করেছে ভাষা। বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহার সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং তার জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক প্রয়োজনকে নিঃসন্দেহে অনেকটাই পূরণ করেছে, কিন্তু সব চাহিদা পূরণ হয়েছে এমন নয়। মৌখিক বাগ্‌ব্যবহার মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে মাত্র—তাৎক্ষণিকতাকে অতিক্রম করে দূরবর্তী কালে ও স্থানে তার কণ্ঠস্বর পৌঁছতে অক্ষম। প্রাচীনকালে মানুষ উপলব্ধি করেছে যে, ইচ্ছা করলেই কোনো বক্তা তার মৌখিক ভাষাশ্রয়ী ভাবনা-বক্তব্য-সংবাদকে দূর দেশে সঞ্চালিত করতে পারে না এবং ভবিষ্যতের জন্যও সেই ভাবনাকে টিকিয়ে রাখার উপায় নেই। মৌখিক ভাষার স্থান ও কালগত সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করার নানা অদম্য প্রয়াসের ফল লিপি-পদ্ধতি আবিষ্কার। সভ্যতার বিবর্তনের পথে মানুষকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় লিপি। পৃথিবীর বুকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে লিপির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস।

মানুষ যখন সভ্যতার আদিম স্তরে ছিল, তখন লিপির প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। লিপির উৎপত্তি সভ্যসমাজে। এ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য: "অসভ্য সমাজে তাহা হয় নাই, কেন না অন্তরের যে প্রয়োজনে মানুষের প্রকাশবেদনা অনুভূত হয় সে প্রয়োজন তাহাদের ছিল না। ভাষাকে স্থায়িত্ব দিবার আবশ্যকতা অসভ্য জীবনে অননুভূত।"

কেন মুখের ভাষাকে মানুষ লিপিতে মূর্ত করতে চেয়েছে তার উত্তর খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথও। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের সামগ্রী' নামক প্রবন্ধে তিনি মানুষের এক চিরন্তন হৃদয়াকুতির কথা আলোচনা করেছেন। মানুষ নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে ব্যাকুল, কিন্তু শুধু প্রকাশ করেই সে তৃপ্ত নয় সে চায় এই সব আবেগানুভূতিকে স্থায়িত্ব দিতে ও অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।— "প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। ...মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকম একটা চেষ্টা আছে...। এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই—কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে খোন্তায়, কলমে কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁদিক হইতে ডাহিনে,

ডাহিন হইতে বাঁয়ে উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে। কী? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না; তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিবে...।"

সভ্যতার অগ্রগতির কাল থেকে মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে মনের ভাবনাচিন্তাকে দৃশ্যরূপ দেবার ব্যাকুল চেষ্টা। ঠিক কবে, কোন্ সময়ে, কোন্ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে গুহাচিত্র অঙ্কণের মধ্য দিয়ে লিপির যাত্রা সূচিত হয়, তার উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। প্রাচীন ইতিহাসের অত্যল্প প্রত্ন-উপাদান ছিন্নসূত্র অবলম্বনে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, আজ থেকে অন্তত দশ হাজার বছর আগে একটু একটু করে আধুনিক লিপির ব্যবহার শুরু হয়। লিপির জন্ম কথা ও ক্রমবিবর্তনের ইতিবৃত্ত নানা বৈচিত্র্য ও জটিলতায় পূর্ণ। বিভিন্ন পর্যায়ক্রমের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ সাধিত হয়েছে।

• লিপির বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

আমরা আগেই বলেছি, নানা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আদিমকালে লিপির বিকাশ। পর্যায়গুলি কী? সংক্ষেপে তার পরিচয় স্পষ্ট করা যাচ্ছে।

চিত্রাঙ্কণ: মুখের ভাষা ও মনের ভাবকে চিত্ররূপের পথ ধরে প্রথম লিপির আবির্ভাব। আমরা গুহা-মানবের কথা জানি গুহার গায়ে অপটু হাতে যারা নানা ছবি এঁকে মনের ভাবকে রূপ দেবার চেষ্টা করতো। গুহার গায়ে ছবি আঁকার চেষ্টা সেকালে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা খামখেয়াল মাত্র নয়। সেকালে কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর মানুষ এজাতীয় সাংকেতিক চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে কোনো বিশেষ বার্তা ও মনোভাব ফুটিয়ে তুলতেন। শুধু গুহার গায়ে নয়, পাথরে, শক্ত মাটিতে, পশুর চামড়ার ওপর ছবি এঁকে কোনো ভাব-বক্তব্যকে সংরক্ষণ করা হত। চিত্র-রচনার শৈল্পিক আনন্দলাভ নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটিই হয়তো সেখানে প্রধান ছিল। মনের ভাব প্রকাশ করার এই রীতি, লিপি-রচনার প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। ছবি আঁকার এই প্রবণতাই পরবর্তীকালে লিপির কাঠামো রচনার সহায়ক হয়েছে। স্বীকার করা ভালো যে, চিত্র-রচনার এই প্রক্রিয়াকে অনেক বিশেষজ্ঞই যথার্থ লিপি বলতে রাজি নন।

গ্রন্থিলিপি (Quipu): মানব সভ্যতার প্রথম যুগের অন্য এক বিশেষ লিপির কথাও জানা যায়। তার নাম 'গ্রন্থলিপি' বা কুইপু (Quipu)। গবেষকদের মতে, উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সম্ভবত এর প্রধান প্রচলন। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের আদিম মানুষেরাও রঙিন দড়িতে গিট বেঁধে কোনো বিশেষ ঘটনা স্মরণ রাখত। গ্রন্থিলিপিকেও অবিমিশ্র লিপি বলা কঠিন। নিজেদের কোনো বক্তব্য বা বার্তা দূরদেশে পাঠাতে হলে নানা ধরনের রঙিন দড়ির গিঁট দিয়ে প্রতীকী নক্সা বানিয়ে সেগুলি সেখানে পৌঁছে দেওয়া হত। অনেক সময় কাঠের খুঁটি বা গাছের গায়ে খোদাই করেও গ্রন্থলিপি বানানো হত। একালেও পার্বত্যবাসী জনজাতির নিজেদের মধ্যে কোনো জরুরি বার্তা আদান-প্রদানের কাজে গাছের গায়ে চিহ্ন এঁকে দেওয়ার প্রথা রয়েছে। শুধু পার্বত্যবাসী নয় সমতলবাসীর মধ্যেও এই গিঁট

বাঁধার প্রাচীন রীতি-সংস্কার বজায় আছে। ড. সুকুমার সেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের দেশে কোনো বিশেষ কর্তব্য-কর্ম মনে রাখার জন্য মেয়েদের আঁচলে ও পুরুষদের কোঁচার খুঁটে গিঁট দেবার রীতি একালেও আছে।

চিত্রলিপি ও গ্রন্থিলিপির সময়কাল খুবই প্রাচীন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০০ থেকে ১০০০০ অব্দের মধ্যে অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার উন্মেষের আগে এই লিপিগুলির সময়কাল। সেই সময়ের মানুষের চিত্রবিদ্যাচর্চার পথ ধরে পরবর্তীকালের লিপিবিদ্যার প্রকৃত পথচলার সূচনা।

চিত্রলিপি (Pictogram) বা ভাবলিপি (Ideogram): লিপির ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা দেয় চিত্রলিপি (Pictogram) বা ভাবলিপি (Ideogram)। অনেকে একসঙ্গে বলেন ভাব-চিত্রলিপি। প্রথম যুগে কোনো একটি ভাব ব্যাখ্যা করতে গোটা চিত্রের সাহায্য নেওয়া হত। পরে শুধু রেখাচিত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাব ফুটিয়ে তোলা হত। এর নাম চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। আরও পরবর্তীকালে শুধু সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক রেখাচিত্র দ্বরা বস্তুর পরিচয় ফুটিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়। অবশ্য বস্তুর সঙ্গে ভাবকেও বোঝানো হত বলে এই লিপিকে বলা হয় ভাব-চিত্রলিপি। শিকার বোঝাতে তীর-ধনু, রাত্রি বোঝাতে অর্ধবৃত্তাকার আকাশে চাঁদ-তারা, বহন করা বোঝাতে মাথায় বোঝা মানুষ ইত্যাদি এঁকে বক্তব্য বিষয়টি দ্যোতিত হত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চিত্রলিপি যুগে একটি ছোটো গোল বৃত্ত দ্বারা বোঝানো হত সূর্য। পরবর্তীকালে ভাবলিপির যুগে গোল বৃত্তটির অর্থ আরো প্রসারিত হয়ে বোঝাতে থাকে সূর্যের আলো বা আলোর দেবতাকে। এইভাবে লিপি-পদ্ধতির মধ্যে আসতে থাকে সূক্ষ্মতা ও প্রতীকধর্মিতা। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন আদিবাসী সমাজে এই লিপিপদ্ধতির প্রচলন ছিল।

শব্দলিপি (Phonogram): এতকাল অঙ্কিত চিত্র বা প্রতীক দ্বারা কোনো বস্তু বা বিষয়কে বোঝানো হত, মুখে উচ্চারিত শব্দসমষ্টিকে রূপদানের চেষ্টা সেক্ষেত্রে ছিল না। ক্রমে মানুষের মধ্যে দেখা দিল মৌখিক ভাষার সাংকেতিক দৃশ্যরূপ রচনার উদ্যোগ। অনুমান হয়, প্রাচীন মিশরে প্রথম এভাবে দেখা দিয়েছে শব্দলিপি। চিত্র-প্রতীকের দ্বারা শব্দলিপির রূপায়ন শুরু। মিশরীয় লিপির আদিম রূপকে ক্রমে প্রতীকধর্মী সংক্ষিপ্ত ও শিষ্টরূপ (Hireratic)-এ নিয়ে আসা হয়।

অক্ষরলিপি (Syllabic script): শব্দলিপির স্বাভাবিক পরিণাম অক্ষরলিপি। শব্দলিপিতে গোটা শব্দকে একসঙ্গে বোঝানো হত। মৌখিক ভাষার ধ্বনিগুচ্ছের পরিচয় সেক্ষেত্রে ছিল না। অক্ষরলিপিতে শব্দের আদি অক্ষরের নির্দেশ সূচক বিশেষ কোনো চিহ্নের ব্যবহার দেখানো হয়। ধরা যাক, উপুড়-করা একটি কড়াইয়ের চিত্র। শব্দলিপিতে এর মানে ছিল আকাশ। কিন্তু অক্ষর-লিপিতে তা আর গোটাবস্তুর প্রতীক রইল না, এটি হয়ে উঠল একটি বিশেষ মৌখিক ধ্বনি ('গ')-র প্রতীক। সাধারণত সব ধ্বনি নয়-এর দ্বারা শুধু শব্দের আদিস্থিত ধ্বনিকে নির্দেশের কাজ চলত। একারণে লিপিবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'শীর্ষনির্দেশ' (Acrology)। প্রাচীন সাইপ্রাসে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের দিকে অক্ষরলিপির বিকাশ ঘটেছে বলে অনুমান হয়।

ধ্বনিলিপি (Alphabetic script): অক্ষরলিপির পরে আসে ধ্বনিলিপি। বিভিন্ন উচ্চারিত ধ্বনি তথা মূলধ্বনির জন্য এক-একটি লিপির ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে শব্দের যথাযথ ধ্বনিগত পরিচয় স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা অনেক সহজ হয়ে যায়। এই লিপি-পদ্ধতি অনেক সরল। এর ব্যবহার উপযোগিতা অনেক বেশি। আগে ভাব বা বক্তব্যকে প্রকাশ করতে অনেক বেশি স্থান ও শব্দলিপি ব্যবহার করতে হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক সময় চীনদেশীয় পণ্ডিতরা প্রায় পাঁচ হাজার চিহ্ন ব্যবহার করতেন। ধ্বনিলিপির ব্যবহার শুরু হওয়ার পর ত্রিশটি লিপির সাহায্য নিয়েই সব ধরনের শব্দ প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। আবিষ্কৃত ধ্বনিলিপির মধ্যে সর্ব প্রাচীন বলে অনুমান হয় পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত কিছু লিপি। আনুমানিক প্রায় একহাজার খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এগুলি রচিত হয়েছিল।

গ্রিক-রোমান লিপি সম্পূর্ণত ধ্বনিমূলক। ভারতীয় লিপি ধ্বনিলিপি ও অক্ষরলিপির সংমিশ্রণ।

প্রাচীনকালের প্রধান লিপি-পদ্ধতি:

আদিম যুগের চিত্রলিপি বা গ্রন্থিলিপির স্তর পেরিয়ে আধুনিক লিপি-পদ্ধতির স্তরে পৌঁছতে মানুষের সময় লেগেছে বহু সহস্র বছর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভাবিত লিপি-পদ্ধতির মধ্যে নানা সংমিশ্রণ হয়েছে। পুরোনো পদ্ধতি বর্জন করে অনেক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ নতুন কোনো পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে বা পুরাতন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করেছে। মানুষের প্রধান চেষ্টা ছিল রূপের জটিলতা ও সংখ্যাধিক্য কমিয়ে লিপিকে সহজ ও দ্রুত-লিখনের উপযোগী করার চেষ্টা।

ভাষার উৎস বিচার করে ভাষাবিজ্ঞানীরা যেমন ভাষাবংশ নির্ধারণ করেছেন, তেমনি লিপিবিজ্ঞানীরাও প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যজগতের যাবতীয় সব লিপির ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ রেখে চারটি প্রধান প্রাচীন লিপি-পদ্ধতিকে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি হল:

১। মিশরীয় লিপি: লিপির বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় প্রাচীন মিশরের চিত্র-প্রতীকলিপির গুরুত্ব লিপিবিশারদগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচ-হাজার বছর আগে এই লিপি প্রচলিত ছিল বলে অনুমান হয়। প্রাচীন গ্রিকজাতি মিশরীয় লিপি-পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ও এর নামকরণ করে 'hieroglyph' (পবিত্র লিপি)। এই লিপির বিকাশের কয়েকটি স্তর বর্তমান। প্রথম পর্যায়ের মিশরীয় চিত্রপ্রতীকলিপিতে জটিলতা ছিল, প্রতীকের সংখ্যাও ছিল খুব বেশি। পরবর্তীকালে এই লিপি-পদ্ধতিকে অনেকটাই সহজ ও সরল করা হয়েছে। এক সময় এই লিপির একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো ফিনিশীয়রা নিজের ভাষায় ব্যবহার করতে থাকে।

ফিনিশীয় লিপি: মিশরীয় লিপির নানা শাখা-প্রশাখা। সেমীয় উপশাখায় এই লিপির বিকাশও দুই প্রধান ধারায়—ফিনিশীয় ও আরামীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সংক্ষিপ্ত প্রতীকধর্মী ফিনিশীয় লিপি-কাঠামো থেকেই পরে অনেক ইউরোপীয় লিপির উদ্ভব। হিব্রু, আরবি, গ্রিক প্রভৃতির বর্ণমালারও জন্ম মিশরীয় লিপির ফিনিশীয় ধারা থেকে। গ্রিকরা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে ফিনিশীয় লিপি গ্রহণ করে ও নানা সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে

গড়ে তোলে গ্রিক বর্ণমালা। নানা পরিবর্তনের পথ ধরে এই লিপি থেকে জন্ম নেয় রোমীয় লিপি (Raman Alphabet)। ল্যাটিন ভাষার নিজস্ব লিপি রোমান লিপির জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। আধুনিক ইউরোপের প্রধান ভাষাগুলি—ইংরেজি, জার্মান, ইতালীয়, ফারসি ইত্যাদি; এই ভাষা গুলির ক্ষেত্রে রোমান বর্ণমালা গৃহীত হয়েছে।

আরামীয় লিপি-পদ্ধতি: লিপিবিশারদদের অনেকেই মত দিয়েছেন যে, সেমীয় উপশাখার অন্য লিপি-পদ্ধতি আরামীয় ধারা থেকে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীয় জন্ম। ফিনিশীয় লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির গভীর মিল দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ এক সময় ব্রাহ্মীকে ফিনিশীয় লিপির সন্তান বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ফিনিশীয় লিপি ব্যবহারকারী গ্রিক জাতির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্পর্ক তৈরি হয় আলেকজাণ্ডারের সময় থেকে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। আর ব্রাহ্মলিপির জন্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতকে। ইতিহাসের তথ্যাদি ধার করে কোনো কোনো লিপিবিশারদ মনে করেন ব্রাহ্মী-লিপি পদ্ধতির উদ্ভব ফিনিশীয় লিপিরও অগ্রবর্তী আরামীয় লিপি থেকে।

২। চীনীয় লিপিচিত্র: আধুনিক চীনীয় ও জাপানি লিপিপদ্ধতির উদ্ভব এই লিপি থেকে। মূলত চিত্রলিপি থেকে চীনীয় লিপির জন্ম। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে লিপিবিশারদগণ নিশ্চিত।

৩। মেসোপটেমীয় বাণমুখ (Cuneiform) লিপি: প্রাচীন লিপি-পদ্ধতির বিকাশের ধারায় বাণমুখ (arrow-headed) লিপির গুরুত্ব অপরিসীম। সুমেরীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত বলে এর নাম সুমেরীয় বাণমুখ লিপি। প্রাচীনকালে সুমেরীয় জাতির একটি শাখা মেসোপটেমিয়ায় যায়। অনুমান হয় এরাই এই লিপি প্রথম ব্যবহার শুরু করে। কাঁচা মাটির ফলকের ওপর তীর জাতীয় তীক্ষ্ণাগ্র বস্তু বা বাটালি দিয়ে এই লিপি খোদাই করা হত। আসীরীয়, ব্যাবিলনীয় ও প্রাচীন পারসিকরা এক কালে এই লিপি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত। বর্তমানে এই লিপির ধারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

৪। ভারতীয় লিপি: প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান লিপি-পদ্ধতি হল: ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। দুটি লিপিরই উৎস ভারতের বাইরে। অনুমান করা হয় দুটি লিপি-পদ্ধতিই মিশরীয় লিপির অন্তর্গত সেমীয় শাখা থেকে উৎপন্ন। খরোষ্ঠী লিপি লিখিত হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, ব্রাহ্মী লিপি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। এদের থেকে জন্ম নেয় যাবতীয় ভারতীয় লিপি। খরোষ্ঠী লিপির উদ্ভব সুমেরীয় লিপি থেকে। ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই, তবে উদ্ভব নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, ব্রাহ্মী লিপি জন্মসূত্রে সম্পূর্ণ ভারতীয়। প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষের হাতে এই লিপির উদ্ভব। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সিন্ধু-সভ্যতার প্রাচীন লিপিতে (যার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি) হয়তো এর বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মী লিপি-পদ্ধতির প্রসার

খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মীলিপির জনপ্রিয়তা। সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলিই ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু বিশ শতকের কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এই ধারণাকে নষ্ট করে দিয়েছে। বিশেষত শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরায় প্রাপ্ত মাটির ফলকে খোদিত প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এগুলির লিপি ব্রাহ্মী। লিপির সময়কাল খ্রিঃপূঃ ৪৫০-৩৫০ অব্দে। প্রাকৃত যুগে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। উত্তর ভারতে এর নিদর্শন প্রচুর। অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন লিপির মধ্যে আকৃতিগত বৈচিত্র্য রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীতেও ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহারের কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। তামিলনাড়ুতে-প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে প্রাচীন তামিল অক্ষরের প্রভাব বিদ্যমান।

ভারতীয় লিপির ইতিহাসে ব্রাহ্মী লিপির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই লিপির ব্যবহার সূচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহারিক উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা নিয়ে সংশয়ের কোনো স্থান নেই। খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সহস্রাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপির আধিপত্য বজায় ছিল। বৌদ্ধদের রচিত গ্রন্থাদিতে বা শিলালিপিগুলিতে শুধু নয়, জৈনদের পুথিতেও ব্রাহ্মী লিপি ('বম্ভী লিবি')-র ব্যবহার দেখা যায়। এই লিপি থেকে পরবর্তীকালে নানা কালগত ও স্থানগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতের বহু লিপির জন্ম হয়েছে। লিপিবিশারদদের মতে ভারতে ব্রাহ্মী লিপির ব্যাপক প্রভাব। বিভিন্ন দেশের শতাধিক লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

৪.৪ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী লিপির উদ্ভবের ইতিহাস, তার বিস্তার পর্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পাবে। মিশরীয় লিপি থেকে চীনীয় লিপি, ভারতীয় লিপি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও শিক্ষার্থী ভারতে লিপির উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানাতে পারবে।

একক ৫ ❑ বাংলা লিপির বিবর্তন

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ বাংলা লিপির উদ্ভব

৫.৪ সারসংক্ষেপ

৫.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- কোন্ প্রাচীন ভারতীয়-লিপি পদ্ধতি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব।
- বাংলা লিপির উদ্ভব কবে হয়?
- বাংলা লিপির বিবর্তনের স্তরগুলি কী কী?
- লিপির বিবর্তনের কিছু নমুনা।

৫.২ প্রস্তাবনা

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন কাঠামো তৈরি হতে থাকে। সম্রাট অশোক-এর সময় থেকে ব্রাহ্মী লিপির প্রভাব ও লোকপ্রিয়তা আরও বাড়তে থাকে। বাংলাদেশেও ব্রাহ্মী লিপির প্রভাব পড়ে। নানা সংস্কার ও রূপ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কুটিল লিপির আদল তৈরি হয়। পরে বাংলার নিজস্ব লিপির উদ্ভব। আমরা পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতামতের আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

৫.৩ বাংলা লিপির উদ্ভব

বাংলা লিপির মূল উৎস খুঁজতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে খ্রিস্টপূর্ব যুগের ব্রাহ্মী লিপি-পদ্ধতির ইতিহাসে। আগে আলোচিত হয়েছে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ব্রাহ্মী লিপির ব্যাপক ব্যবহার ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের ভাষায় কীভাবে দেখা দিয়েছিল। খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সহস্রাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপির আধিপত্য বজায় ছিল। বৌদ্ধ ও জৈনদের সাহিত্য ও শিলালিপিতে ব্রাহ্মী লিপিই বেশি ব্যবহৃত। 'ললিতবিস্তার' গ্রন্থে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে বলে জানা যায়। এমনকি সেখানে 'বঙ্গলিপি'র নামও উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মী লিপিই নিজের আদল পাল্টে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নিজের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে খোদিত মহাস্থানগড় লিপিকে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপি বলে গণ্য করা হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রাজা কণিষ্কের শাসনকালে যে-সব লিপি পাওয়া গেছে, সেগুলির সঙ্গে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির সাদৃশ্য যথেষ্ট।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে অর্থাৎ গুপ্ত যুগে, পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মী লিপিরই এক নতুন রূপ দেখা দেয়, তা 'গুপ্তলিপি' নামে খ্যাত। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে এই লিপি থেকে উদ্ভব ঘটে 'কুটিল লিপি'র। প্রাকৃত ভাষায় শেষ পর্যায়ে এই লিপিরই ব্যবহার বেশি। উল্লেখ করা যায় যে, এই সময় থেকে অক্ষরের ওপর মাত্রাদানের রীতিও প্রচলিত হয়। পূর্ব ভারতে এই লিপিই 'সিদ্ধমাতৃকা লিপি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। উল্লেখ করা যায় যে, একই সময়ে ভারতের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপি থেকে নাগর-লিপি (নাগরী বা দেবনাগরী)-র উদ্ভব। এই লিপিরও জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট।

লিপিবিশারদগণ মনে করেন, কুটিল লিপি থেকেই সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা লিপির উদ্ভব। প্রাচীন পুথিতে বাংলা লিপির যে রূপ দেখা দেয় তার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে বাংলা বর্ণমালা নিজস্ব রূপ পেতে শুরু করেছে খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকে। পাল ও সেনযুগের নাম তাম্রশাসনে প্রত্ন-বাংলা লিপির কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায় যার গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলিতে বাংলা লিপির ক্রমবিকাশের পদচিহ্ন স্পষ্ট। মোটামুটিভাবে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে অধিকাংশ বাংলা অক্ষরের নিজস্ব কাঠামো স্পষ্ট উঠেছে।

নাগরী লিপির যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি এক সময় দেখা গিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলা লিপি, নাগরী লিপি থেকে উদ্ভূত। নাগরী লিপির সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলা অক্ষরের সাদৃশ্য দেখা গেলেও একালের বিশেষজ্ঞরা প্রায় সকলেই একমত যে, নাগর বা দেবনাগরী অক্ষর নয়, ব্রাহ্মী অক্ষর থেকেই বাংলার লিপির জন্ম। আসলে দেবনাগরী অক্ষর ব্রাহ্মী লিপিরই এক ভিন্ন রূপ মাত্র। এ বিষয়ে ড. রামেশ্বর শ'-এর মন্তব্য স্মরণ করা যাতে পারে—"বাংলা লিপির যেসব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ— যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন বাংলা লিপি নাগরী লিপি থেকে জন্মলাভ করে নি, বাংলা লিপি-নাগরী লিপির সঙ্গে সমান্তরাল স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশলাভ করেছিল।"

অসংখ্য শিলালিপি, তাম্রশাসন ও পুথিতে বাংলা লিপির প্রাচীন রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্গলিপির প্রাচীনতম রূপটি পাওয়া যায় সম্ভবত নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে। লিপির সময়কাল নবম শতকের শেষভাগ। বস্তুত পাল রাজাদের সময়েই বাংলা লিপি কুটিল লিপির গাত্রাবরণ ছেড়ে নিজস্ব গঠন-বৈশিষ্ট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করতে শুরু করে। পালযুগে, সেন রাজাদের রাজত্বকালে বঙ্গলিপির নিজস্বতা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়েই বহু অক্ষরের কাঠামোর সঙ্গে একালের বাংলা অক্ষরের গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। রাজা বিজয় সেনের দেওলপাড়া লিপি (১১শ শতক) ও রাজা লক্ষণসেনের সময়কালের লিপি (১২শ শতক) পরীক্ষা করলে বাংলা অক্ষরের প্রাচীন রূপের আদল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে।

পণ্ডিতদের মতে বাংলা লিপির প্রাচীন নিদর্শনগুলির অন্যতম 'চর্যাগীতি'র পাণ্ডুলিপি। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতির যে পুথি নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তা এর মূল পাণ্ডুলিপি নয়। অনুলিখিত পুথিতে লিপিকাল অনুপস্থিত। ঠিক কবে এর অনুলিপি প্রস্তুত হয়েছে এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর যথেষ্ট।

ড. সুকুমার সেনের মতে চর্যাগীতির পুথির লিপিকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের অন্যান্য নিদর্শনের সঙ্গে চর্যাগীতির পুথির অক্ষরের গভীর সাদৃশ্য দেখে নিশ্চিত যে পুথির রচনাকাল দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ। ড. রামেশ্বর শ' মনে করেন চর্যা-পুথির লিপিকাল খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক।

বাংলা লিপির বিবর্তনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পাণ্ডুলিপির মূল্যও অনস্বীকার্য। এর একটিমাত্র পুথি পাওয়া গেছে। লিপিকাল সংশয়াতীতভাবে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক। লিপি-বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলা লিপির সুগঠিত ও পূর্ণ বিকশিত রূপটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পাওয়া যাচ্ছে।

পরবর্তীকালে হস্তলিখিত পুথিতে বাংলালিপির আর তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। যা কিছু পরিবর্তন ও সৌন্দর্যবিধান তা হয়েছে, তা মূলত লিপিকরের হস্তাক্ষরের বিশেষত্বের কারণে। তারপর, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ছাপাখানার আবির্ভাবের পর থেকে লিপিকে মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী করে তোলার জন্য বাংলা লিপিচিত্রের ধারায় নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

লিপির নমুনা: ড. সুকুমার সেন প্রদত্ত কয়েকটি নমুনা থেকে প্রাচীন পারসিক বাণমুখ লিপি, সম্রাট অশোকের সমকালীন ব্রাহ্মী লিপি ও আদি যুগের গঠন ও আকৃতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি:

প্রাচীন পারসিক বাণমুখ লিপির নমুনা:

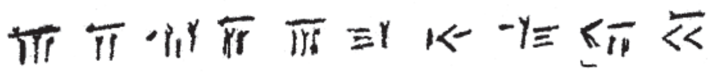

অ দ ম্ দ অ র্ য় ব উ ষ

সম্রাট অশোকের সময়ের ব্রাহ্মী লিপি:

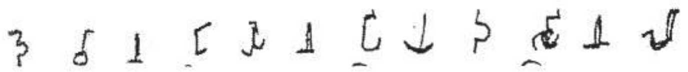

দে বা ন পি য়ে ন পি য় দ সি ন লা

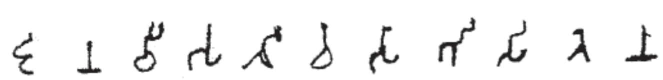

জি ন বী স তি ব সা ভি সি তে ন

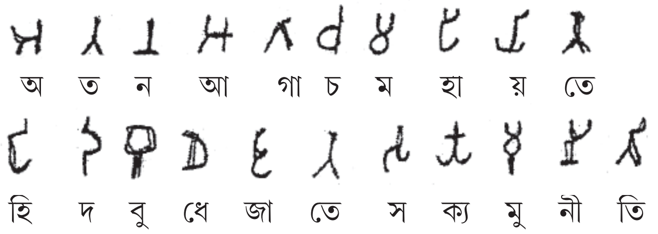

দ্বাদশ শতকের বাংলা লিপি:

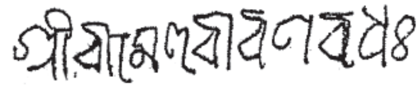 (শ্রীরামেণ রাবণবধঃ)

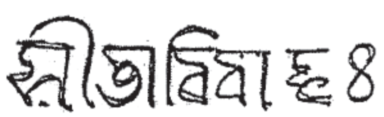 (সীতাবিবাহঃ)

বাংলা লিপির ক্রমবিবর্তনের কয়েকটি নমুনা:

যদি লিপির বিবর্তনের রূপ-চিত্র দেখা যায়, তাহলে খ্রিস্টপূর্বাব্দ কালের ব্রাহ্মী লিপি থেকে গুপ্তযুগের কুটিল লিপি হয়ে কীভাবে বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এই বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হবে। সংশ্লিষ্ট ছকে কিছু বাংলা অক্ষরের বিবর্তন দেখানো হলো :

ব্রাহ্মী লিপি	কুটিল লিপি	প্রাচীন বাংলা লিপি (চর্যার পুথি অনুযায়ী)	মধ্যযুগের বাংলা লিপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি অনুযায়ী)	আধুনিক বাংলা লিপি
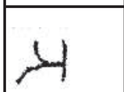	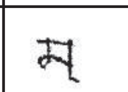	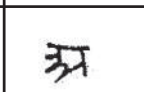	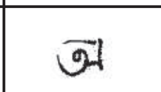	অ
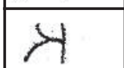		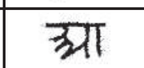	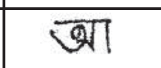	আ
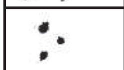	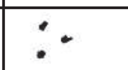	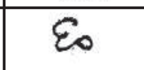		ই
				এ
	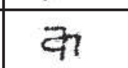		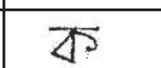	ক
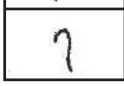	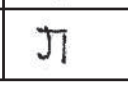	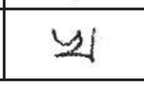	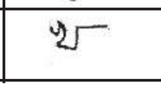	খ

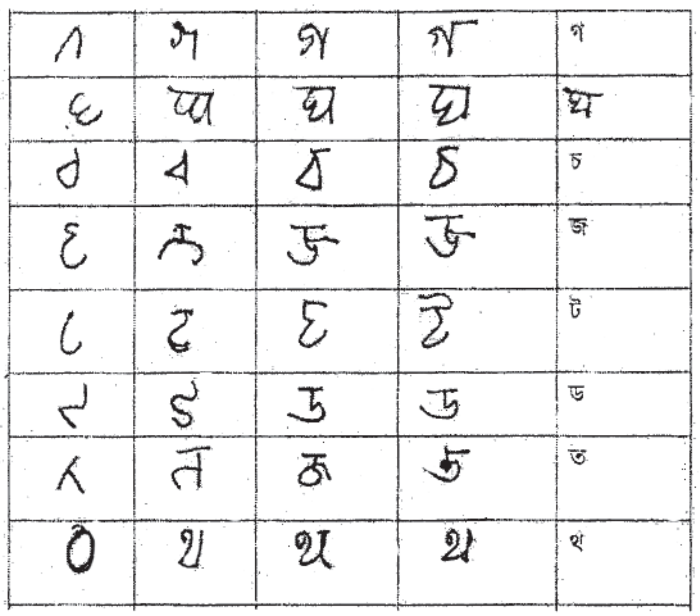

৫.৪ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাংলা লিপির উদ্ভব, বিকাশ, প্রাপ্তিস্থান, নিদর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। এই এককে আমরা বাংলা লিপির কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছি, যা শিক্ষার্থীকে বাংলা লিপির স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে সাহায্য করবে।

প্রশ্নাবলি:

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১. ভাষা বলতে কী বোঝায়? এর স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. প্রতীকদ্যোতনা ভাষার এক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। —এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৩. ভাষার বংশবৃদ্ধির কারণ কী? কীভাবে ভাষার বংশবৃদ্ধি হয়? দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দিন।

৪. ভারতে কোন্ কোন্ প্রাচীন ভাষাবংশের বিস্তার ঘটেছিল? সেগুলির পরিচয় দিন।

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিখুন।

৬. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের বিবর্তনের পর্যায়গুলি নির্দেশ করে এই ভাষাবংশ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব কীভাবে হয়েছে, বুঝিয়ে লিখুন।

৭. প্রচলিত ব্যাকরণের সঙ্গে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য বিষয়ে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৮. একালে ব্যাকরণ বা ভাষাবিজ্ঞানের যে বিভিন্ন ধারা জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলির পরিচয় দিন।

৯. আধুনিক লিপিসমূহ কোন্ কোন্ প্রাচীন লিপি-পদ্ধতি থেকে এসেছে? সেই ধারাগুলি বিষয়ে আলোচনা করুন।

১০. বাংলা লিপির বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করুন।

১১. ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পৈতৃক সম্পদ নয়, তা অর্জন করতে হয়।—এরূপ উক্তির তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।

১২. মনুষ্যেতর প্রাণীর মুখোচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টিকে কি ভাষা বলা যায়? যুক্তিসহ আপনার মত জানান।

১৩. পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ভাষাবংশগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৪. প্রাচীন ভাষাবংশগুলির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গুরুত্ব বিচার করুন।

১৫. ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথাচালিত ব্যাকরণের রীতিপদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

১৬. লিপির উদ্ভবের পিছনে কী কী কারণ ছিল বলে আপনার মনে হয়?

১৭. লিপির বিকাশের ধারায় প্রাচীন পর্যায়গুলি কী—আলোচনা করুন।

১৮. ব্রাহ্মী লিপি-পদ্ধতির উদ্ভব বিষয়ে পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতের আলোচনা করুন।

১৯. প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করুন।

২০. বাংলা লিপির প্রাচীন ও মধ্যযুগের নিদর্শন বিষয়ে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত ভাষার সংজ্ঞা দিন।

২. ভাষা সম্পর্কে প্লেটোর মন্তব্য লিখুন।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের বিভিন্ন উপভাষার নাম লিখুন।

৪. উইলিয়াম জোন্‌স কে ছিলেন?

৫. ভাষা-গবেষণার কাজে গবেষকের প্রথম দায়িত্ব কী?

৬. লিপির উদ্ভব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কী ছিল?

৭. ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীন নিদর্শনের নাম লিখুন।

৮. গ্রন্থিলিপি কী?

৯. চর্যার পুথির লিপিকাল কী?

১০. বাংলা লিপির উদ্ভব কোন্ লিপি থেকে?

১১. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: সেমীয়-হামীয়, বান্টু, দ্রাবিড় ভাষাবংশ, কেন্তম্ ও সতম্ গুচ্ছ, অস্ট্রিক ভাষা পরিবার, এস্কিমো।

১২. সংক্ষেপে আলোচনা করুন: আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত ব্যাকরণের সংজ্ঞা, নির্দেশমূলক ব্যাকরণ, সাংস্কৃতিক ব্যাকরণ, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান।

১৩. সংক্ষেপে আলোচনা করুন: লিপির উদ্ভবের কারণ, শব্দলিপি, ভাব-চিত্রলিপি, বাণমুখ লিপি, আরামীয় লিপি, ফিনিসীয় লিপি।

১৪. সংক্ষেপে আলোচনা করুন: নাগর লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির সম্পর্ক, দেওলপাড়া লিপি।

১৫. সংক্ষিপ্ত আলোচনা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির লিপিকাল, অশোকের অনুশাসনগুলির সময়কাল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২. *ভাষার ইতিবৃত্ত*—সুকুমার সেন।

৩. *বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা*—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৪. *বাংলা ভাষা*—পার্বতী কুমার ভট্টাচার্য।

৫. *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*—রামেশ্বর শ'

৬. *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*—পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৭. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*—নির্মল দাশ।

৮. *ভাষা জিজ্ঞাসা*—পবিত্র সরকার।

৯. *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*—পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

১০. *ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা*—সুভাষ ভট্টাচার্য।

১১. *Language*—Leonard Bloomfield.

১২. *Linguistics*—David Crystal.

১৩. *An Introduction to Descriptive Linguistics*—H.A.Gleason.

মডিউল ২

ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা ধ্বনির পরিচয়, ধ্বনিপরিবর্তন, শব্দার্থতত্ত্ব, শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ ও ধারা, বাংলা শব্দের রূপতত্ত্ব, বাংলা পদগঠন প্রক্রিয়া

একক ৬ ❑ ধ্বনিতত্ত্ব

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ ধ্বনি বিশ্লেষণের নানা অভিমুখ: ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিচার

৬.৪ সারসংক্ষেপ

৬.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- ধ্বনিতত্ত্ব কী?
- ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচারের সম্বন্ধ কী?
- বাগ্‌যন্ত্রের গঠন কী রূপ?
- বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে ধ্বনি সৃষ্টির কাজে অংশ নেয়?
- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য কীভাবে তৈরি হয়?

৬.২ প্রস্তাবনা

ভাষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধ্বনি। তাই ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণ, উচ্চারণ-প্রকৃতি নির্ধারণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধ্বনির আলোচনার নানা দিক রয়েছে। কীভাবে আমাদের শরীরের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বাগ্‌যন্ত্রে ধ্বনি তৈরি হয়, প্রথমেই সেই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। ধ্বনির উচ্চারণকালে আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ কীভাবে কাজ করে, শ্বাসবায়ুর গতিপ্রকৃতিই বা কী হয়, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির প্রকারভেদ, প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণগত বিশেষত্ব ও উচ্চারণ-স্থান নির্দেশ প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকেন। আমরা প্রথমে এই দিকগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করব।

৬.৩ ধ্বনি বিশ্লেষণের নানা অভিমুখ: ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিচার

ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় চারটি বিষয় প্রধান্য পেয়ে থাকে। এগুলি হল: ১। ধ্বনিতত্ত্ব ২। রূপতত্ত্ব।

৩। শব্দার্থতত্ত্ব ও ৪। পদতত্ত্ব বা বাক্যরীতি। এই চার বিষয়ের মধ্যে ধ্বনিতত্ত্বের গুরুত্ব ও বিষয়-বৈচিত্র্য তুলনায় অধিক। বোঝার সুবিধার জন্য 'ধ্বনিতত্ত্ব' শব্দটি বহু ব্যবহৃত হলেও বস্তুত ধ্বনি-সম্পর্কিত আলোচনার পরিধি অনেক বড়, বিশ্লেষণের পদ্ধতিও নানা বৈচিত্র্যে ভরা। ধ্বনি সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা তিনটি ধারায় ভাগ করেছেন: ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিচার ও ধ্বনিতত্ত্ব।

ড. সুকুমার সেন এদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদের দিকগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> "কোন ভাষায় যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহৃত হয় তাহার উচ্চারণের শরীর-বিশ্লেষণ (অর্থাৎ বাগযন্ত্রের [যৎ] ও শ্রবণযন্ত্রের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ) ও তদনুসারে উচ্চারিত ও শ্রুত ধ্বনির প্রকৃতিবিচার ও শ্রেণীবিভাগ ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়। কোন একটি বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহারিক বিচারবিশ্লেষণ ধ্বনি বিচারের আলোচ্য। কোন একটি বিশেষ ভাষায় কালে কালে যে-ধ্বনিপরিবর্তন ঘটিয়া আসিয়াছে তাহার ধারাবাহিক আলোচনা ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়।"

প্রভেদের বিষয়টি বোঝাতে ড. সুকুমার সেন বাংলা 'এ' ধ্বনির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

> "এ-কারের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া-নির্ণয় ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়; ধ্বনিটির প্রকৃতি ও অনুরূপ ধ্বনির সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় বাঙ্গালা ধ্বনিবিচারের বিষয়; সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের ও তাহা হইতে পুরানো বাঙ্গালার মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত এ-কারের ইতিহাস আলোচনা বাঙ্গালা ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়।"

ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনার একটি প্রধান বিষয় হল বাগ্‌যন্ত্রের গঠন ও বাগ্‌ধ্বনি সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যধারার পরিচয়। ভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ভাষা মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টি। অন্যভাবে যদি কোনো ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়, তাকে ভাষার মধ্যে ফেলা যাবে না, কারণ তা বাগ্‌ধ্বনি নয়। ভাষাসৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র বাগযন্ত্রের। তাই ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনায় বাগ্‌যন্ত্রের গঠন ও বাকসৃষ্টির প্রণালী সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা আবশ্যক।

কেমন দেখতে হয় বাগ্‌যন্ত্র? ধ্বনি সৃষ্টির কাজে এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে অংশ নেয়? মুখের ভেতর শ্বাসবায়ুর গতি-প্রকৃতি কী রূপ হয়? উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী কীভাবে বাগ্‌ধ্বনির বৈচিত্র্য সাধিত হয়? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা এই জাতীয় নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজেন।

বাগ্‌যন্ত্রের গঠন:

বাগ্‌যন্ত্রের গঠন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীচের ছবিতে দেখানো হল:

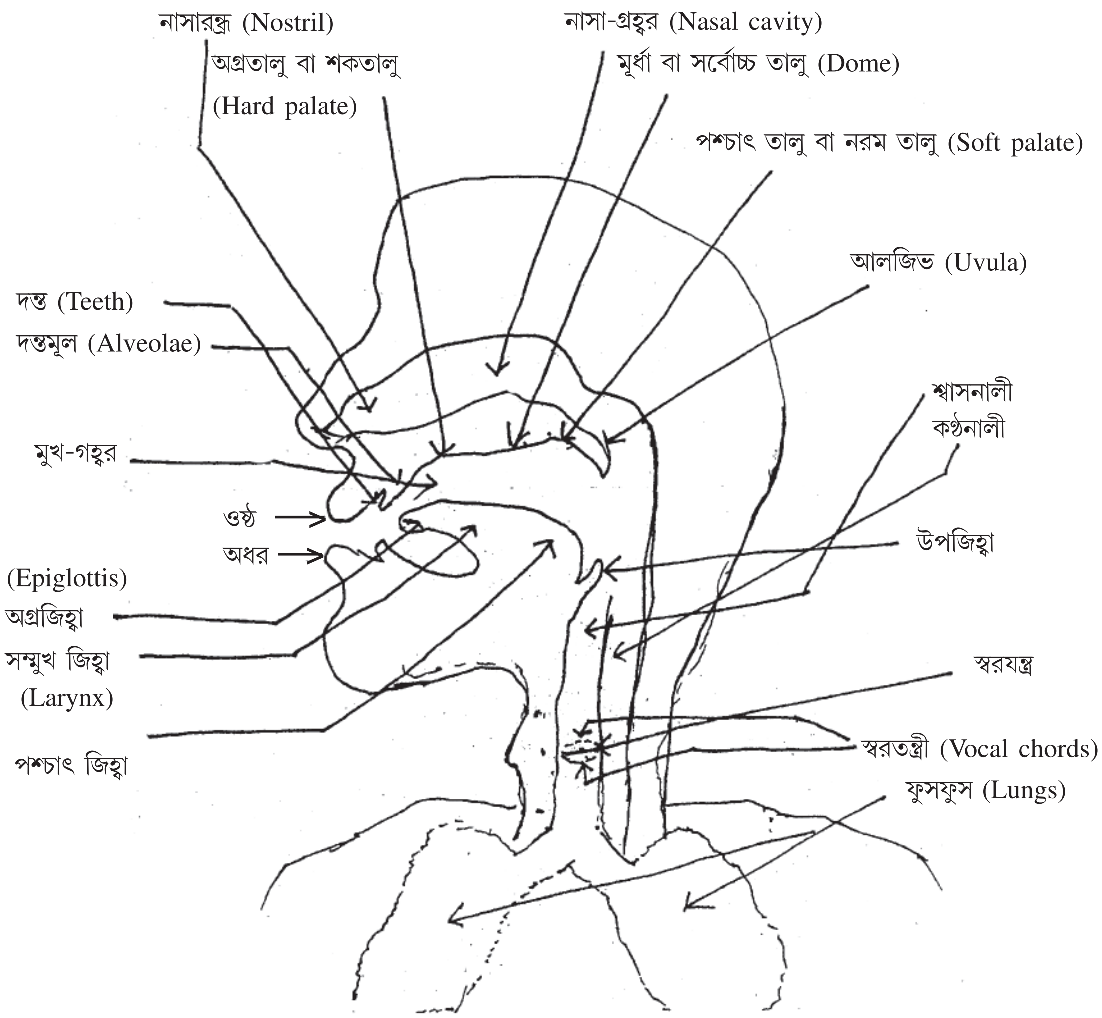

বাগ্‌যন্ত্রের কার্যাবলি: কীভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি তৈরি হয়?

বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে শুধু কথা বলার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা নয়। নাম যদিও যন্ত্র, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি এদের প্রাথমিক কাজ ও অবশ্যই জীবনধারণের পক্ষে বেশি জরুরি কাজ। বাগ্‌ধ্বনি সৃষ্টি করা বাগ্‌যন্ত্রের গৌণ কাজ। কীভাবে উচ্চারণ-প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবার তা দেখা যাক।

বাকসৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় ফুসফুস থেকে। বাকসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন কণ্ঠনালী, মুখ-গহ্বর ও নাসা গহ্বরে

বহির্গামী শ্বাসবায়ুর প্রবাহ। ফুসফুস নিজে কোনো ধ্বনি উচ্চারণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয় না, অথচ তাকে ছাড়া বাগ্‌ধ্বনি তৈরির কাজ অসম্ভব। ফুসফুস নিরন্তর শ্বাসবায়ুর প্রবাহকে চালিত রেখে আমাদের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে — জীবনবিজ্ঞানের এই তথ্য সবার জানা। একই সঙ্গে আমাদের কথা বলার প্রক্রিয়াতেও তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যখন কথা বলার প্রয়োজন হয়, তখন কামারশালার হাফরের মতো সে ফুসফুসের ভেতরের বাতাস চাপ দিয়ে বাইরের পথে স্বরযন্ত্রের দিকে চালিত করে। স্বরযন্ত্র কণ্ঠনালীর নিম্নভাগে অবস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ 'ভাল্ব' জাতীয় অঙ্গ। স্বরযন্ত্রের মুখে বসানো রয়েছে বিশেষ আকারের দুটি পাতলা ঝিল্লী— মাঝখানে-কাটা অতি ক্ষুদ্রাকার এক পর্দা। এর নাম স্বরতন্ত্রী বা কণ্ঠতন্ত্রী (Vocal chords)।

কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী শ্লথ থাকে, তখন শ্বাসবায়ু অবাধে বেরিয়ে যায়। এই ধ্বনিগুলিকে বলা হয় অঘোষ (voiceless) ধ্বনি। আবার কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠতন্ত্রী প্রসারিত হয়ে শ্বাসবায়ুর গতিপথ রোধ করে। বায়ুপ্রবাহ সে বাধা ঠেলে বেরিয়ে যায়। শ্বাসবায়ুর নির্গমন কালে ঝিল্লীর পর্দায় কম্পন লাগে ও সৃষ্টি হয় এক প্রকার সুর, নাদ বা ঘোষ (voice)। তাই এদের নাম সঘোষ (voiced) ধ্বনি।

শ্বাসবায়ু এবার কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। কণ্ঠনালীতে বাধা পেলে সৃষ্টি হয় কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনি (gutturals)। বাংলা 'হ' ধ্বনির উচ্চারণস্থান কণ্ঠনালী। এই প্রকার ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সক্রিয় ভূমিকা নেই, কণ্ঠের পেশীর আকুঞ্চনের দ্বারা শ্বাসবায়ুর পথ সাময়িকভাবে রোধ করা হয়। কণ্ঠনালীয় ও ওষ্ঠধ্বনি ছাড়া অন্য সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা বেশি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। স্বরধ্বনির উচ্চারণেও জিহ্বার সক্রিয়তা লক্ষনীয়।

কণ্ঠনালীর পরবর্তী উচ্চারণস্থান কণ্ঠের ওপরের অংশ বা তালুর পশ্চাৎ ভাগ। জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ তালুর পশ্চাৎ ভাগে ঠেকিয়ে যদি শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা দেয়া হয় তবে উচ্চারিত হয় কণ্ঠ্যধ্বনি। 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ' ইত্যাদি কণ্ঠ্যধ্বনি।

মুখ-গহ্বরের সামনের দিকে অগ্রতালুতে উচ্চারিত হয় তালব্য ব্যঞ্জন। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখ ভাগ তালুকে স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর পথে বাধা দান করে। আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, বাংলা 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ', 'ঞ' প্রভৃতি ধ্বনি এই শ্রেণিভুক্ত। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারনের সময় জিহ্বা তালু ও দন্তমূলের সংযোগস্থলে ধাক্কা দেয়, তাই একে তালু-দন্ত্যমূলীয় ধ্বনিও বলে।

প্রবাহিত শ্বাসবায়ুর পরবর্তী বাধার স্থান মূর্ধা। জিহ্বাগ্র উলটে তালুর ওপরের অংশ (Dome) স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর পথ রুদ্ধ করে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি সৃষ্টি হয়। 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ', 'ণ' হল মূর্ধন্য ধ্বনি।

ওপরের পাটির দাঁতের পশ্চাতে সংলগ্ন হয়ে জিহ্বা তৈরি করে দন্ত্য ধ্বনি। এই স্থানের সামান্য ওপরের অংশ বা দন্তমূল অনুরূপভাবে দন্তমূলীয় ধ্বনির উদ্ভব-স্থল। 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ', 'ন' ইত্যাদি এই ধ্বনির উদাহরণ।

ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী উচ্চারণস্থান হলো ওষ্ঠদ্বয়। উচ্চারিত ধ্বনির নাম ওষ্ঠ্য ধ্বনি। প্রথমে দুই ঠোঁট বন্ধ করে শ্বাসবায়ুর নির্গমন-পথ রুদ্ধ করা হয় ও পরে ঠোঁট খুলে শ্বাসবায়ুর প্রবাহ মুক্ত করে উচ্চারিত হয় 'প', 'ফ', 'ব', 'ভ', 'ম' প্রভৃতি ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

বাগ্‌যন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নাসা-গহ্বর। কণ্ঠনালী থেকে শ্বাসবায়ুর নির্গমন পথ দুভাগে ভাগ হয়েছে। একটি পথ ওপরের দিকে নাসা-গহ্বরে ও অন্যটি মুখ-গহ্বরে। দুটি গহ্বর যেন দ্বিতল বাড়ির নীচের তলা ও ওপরের তলা। কণ্ঠনালী ধরে শ্বাসবায়ু ওপরের দিকে এসে নাসা-গহ্বর ও মুখ-গহ্বর দিয়ে বের হয়। প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে শ্বাসবায়ু যে-কোনো একটি পথে সঞ্চালিত হতে পারে। অবশ্য মুখ-গহ্বরের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। শ্বাসবায়ু নাসা পথে বেরোবার সময় একটি আনুনাসিক অনুরণন শোনা যায়। এর থেকে নাসিক্য ব্যঞ্জনের উৎপত্তি। বাংলা 'ঙ', 'ঞ', 'ণ', 'ন', 'ম' ধ্বনি এই শ্রেণীর।

৬.৪ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব-এর স্বরূপ, পার্থক্য, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই সুত্রে বাগযন্ত্র, ধ্বনি উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

একক ৭ ❑ বাংলা ধ্বনির পরিচয়

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ বাংলা ধ্বনির পরিচয়: স্বরধ্বনি

৭.৪ সারসংক্ষেপ

৭.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- ধ্বনিকে কেন স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য কোথায়।
- মৌলিক স্বরধ্বনি কী।
- মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে বাংলা স্বরধ্বনির পার্থক্য কোথায়।
- বাংলা স্বরধ্বনির বর্গীকরণ কীভাবে করা হয়।
- ছকের সাহায্যে মৌলিক স্বরধ্বনি ও বাংলার মূল স্বরধ্বনিগুলির অবস্থান নির্দেশ।
- বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ কীভাবে করা হয়।

৭.২ প্রস্তাবনা

প্রত্যেক ভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেতে গেলে সেই ভাষার উচ্চারিত ধ্বনিগুলির পৃথক পৃথক পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক। উচ্চারণগত প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে ধ্বনিকে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিরূপে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জনের এক-একটি নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় এভাবেই উচ্চারণগত ব্যবধান তৈরি হয়। আবার কোনো এক নির্দিষ্ট ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণের বিশেষত্বও চিরকাল একই রকম থাকবে — তা মোটেই নয়। এদের পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। আবার এও এক লক্ষণীয় বিষয় যে, প্রচলিত বর্ণমালার সঙ্গে মুখে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের সামঞ্জস্য নেই। সব ভাষার ক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটে থাকে। লিখিত রূপের সঙ্গে উচ্চারিত কথ্য রূপের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আসলে ভাষার কথিত রূপটির ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য যত দ্রুত পাল্টায়, সেই ভাষার লিখিত বা লিপিবদ্ধ রূপকে তত দ্রুততার সঙ্গে বদলে দেওয়া সম্ভব হয় না। মৌখিক ধ্বনিরূপ এগিয়ে যায়,

তার লিখিত রূপ পিছিয়ে থাকে। ধরা যাক 'সবিশেষ' শব্দটি। এতে 'স, শ, ষ' রয়েছে -- সংস্কৃতে এদের পৃথক উচ্চারণ নির্দিষ্ট, কিন্তু এই তৎসম শব্দটি যখন বাংলায় উচ্চারিত হয় তখন উচ্চারণ দাঁড়ায় — 'শবিশেশ'। সহস্র বছর ধরে বাঙালিরা এই উচ্চারণ করে আসছে, তবুও শব্দটির বানান সংস্কৃতেরই মতো রয়ে গেছে। 'আর্য', 'সূর্য', 'ঋষি', 'দক্ষ', 'লক্ষ্মী', 'শ্মশান', 'আহ্লাদ', 'আহ্নিক' -এমন শত শত শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা।

বাংলায় সুদীর্ঘকাল থেকে যে-অক্ষরমালা প্রচলিত আছে তা মূলত সংস্কৃত থেকে গৃহীত। অথচ সংস্কৃতের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ-রীতি, উচ্চারণ-প্রকৃতি, শ্বাসবায়ুর প্রবাহ, ধ্বনির উচ্চারণ-স্থানের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যই বেশি। তাই প্রচলিত অক্ষরমালার ভিত্তিতে নয়, একালের মৌখিক উচ্চারণের ভিত্তিতে প্রত্যেক ভাষার ধ্বনিসমষ্টির চিহ্নিতকরণ ও বর্গীকরণের কাজ জরুরি।

এই এককে ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য-বিচার ও শ্রেণিকরণ দেখানো হবে।

৭.৩ বাংলা ধ্বনির পরিচয়: স্বরধ্বনি

স্বরতন্ত্রী থেকে নির্গমনের পর নিঃশ্বাসবায়ু মুখগহ্বরে কোথাও বাধা না পেলে সেই ধ্বনিকে বলা হয় স্বরধ্বনি। জিহ্বার অবস্থান, ওষ্ঠাধর ও মুখগহ্বরের আকুঞ্চন-প্রসারণের ওপর এদের প্রকৃতি নির্ভর করে। যে-কোনো ভাষার স্বরধ্বনির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমেই মৌলিক স্বরধ্বনি সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal vowels)-র পরিচয়:

আমরা আগে বলেছি, বর্তমান পৃথিবীর মোট ভাষার সংখ্যা সাত হাজারের সামান্য বেশি। প্রতিটি ভাষার ধ্বনি সম্পদ এতই নিজস্ব বৈচিত্র্যে পূর্ণ, যে সব ভাষার উচ্চারিত স্বর (ও ব্যঞ্জনধ্বনি) -এর চিহ্নিতকরণের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের ইয়ত্তা পাওয়া কঠিন। প্রত্যেক ভাষায় উচ্চারণের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, ফলে স্বরধ্বনির সংখ্যাও এক-এক রকম। তার ওপর উচ্চারিত স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্যও নিয়ত পরিবর্তনশীল। এককালিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় স্বরধ্বনির বিশেষত্ব নির্ধারণ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মুখ-গহ্বরে জিহ্বার অবস্থান লক্ষ করে ভাষাবিজ্ঞানীরা উচ্চারিত স্বরধ্বনি চেনার উদ্দেশে একটি 'মানদণ্ড' কল্পনা করেছেন ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য স্বরধনির মধ্যে তাঁরা মোট আটটি ধ্বনিকে মূল ধ্বনি রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই ধ্বনিগুলিকে বলা হয় মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal vowels)। এই আটটি ধ্বনি হল:

i (ই), e (এ), ɛ (অ্যা), a (আ'), ɑ (আ), ɔ (অ), o (ও), u (উ)

এই স্বরধ্বনিগুলি বাস্তবে রয়েছে কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। এরা কোনো একটি ভাষার ব্যবহৃত স্বরধ্বনি নয়, সব ভাষার স্বরধ্বনিকে চেনার মান বা আদর্শ (standard) রূপে এই ধ্বনিগুলিকে দেখা হয়। এর ফলে মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে যে-কোনো ভাষার নিজস্ব স্বরধ্বনিগুলির প্রকৃত উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সহজ হয়। ছক-চিত্র দেখেই কোনো স্বরধ্বনির উচ্চারণগত বিশেষত্ব বুঝে নেওয়া যায়।

এমনকি, ভিন্ন ভাষী ব্যক্তির কাছে কোনো ভাষার স্বরধ্বনি চিনিয়ে দেওয়ার এমন সহজ পন্থা আর দ্বিতীয়টি নেই। কোনো স্বরধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ কীভাবে করতে হবে — ছকের প্রচলিত মানদণ্ড-চিত্রে তার অবস্থান দেখিয়ে অন্যকে তা বোঝানো সহজ।

একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রতিটি ভাষার উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে এই মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন। স্বরধ্বনির চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিকরণের দুরূহ কাজ এর ফলে অনেকখানি সহজ হয়েছে।

মুখ-গহ্বরে জিহ্বার নানা অবস্থান দেখা যায়, যেমন— উচ্চ, মধ্য-উচ্চ, মধ্য-নিম্ন, নিম্ন, সম্মুখ, কেন্দ্রীয় ও পশ্চাৎ। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী অসংখ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা সম্ভব। উচ্চারণযোগ্য বা উচ্চারিত এরূপ মোট ২ হাজার ৫৪৯ টি স্বরধ্বনিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন।

ধ্বনিবিজ্ঞানীদের গবেষণায় আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, জিহ্বার সম্মুখ (Front) ও উচ্চ (High) অবস্থানের ধ্বনিগুলির উচ্চারণে আমরা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। জিহ্বার পশ্চাৎ অবস্থান আমাদের তত পছন্দ নয়। তাই সম্মুখ (Front) ও উচ্চ (High) স্বরের তুলনায় পশ্চাৎ স্বর (Back)-এর সংখ্যা কম।

স্বরধ্বনির ব্যবহারে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার প্রভেদ থাকাই সাধারণ নিয়ম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ভারতে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয় পাঞ্জাবি ভাষায়। এতে মোট ২০ টি স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্বীকৃত। সবচেয়ে কম সংখ্যক স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয় Eskimo-Alent ভাষায়। এতে রয়েছে মাত্র ৩ টি স্বরধ্বনি। সেগুলি হলো: ‘i’, ‘u’, ‘a’

স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি:

স্বরধ্বনির গুণগত ও প্রকৃতিগত শ্রেণিবৈচিত্র্য নির্ভর করে প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর। সেগুলি হল:

১। মুখ-গহ্বরে জিহ্বার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি

২। মুখ-গহ্বরের আয়তন এবং

৩। ওষ্ঠ ও অধরের আকৃতি

ড. রামেশ্বর শ' বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

> "এই রকমের শ্রেণিবিভাগ মুখগহ্বরে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের গতিপথের আকৃতির উপরে নির্ভর করে; সেই আকৃতি আবার নির্ভর করে জিহ্বার অবস্থানের উপর, মুখবিবরে শূন্যস্থানের পরিমাণের উপর এবং ওষ্ঠের আকৃতির উপর। জিহ্বা মুখের মধ্যে উপরে, নীচে, সামনে, পিছনে প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থানে থেকে এবং ওষ্ঠ নানারকম আকৃতি ধারণ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার ফলেই প্রধানত স্বরধ্বনিতে গুণগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, ফলে আমরা নানা ধরনের স্বরধ্বনি শুনতে পাই।"

স্বরধ্বনির বর্গীকরণ (classification)-ও তাই করা হয়ে থাকে মূলত উপরোক্ত তিনটি মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে। আমরা সংক্ষেপে বিষয়টি স্পষ্ট করছি।

১। মুখ-গহ্বরে জিহ্বার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি: স্বরধ্বনি (একই সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনিরও) উচ্চারণের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও ব্যস্ত থাকে যে-অঙ্গ, তার নাম জিহ্বা। কথা বলার সময় এক মুহূর্ত স্থির থাকার উপায় নেই জিহ্বার। প্রতিনিয়ত সে মুখ-গহ্বরের ভেতর — সামনে, পেছনে, ওপরে, নীচে ছোটাছুটি করে ও শ্বাসবায়ুর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের অভিপ্রেত ধ্বনিটির উচ্চারণ সম্ভব করে তোলে। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিটি স্বরধ্বনির উচ্চারণের (একই সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনিরও) প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ ই'-এর উচ্চারণের সময় জিহ্বার যে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে থাকার কথা, অন্য স্থানে সরে গিয়ে সেই ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব নয়। এর সঙ্গে মুখ-বিবরের আয়তন-প্রকৃতি ও ওষ্ঠাধরের আকৃতিও যথা-নির্দিষ্ট। 'উ'-র অবস্থানে গিয়ে আমরা 'আ' উচ্চারণ করতে অপারগ। শুধু জিহ্বার অবস্থান যে সুনির্দিষ্ট তা নয়, মুখ-গহ্বরের আয়তন ও ওষ্ঠাধরের আকৃতিও ধ্বনিবিশেষে সুনির্দিষ্ট।

স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কখনও সামনের দিকে এগিয়ে আসে, কখনও পেছনের দিকে সরে আসে। আবার কখনও ওপরের দিকে উঠে যায় বা নীচের সমতলে নেমে আসে। জিহ্বার বিভিন্ন অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে স্বরধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন:

ক) সম্মুখ স্বর (Front vowel): মৌলিক স্বরের তালিকাভুক্ত 'i', 'e', 'ɛ', 'a' বাংলার 'ই', 'এ', 'অ্যা', 'আ' স্বরধ্বনি সম্মুখ স্বর রূপে স্বীকৃত। জিহ্বার ওপর-নীচ অবস্থান অনুযায়ী সম্মুখ স্বরের চারটি ভাগ। যথা —

১। উচ্চাবস্থিত সম্মুখ স্বর (High front vowel): এই স্বরধ্বনিগুলি হল — মৌলিক স্বরধ্বনি 'i' বাংলার 'ই' প্রভৃতি। এক্ষেত্রে মুখ-গহ্বরে জিহ্বা সামনের দিকে এগিয়ে এসে সর্বোচ্চ অবস্থায় উঠে যায়।

২। মধ্য-উচ্চ সম্মুখ স্বর (High-mid front vowel): মৌলিক স্বরধ্বনির 'e' বাংলার 'এ' ইংরেজির 'bell', 'tell' ইত্যাদি শব্দের 'e' এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। জিহ্বা এক্ষেত্রে সম্মুখস্থিত হয়েও সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে কিছুটা নেমে যায়।

৩। মধ্য-নিম্ন সম্মুখ স্বর (low-mid front vowel): মৌলিক স্বরধ্বনির: 'ɛ', বাংলার 'অ্যা' এই শ্রেণিভুক্ত। এক্ষেত্রে জিহ্বা আরও খানিকটা নেমে আসে। বাংলা অক্ষরমালায় এই ধ্বনিটি নেই, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে আছে।

৪। নিম্ন সম্মুখ স্বর (Low front vowel): এই ধ্বনির উচ্চারণ কালে জিহ্বা মুখ-গহ্বরের সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে সর্বনিম্ন অবস্থায় থাকে। মৌলিক স্বরধ্বনির 'a' এই শ্রেণিভুক্ত। বাংলায় এই স্বরধ্বনি নেই।

খ) পশ্চাৎ-স্বর (Back vowel): মৌলিক স্বরের তালিকার অন্তর্গত 'a', 'ə','o','u'—এই চারটি ধ্বনি। পশ্চাৎ-স্বর রূপে চিহ্নিত। বাংলার 'অ', 'ও', 'উ' — তিনটি ধ্বনিও পশ্চাৎ-স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্ত। জিহ্বার ওপর-নীচ অবস্থান অনুযায়ী পশ্চাৎ-স্বরধ্বনির চারটি শ্রেণি। যথা:

১। উচ্চাবস্থিত পশ্চাৎ স্বর (High back vowel): মৌলিক স্বরধ্বনি 'u', বাংলা 'উ' এই শ্রেনির অন্তর্গত। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখ-গহ্বরের পেছনের দিকে সরে এসে ওপরের দিকে সর্বোচ্চ অবস্থায় যায়।

২। মধ্য-উচ্চ পশ্চাৎ স্বর (High-mid back vowel): জিহ্বা কিছুটা নেমে আসে। মৌলিক স্বরধ্বনি 'o' বাংলা 'ও' এই শ্রেণিভুক্ত।

৩। মধ্য-নিম্ন পশ্চাৎ স্বর (low-mid back vowel) : এই ধ্বনির উচ্চারণ কালে জিহ্বা আরও খানিকটা নীচে নেমে আসে। মৌলিক স্বর 'ə', বাংলা 'অ' এই শ্রেণিভুক্ত।

৪। নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বর (Low back vowel): এই ধ্বনির উচ্চারণ কালে জিহ্বা মুখ-গহ্বরের পেছনের দিকে সরে এসে মুখবিবরের সর্ব নিম্ন অবস্থায় থাকে। মৌলিক স্বর: 'a' শ্রেণিভুক্ত।

লক্ষণীয় যে, বাংলা 'আ' ধ্বনি নিম্নাবস্থিত স্বর হয়েও সম্মুখ বা পশ্চাৎ স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় না। এটি কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি (central low vowel) রূপে উচ্চারিত হয়।

২। মুখ-গহ্বরের আয়তন: মুখগহ্বরের আয়তন অর্থাৎ মুখবিবরের শূন্যতার পরিমাণের সঙ্গে স্বরধ্বনির সম্পর্ক গভীর। কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় শূন্যতার পরিমাণ বাড়ে, কখনো বা কমে। বাড়া বা কমার নিরিখে স্বরধ্বনিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১। সংবৃত স্বরধ্বনি (closed): মৌলিক স্বর 'i','u' বাংলা 'ই', 'উ' প্রভৃতি উচ্চাবস্থিত স্বর উচ্চারণের সময় মুখগহ্বর সর্বাধিক সংবৃত বা সঙ্কুচিত হয়। এগুলিকে তাই সংবৃত স্বর বলা হয়।

২। অর্ধসংবৃত (Half-closed): মৌলিক স্বর, 'e','o' বাংলা 'এ', 'ও' প্রভৃতি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখগহ্বরের আয়তন পূর্বোক্ত অবস্থার তুলনায় কিছুটা বড়ো হয়। এদের বলা হয় অর্ধসংবৃত স্বর।

অর্ধবিবৃত (Half-Open): মৌলিক স্বর 'ε','∂' 'অ্যা', 'অ' প্রভৃতি এই শ্রেণিভুক্ত। মুখবিবরের আয়তন এক্ষেত্রে আরও খানিকটা বেড়ে যায়।

৪। **বিবৃত (open):** মুখের ভেতরের শূন্যতা সর্বাধিক বেড়ে যায় এই ধ্বনিগুলি উচারণের সময়। মৌলিক স্বর '*a*a' বাংলা 'আ' প্রভৃতি ধ্বনি এই শ্রেণির অন্তর্গত।

৩। ওষ্ঠ ও অধরের আকৃতি: স্বরধ্বনি উচ্চারণের কাজে ওষ্ঠ ও অধরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বরধ্বনি অনুযায়ী কখনো ওষ্ঠ ও অধর প্রসারিত হয়, আবার কখনও কুঞ্চিত হয়। বাংলা 'ই', 'এ', 'অ্যা', 'আ' প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠাধর দু পাশে প্রসারিত হয়। এগুলিকে প্রসারিত (spread) ধ্বনি বলা হয়। প্রসারিত ওষ্ঠাধরের আকৃতি এরূপ:

অন্যদিকে 'উ', 'ও', 'অ' প্রভৃতি ধ্বনির উচ্চারণ-কালে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত ও বর্তুলাকার রূপ ধারণ করে। এগুলিকে তাই কুঞ্চিত বা বর্তুলাকার (rounded) ধ্বনি বলা হয়ে থাকে। ওষ্ঠাধরের আকৃতি হয়:

মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান: ছকের মাধ্যমে

আটটি মৌলিক স্বরধ্বনিকে ছকের সাহায্যে সাধারণত এইভাবে দেখানো হয়ে থাকে:

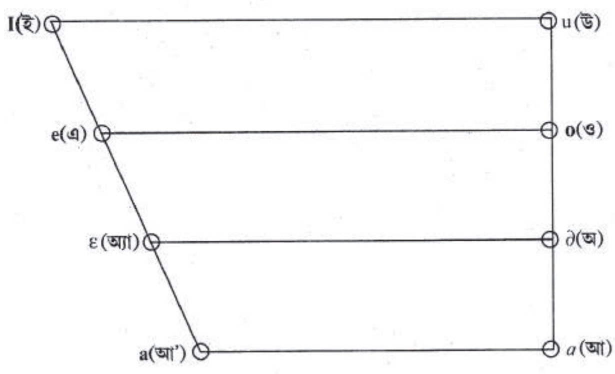

বাংলা স্বরধ্বনি

সংস্কৃতের অনুসরণে প্রচলিত অক্ষরমালায় এক সময় বাংলা স্বরধ্বনি দেখানো হত ১৩ টি—'অ', 'আ', 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', 'ঋ', 'ৠ', 'ঌ', 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ'। কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী এই সংখ্যা অনেক কম। বাংলায় উচ্চারিত মূল স্বরধ্বনির সংখ্যা মাত্র সাত। এগুলি হলো: 'অ', 'আ', 'ই', 'উ', 'এ', 'ও', 'অ্যা'।

দীর্ঘ 'ঈ', দীর্ঘ 'ঊ', দীর্ঘ 'ঋ' বাংলায় উচ্চারিত হয় না। 'ঌ' এর অস্তিত্ব ছিল একমাত্র প্রাচীন বৈদিকে, তাও নামমাত্র। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, কোনো প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষায় বা বাংলায় এই ধ্বনির উচ্চারণ একেবারেই নেই, তা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে এই স্বরধ্বনিটি হাজার বছর ধরে প্রচলিত অক্ষরমালায় টিকে রয়েছে। বাংলা স্বরধ্বনির তালিকায় এই মৃত ধ্বনি-চিহ্নকে বয়ে বেড়ানো অযৌক্তিক।

'ঐ' (ও + ই), 'ঔ' (ও + উ) — দুটিই যৌগিক স্বর। বাংলায় 'ঋ' ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির মতোই উচ্চারিত হয়—'ঋ' = র+ই। উল্লেখযোগ্য যে, 'অ্যা' ধ্বনিটি অক্ষরমালায় না থাকলেও বাংলায় পৃথক ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

মৌলিক স্বরধ্বনি ও বাংলা স্বরধ্বনির পার্থক্য

নীচের ছকে মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে বাংলা মূল স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা দেখানো হল:

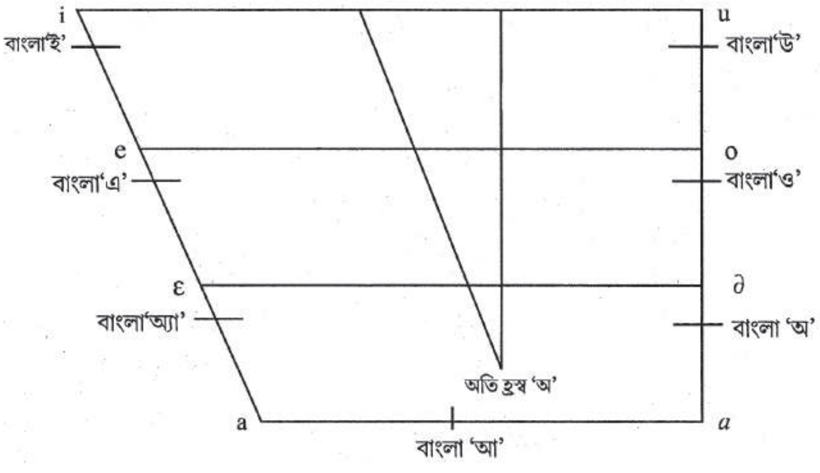

মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে বাংলা স্বরধ্বনির পার্থক্যের প্রধান দিকগুলি হল—

১। মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা আট, বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা সাত।

২। উচ্চাবস্থিত স্বর (ই, উ), মধ্য-উচ্চ স্বর (এ, ও) এবং মধ্য-নিম্ন স্বর (অ্যা, অ) মৌলিক স্বরধ্বনির মানদণ্ডের অবস্থান থেকে খানিকটা নীচে উচ্চারিত হয়। ওপরের ছকে তা দেখানো হয়েছে।

৩। মৌলিক স্বরের তালিকায় দুটি 'আ' (a,a) ধ্বনিকে স্বীকার করা হয়েছে। একটি সম্মুখ, অন্যটি পশ্চাৎ স্বর। বাংলায় এদের কোনোটিই নেই। বাংলার 'আ' কেন্দ্রীয় স্বর রূপে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ 'আ' উচ্চারণকালে জিহ্বা মুখগহ্বরে মাঝামাঝি শায়িত অবস্থানে থাকে।

৪। বাংলায় 'অ' ধ্বনি পশ্চাৎ স্বররূপে উচ্চারিত হলেও জিহ্বার কেন্দ্রীয় অবস্থানে অতি-হ্রস্ব ধ্বনি রূপেও এর ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলা মূল স্বরধ্বনি ও সেগুলির শ্রেণিবিভাগ

ছকের সাহায্যে বাংলা স্বরগুলির বর্গীকরণ দেখানো হলো:

	সম্মুখ, প্রসারিত	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ, কুঞ্চিত
উচ্চাবস্থিত, সংবৃত	ই		উ
মধ্য-উচ্চ, অর্ধসংবৃত	এ		ও
মধ্য-নিম্ন, অর্ধবিবৃত	অ্যা		অ
নিম্নাবস্থিত, বিবৃত		আ	

বর্গীকৃত বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নরূপভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে।

ই — উচ্চাবস্থিত, সংবৃত, সম্মুখ, প্রসারিত স্বরধ্বনি।

এ — মধ্য-উচ্চ, অর্ধসংবৃত, সম্মুখ, প্রসারিত স্বরধ্বনি।

অ্যা — মধ্য-নিম্ন, অর্ধবিবৃত, সম্মুখ, প্রসারিত স্বরধ্বনি।

আ — নিম্নাবস্থিত, বিবৃত, কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি। জিহ্বা মুখের ভেতর মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

অ — পশ্চাৎ, মধ্য-নিম্ন, অসংবৃত স্বরধ্বনি। ওষ্ঠাধর তখন বর্তুলাকার বা কুঞ্চিত রূপ নেয়।

ও — মধ্য-উচ্চ, অর্ধসংবৃত, পশ্চাৎ, কুঞ্চিত স্বরধ্বনি।

উ — উচ্চাবস্থিত, সংবৃত, পশ্চাৎ, কুঞ্চিত স্বরধ্বনি।

বাংলা ধ্বনির পরিচয়: ব্যঞ্জনধ্বনি

কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালী বা মুখ-গহ্বরে শ্বাসবায়ুর নির্গমনের পথে বাধা সৃষ্টি হলে সেই ধ্বনিকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। কখনও শ্বাসবায়ুর প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়, আবার কখনও-বা আংশিক। 'ক', 'খ', 'গ' প্রভৃতি স্পর্শ ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে জিহ্বা মুখের অভ্যন্তরে উচ্চারণ স্থানে সংলগ্ন থেকে নিঃশ্বাসবায়ুর পথ একেবারে রোধ করে, পরে জিহ্বা সরে গেলে ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। 'প', 'ফ' প্রভৃতি ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে ওষ্ঠ-অধর মিলিত হয়ে শ্বাসবায়ুর গতিপথ সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে। আবার 'র', 'ল', 'শ', 'স' প্রভৃতি ধ্বনির ক্ষেত্রে শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় না, আংশিক রুদ্ধ হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করা হয় কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে। যেমন—

১। মুখ-গহ্বরে ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান (Place of Articulation) অনুযায়ী

২। উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner of Articulation) অনুযায়ী।

উচ্চারণ-স্থান (Place of Articulation) অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয়

শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরে যে বিশেষ স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানের নাম অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির নাম হয়। শ্বাসবায়ুর বাধাপ্রাপ্তির প্রথম স্থান কণ্ঠনালীর নিম্নদেশ ও শেষ স্থান ওষ্ঠাধর— এই দিকে লক্ষ রেখে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নিম্নরূপভাবে সাজানো যেতে পারে:

১। স্বরতন্ত্রীয় (Glottal) 'হ'। অন্য নাম কণ্ঠনালীয় ধ্বনি। এই ধ্বনি কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে উচ্চারিত হয়। শ্বাসবায়ু স্বরতন্ত্রী থেকে বেরোনোর পরে কণ্ঠনালীতে পেশীর আকুঞ্চনের দ্বারা বাধা পেয়ে 'হ' ধ্বনি সৃষ্টি করে।

২। কণ্ঠ্যধ্বনি (Dorso-Velar)— 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ'— ক-বর্গের বাংলা ধ্বনিগুলি এই শ্রেণিভুক্ত। কোমল তালুর পশ্চাৎ অংশে জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা নিঃশ্বাসবায়ুর প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে এই ধ্বনি তৈরি হয়। তাই একে স্নিগ্ধ-তা লব্য ধ্বনিও বলে।

৩। তালু-দন্তমূলীয় (Palato-alveolar)— 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ', 'ঞ' ইত্যাদি ধ্বনি এই শ্রেণিভুক্ত। জিহ্বার প্রসারিত অগ্রভাগ দন্তমূলের ওপরের শক্ত অংশ ও সামনের দিকের তালুকে স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথ রুদ্ধ করে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করে।

৪। প্রতিবেষ্টিত বা মূর্ধন্য (Apico-Retroflex–cerebral)— 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ', 'ণ', 'ড়', 'ঢ়' ইত্যাদি ধ্বনি এই শ্রেণিভুক্ত। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র খানিকটা বাঁকা হয়ে মুখ-গহ্বরের ছাদের সামনের দিকে কঠিন তালু বা মূর্ধা (dome) কে স্পর্শ করে।

৫। দন্তমূলীয় (Apico-Alveolar) — 'ন', 'ল', 'স' ইত্যাদি ধ্বনি এই শ্রেণিভুক্ত। জিহ্বা দাঁতের গোড়ার সর্বোচ্চ অংশ স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা দিলে দন্তমূলীয় ধ্বনি সৃষ্টি করে।

৬। দন্ত্য (Dental) — 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ', 'ন'। ওপরের দাঁতের পাটির পেছনের অংশ স্পর্শ করে জিহ্বা শ্বাসবায়ুর গতিপথে সাময়িকভাবে বাধা সৃষ্টি করলে এই দন্ত্য ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়।

৭। ওষ্ঠ্য (Labial)— 'প', 'ফ', 'ব', 'ভ', 'ম' এই শ্রেণি-ভুক্ত। ওষ্ঠ ও অধর যুক্ত হয়ে শ্বাসবায়ু প্রবাহকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করলে তৈরি হয় ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner of Articulation) অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে শ্বাসবায়ুর গভীর যোগ। ফুসফুস-চালিত শ্বাসবায়ু-প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ রেখে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: ক) প্রতিহত (stop/Occlusive) ও খ) প্রবাহিত (Continuant)। ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলিত চেষ্টায় যখন শ্বাসবায়ুর পথে ক্ষণকালের জন্য বাধা তৈরি হয়, তখন সেই ধ্বনিকে বলা হয় প্রতিহত (stop/occlusive) ধ্বনি। এদের অন্য পরিচিত নাম স্পৃষ্ট ধ্বনি বা স্পর্শ ব্যঞ্জন। এই ধ্বনিগুলি সবই মৌখিক।

প্রবাহিত ধ্বনির দুটি ভাগ ক) নাসিক্য (Nasal) ও খ) মৌখিক (Oral)।

প্রবাহিত মৌখিক (Continuerit oral) ধ্বনিগুলিকে বাধার প্রকৃতি অনুযায়ী নানা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা:

ক) উষ্মধ্বনি (Fricative) খ) কম্পিত (Trilled) ধ্বনি গ) তাড়িত (Flapped consonant) ধ্বনি ঘ) পার্শ্বিক ধ্বনি (Lateral)।

স্বরতন্ত্রীতে ঘোষ (voice) সৃষ্টির ওপর ভিত্তি করেও ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি-ভেদ তৈরি হয়। বাংলা ব্যঞ্জনের প্রকৃতিগত শ্রেণিবৈচিত্র্য নিম্নরূপ:

অঘোষ ধ্বনি (voiceless): ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর কম্পনের ফলে এক বিশেষ সুর বা ঘোষ (voice) সৃষ্টি হয়। সাধারণত বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে এরূপ সুর বা ঘোষ শোনা যায় না। এজাতীয় ধ্বনিকে চিহ্নিত করা হয় অঘোষ ধ্বনি রূপে। এগুলি হল: 'ক', 'খ', 'চ', 'ছ', 'ট', 'ঠ', 'ত', 'থ', 'প', 'ফ'। এর বাইরেও কয়েকটি ধ্বনি এই শ্রেণিভুক্ত। সেগুলি হল: 'শ', 'স', 'য'। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের ফিসফিসধ্বনি (whispered voices)-ও অঘোষ ধ্বনি রূপে গণ্য। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত অতিরিক্ত সুর বা ঘোষ তৈরি হয় না।

সঘোষ বা ঘোষবৎ (Voiced): যে-ধ্বনি উচ্চারণের সময়, ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত অতিরিক্ত বিশেষ সুর বা ঘোষ (voice) যুক্ত হয়, সেগুলিকে বলে সঘোষ বা ঘোষবৎ ধ্বনি। এতকাল মনে

করা হত, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিই শুধু সঘোষ গোত্রীয়। কিন্তু একালের ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এর বাইরেও বেশ কয়েকটি ধ্বনি সঘোষ ধ্বনির সমতুল্য। বাংলা সঘোষ ধ্বনিগুলি হল; 'গ', 'ঘ', 'ঙ', 'জ', 'ঝ', 'ড', 'ঢ', 'দ', 'ধ', 'ন', 'ব', 'ভ', 'ম', 'র', 'ল', 'ড', 'ঢ', 'হ'। এছাড়া, বাংলা স্বরধ্বনি এই শ্রেণিভুক্ত। প্রতিটি ভাগের দুটি উপবিভাগ স্বীকার করা হয় — ক) অল্পপ্রাণ (Unaspirates) ও খ) মহাপ্রাণ (Aspirates)।

ধ্বনির উচ্চারণ-কালে কণ্ঠনালীর কম-বেশি আকুঞ্চন হয়। কণ্ঠনালীর আকুঞ্চনের ফলে কোনো ধ্বনির উচ্চারণের সময় যদি অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি না হয়, তবে সেই ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। আর যদি অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি হয়, তবে সেই ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলা হয়। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি ('ক্', 'গ্', 'চ্', 'জ্', 'ট্', 'ড্', 'ত্', 'দ্', 'প্', 'ব্') অল্পপ্রাণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ('খ্', 'ঘ্', 'ছ্', 'ঝ্', 'ঠ্', 'ঢ্', 'থ্', 'ধ্', 'ফ্', 'ভ্') মহাপ্রাণ। বলা যেতে পারে, অল্পপ্রাণ ধ্বনির সঙ্গে মহাপ্রাণতা (হ-ধ্বনি) যোগ হলে মহাপ্রাণ ধ্বনি তৈরি হয়। ক্ + হ্ = খ্, গ্ + হ্ = ঘ্, প্ + হ্ = ফ্, ত্ + হ্ = থ্ ইত্যাদি।

অর্ধস্বর (Semivowels): যে-ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর নির্গমন স্বরধ্বনির মতো সম্পূর্ণ বাধাহীন হয় না, অল্প একটু বাধা থাকে— শ্বাসবায়ু সামান্য একটু ঘর্ষণসহ মুখ থেকে নির্গত হয়— এরূপ স্বরকে বাংলায় অর্ধস্বর বলে। ড. রামেশ্বর শ'র ভাষায় বলা যায়: "দু'টি উচ্চ স্বরধ্বনি (High vowel) হল 'ই', 'উ'/'i' 'u' /। এই দু'টি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ স্বভাবত যত উপরে ওঠে, তার চেয়েও উপরে উঠে গেলে এই স্বরধ্বনি দুটি অর্ধস্বর হয়ে যায়।" বাংলার দুটি অর্ধস্বর হল; 'য়্' (j) ও 'ওয়্' (w)।

অর্ধব্যঞ্জন (Sonant): যে-ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনির মতো অক্ষর সৃষ্টি করতে পারে, তাকে অর্ধব্যঞ্জন বলা হয়ে থাকে। বাংলা 'ন্', 'ম্', 'র্', 'ল্' এই ধ্বনিগুলি মূলত ব্যঞ্জন, কিন্তু আচরণ স্বরধ্বনির ন্যায়। এরা তাই অন্য কোনো স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়াই দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিকে নিয়ে উচ্চারিত হতে পারে। ইংরেজি 'বট্‌ল', 'বাট্‌ন', 'ইজম' অর্ধব্যঞ্জনের প্রকৃষ্ট নমুনা।

নাসিক্যব্যঞ্জন (Nasal consonants): কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরের কোনো স্থানে বাধা পেয়ে নাসাপথ ধরে বের হয়। এই ব্যঞ্জনগুলিকে বলা হয় নাসিক্যব্যঞ্জন। বাংলার নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলি হল: 'ঙ', 'ঞ', 'ণ', 'ন', 'ম'।

কম্পিত ব্যঞ্জন (trills): 'র্' ধ্বনি বাংলার একমাত্র কম্পিত ধ্বনি। এর উচ্চারণ-কালে জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে। শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত হয়। তাই এরূপ নাম।

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন (Lateral): 'ল' ধ্বনি বাংলার একমাত্র পার্শ্বিক ব্যঞ্জন। পার্শ্বিক ব্যঞ্জন উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতের গোড়া স্পর্শ করার সময় শ্বাসবায়ু জিহ্বার দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

তাড়িত ব্যঞ্জন (Flapped consonant): বাংলা 'ড়' ও 'ঢ়' তাড়িত ব্যঞ্জন। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ প্রতিবেষ্টিত হয়ে দাঁতের গোড়ার অংশে শ্বাসবায়ুকে তাড়িত করে।

৭.৪ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা বাংলা ধ্বনির গঠন, প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বাংলা স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, সহ মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণ স্থান, প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রয়োজনীয় রেখাচিত্রের মাধ্যমে বাংলা স্বরধ্বনি, মৌলিক ধ্বনির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যার ফলে ধ্বনি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারনা আরো স্পষ্ট হবে।

একক ৮ ❑ ধ্বনিপরিবর্তন

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ ধ্বনিপরিবর্তন : ধ্বনির পরিবর্তন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথা

৮.৪ সারসংক্ষেপ

৮.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- ধ্বনিপরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?
- ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ কী?
- ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন ধারার পরিচয়।

৮.২ প্রস্তাবনা

শব্দের উচ্চারণ কখনও অচল অটল নিত্যবস্তু নয়, প্রতিনিয়ত তা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ভাষা সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে ধ্বনির পরিবর্তন নানা বৈচিত্র্যের পথ ধরে অব্যাহত গতিতে চলেছে। মৌখিক জীবন্ত ভাষায় এই পরিবর্তন কখনও স্তব্ধ হবার নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি সময়ের স্রোত বেয়ে ধ্বনির পরিবর্তন না ঘটত, তবে বঙ্গভাষী মানুষেরা এখনও চর্যাগীতির উচ্চারণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতেন। শুধু বাংলাভাষা নয়, সব ভাষার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

কিন্তু কেন এমন ঘটে? কেনই বা ধ্বনি পরিবর্তিত হয়? ভাষাবিজ্ঞানীরা ধ্বনিপরিবর্তনের পেছনে অসংখ্য কারণ আবিষ্কার করেছেন। এই আলোচনায় সংক্ষেপে উক্ত কারণগুলির পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

এই এককে ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন ধারার পরিচয়ও দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরা হবে।

৮.৩ ধ্বনিপরিবর্তন: ধ্বনির পরিবর্তন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথা

ভাষাকে তুলনা করা হয় বহতা নদীর সঙ্গে। নদীর প্রবাহ যেমন অবিরাম গতিতে বয়ে চলছে, ভাষাও তেমনি অখণ্ড গতিতে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে। অবশ্য অনেক নদী যেমন

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে গতি হারিয়ে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয় বা ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়, ভাষাও তেমনি কোনো না কোনো কারণে চলার শক্তি হারিয়ে মৃত ভাষায় পরিণত হতে পারে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন অজস্র ভাষার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে। পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত-হয়ে-যাওয়া ভাষার কথা আলাদা, কিন্তু বিরাট জনমণ্ডলীর দ্বারা ব্যবহৃত প্রাণশক্তিতে ভরপুর যে-কোন জীবন্ত ভাষা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বদলাতে থাকে। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, চলিষ্ণুতাই ভাষার অন্যতম ধর্ম। একথাও বলা প্রয়োজন যে, পরিবর্তন দেখা দেয় প্রথমে মুখের ভাষায়, পরে লিখিত রূপে তার সংক্রমণ ঘটে।

ভাষার ধ্বনি, অর্থ, বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের উপাদানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হলেও ধ্বনির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সব চেয়ে স্পষ্ট ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

একই ভাষা-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে উচ্চারণের নানা বৈচিত্র্য ও তারতম্য দেখে আমরা অবাক হই। বাংলাভাষার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের রীতিবৈচিত্র্য একটু দেখে নিতে পারি।

একই শব্দ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। পূর্ববঙ্গের মানুষের মুখে শোনা যায় — 'কইর‍্যা', 'মাউচ্ছা', 'দাউদ', 'হগ্‌গলে', 'হালায় কয় কি'। এ-পারের রাঢ় অঞ্চল তথা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বঙ্গভাষীর মুখে এই শব্দগুলি উচ্চারিত হয় এইভাবে— 'ক'রে', 'মেছো', 'দাদ', 'সকলে', 'শালা বলে কি' ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অপিনিহিতি ও উষ্মীভবনের যে ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়, তা রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় নেই। আবার রাঢ় অঞ্চলে স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতিজাতীয় ধ্বনিপরিবর্তনের যে প্রভাব, তা পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসাম-সন্নিহিত অঞ্চলের বাংলা উচ্চারণে অনুপস্থিত। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (রাঢ়ী উপভাষায়) শোনা যায়: 'কাঁদে', 'চাঁদ', 'কাগজ' (j), 'বক', 'ভাত' > পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে (বঙ্গালী, বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষায়) উচ্চারিত হয় 'কান্দে', 'চান্দ', 'কাগজ' (z), 'বগা', 'বাত' ইত্যাদি।

একই সময়ের গণ্ডিতে শুধু স্থানগত ব্যবধানের কারণে বাংলাভাষার ধ্বনিগত এরূপ বৈচিত্র্য দেখে আমরা অবাক হই না, তবে, অনুরূপ ঘটনা কালগত ব্যবধানে আরো বেশি। সময়ের ব্যবধানে শব্দের উচ্চারণ কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তার পদচিহ্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলিতে সহজেই নজরে আসবে। ধরা যাক, চর্যাগানের সময়ের বাংলা উচ্চারণ। 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসঈ শবরী বালী', 'হিঅহি ন পইসঈ', 'বাহবকে পারই', 'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ', 'কা গই মাগম', 'রুখের তেতলি কুম্ভীরে খাঅ', 'দিঢ় করিঅ' — এই অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে হাজার বছর-আগে-রচিত চর্যাগানের বাংলা শব্দের ধ্বনিরূপ বা উচ্চারণগত বিশেষত্ব সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করা যায়। একালের সাধারণ মানুষের অনভ্যস্ত কানে এই ভাষাকে বাংলা বলেই মনে হবে না। বর্তমান সময়ে এই বাক্যাংশগুলি উচ্চারিত হবে এভাবে: 'উঁচু উঁচু পর্বত', 'তাতে বাস করে শবরী বালিকা', 'হিয়ায় প্রবেশ করে না', 'বাইতে পারে', 'গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও', 'কোথা গিয়ে চাইব', 'বৃক্ষের তেঁতুল কুমীরে খায়', 'দৃঢ় করে' ইত্যাদি।

একই বাংলা ভাষা — অথচ কালের ব্যবধানে তার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য কতই না পালটে গেছে। ধ্বনিগত পরিবর্তনের এই তরঙ্গ-প্রবাহ কখনই থেমে থাকে না। একালের বাংলা ভাষার যে-উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য আমরা দেখছি ও শুনছি, নানা পারিপার্শ্বিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের প্রজন্মের মুখে তা বদলে যেতে বাধ্য। পৃথিবীর প্রতিটি জীবন্ত ভাষার ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে থাকে।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ

ভাষাবিজ্ঞানীরা ধ্বনি-পরিবর্তনের বহুবিধ কারণ নির্দেশ করেছেন। কয়েকটি প্রধান কারণ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করা হচ্ছে।

১। ভৌগোলিক ও জলবায়ুঘটিত কারণ: ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রকৃতি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, মানসিক রুচি, শারীরিক গঠন, বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষত্বকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। বাগ্‌যন্ত্রের গঠন অনুযায়ী মানুষের মুখের উচ্চারণও বদলে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা প্রাচীনকালে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে অঞ্চলভেদে-সৃষ্ট ভাষাগুলির কথা উল্লেখ করতে পারি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে অঞ্চলভেদে মোট দশটি উপভাষার জন্ম হয়। মূল ভাষার পুরঃ কণ্ঠ্যধ্বনি 'k'-এর উচ্চারণ কয়েকটি ভাষায় রক্ষিত আছে, সেগুলিকে কেন্তুম (Centum) গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাকি ভাষাগুলিতে কণ্ঠ্যধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে তালব্যধ্বনিতে। সেগুলি 'সতম' (satam) গুচ্ছের অন্তর্গত। এরূপ হওয়ার পেছনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুখ-প্রযত্ন ও বাগ্‌যন্ত্রের গঠন দায়ী।

আরবি ভাষায় কণ্ঠ্যধ্বনির অতিরিক্ত প্রাধান্যের পেছনে সেখানকার মরু-অঞ্চলের রুক্ষ প্রকৃতি দায়ী বলে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন। আবার বাংলাভাষায় তরলধ্বনির আধিক্যের পেছনে এখানকার নদীমাতৃক কোমল প্রকৃতির প্রভাব থাকা সম্ভব বলেও অনেকের ধারণা।

তাই এক ভাষার কোনো শব্দ যখন অন্য দেশের ভিন্ন ভাষী মানুষের ভাষায় যায়, তখন নব্যদেশের ব্যবহারকারী মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের গঠন ও উচ্চারণগত প্রবণতা অনুযায়ী শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। গ্রিক ভাষার 'দ্রাখ্‌মে' ভারতে এসে সংস্কৃত উচ্চারণে হয় 'দ্রম্য', শেষপর্যন্ত বাংলা উচ্চারণে 'দাম'।

২। বক্তার জিহ্বার জড়তা, শোনার ত্রুটি, অনবধানতা: ধ্বনিপরিবর্তনের এক বড় কারণ নিহিত আমাদের শারীরিক সংগঠন ও শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। বক্তার জিহ্বার জড়তা, কথা বলার ধরন উচ্চারণ-বৈষম্য, শ্রোতার শ্রবণশক্তির দুর্বলতা ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবেই শারীরিক ব্যাপার। এগুলি বহিরঙ্গ বিষয় হলেও ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। কার্যত ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। বক্তা বললেন একরকম, শ্রোতা শুনলেন অন্যরকম। ফলে ধ্বনি পালটে গেল।

'who comes there?' 'ইংরেজ-আমল থেকে বাঙালির মুখে ধ্বনিত হচ্ছে 'হুকুমদার' রূপে। 'লেফ্‌টন্যান্ট গভর্নর' এককালে কোনো পণ্ডিতের মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল 'লেপ টানাটানি গোবর্ধন'। অনুরূপ, badge > ব্যাচ, ফর্ম > ফ্রম, ট্রেনের 'সিগন্যাল' > ট্রেনের 'সিংগ্যাল', ইংরেজি 'man of war' বাংলায় দাঁড়িয়েছে। 'মানোয়ারি'। একারণে সেকালে যুদ্ধজাহাজকে বলা হতো 'মানোয়ারি জাহাজ'।

৩। উচ্চারণের বিশুদ্ধি প্রবণতা: অনেক সময় কোনো শব্দকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে তাকে শুদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। ফলে ধ্বনি পাল্টায়। শব্দের মূল অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। যেমন, উচ্চারণ > উশ্চারণ, পুষ্ট > পুরুষ্টু।

৪। ভিন্ন ভাষার প্রভাব: অনেকদিন ধরে দুটি ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব চললে উন্নততর ও অধিক জনপ্রিয় ভাষার প্রভাব অন্য ভাষাটি (তুলনায় হীনতর)-র ওপর পড়বেই। যে-কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডারের উপাদান এর ফলে ব্যাপকভাবে বদলে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দীর্ঘ সংস্রবের কারণে ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে— যেমন, দ্রাবিড় গোষ্ঠী মূর্ধন্য ধ্বনি (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্)-র আধিক্য। এই ধ্বনিগুলি সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করে। পরে ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও এই ধ্বনিগুলির সংক্রমণ ঘটে।

মধ্যযুগে বাংলায় ফারসির প্রভাব অনেক বেড়ে যাওয়ার পেছনে এই কারণটিই বলবৎ ছিল। কয়েক শ' বছর ধরে মুসলিম শাসকের ভাষা ফারসি বাংলাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সেই সময় শুধু শব্দভাণ্ডার নয়, ধ্বনির ক্ষেত্রেও বাংলাভাষায় ফারসির প্রভাব ভালোভাবেই পড়েছিল।

অষ্টাদশ শতক থেকে ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতীয় ভাষাগুলিতে ইংরেজির প্রভাব দেখা যায়। শব্দভাণ্ডারে, বাক্যগঠনে প্রভাব তো পড়েছেই, ধ্বনি-উচ্চারণের ক্ষেত্রেও ইংরেজির ব্যাপক প্রভাব বাংলা ভাষায় পড়ে। ইংরেজির প্রভাবে আমাদের দেশের অনেক স্থানের নাম বদল হয়েছে। ইংরেজি-ভাষী মানুষের উচ্চারণ ও ব্যবহৃত বানান শব্দগুলির মূল ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যকে হটিয়ে দিয়েছে। যেমন: বর্ধমান > বার্ডোয়ান, মেদিনীপুর > মিদনাপুর, কাঁথি > কন্টাই, বোম্বাই > বোম্বে, কলিকাতা > ক্যালকাটা, চট্টগ্রাম চিটাগাং, মৈমনসিংহ > মাইমেনসিং, বারাণসী > বেনারস ইত্যাদি উদাহরণগুলি এর প্রমাণ।

হিন্দিভাষা-প্রভাবিত-অঞ্চলে-বসবাসকারী বাংলাভাষী মানুষের উচ্চারণে হিন্দির ছায়া সহজেই অনুভব করা যায়। 'বন্ধ' শব্দটি স্বরান্ত। কিন্তু হিন্দির প্রভাবে একালে তা হলন্ত রূপে উচ্চারিত হয় — বন্ধ > বন্ধ্। ধরা। যাক, 'এক' শব্দটি। হিন্দিভাষী মানুষের উচ্চারণে 'এ' অনেকটা 'ই' এর কাছাকাছি। হিন্দি-বলয়ের বাংলা উচ্চারণে তাই 'এক দিন' হয়ে যায় অনেকটা 'ইক দিন'।

৫। উচ্চারণ-দ্রুততা: দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা ধ্বনি পালটে ফেলি। যেমন: কে এলো > কেয়েলো, কোথা যাচ্ছ > কোজ্জাচ্ছ, মা-এর > মায়ের। পণ্ডিত মশাই > পোন্‌শই ইত্যাদি। দ্রুত উচ্চারণের কারণে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয় ধ্বনিতে। এর নাম স্পুনারিজম (Spoonerism)। অধ্যাপক

স্পুনার সাহেব নাকি দ্রুত কথা বলতে গিয়ে ধ্বনির বিভ্রাট ঘটিয়ে ফেলতেন। তাঁর মুখে 'oiled bicycle' হয়ে যেতো 'Boiled icecle'। বাংলায় এজাতীয় নমুনা কিছু শোনা যায়। যেমন — 'এক কাপ চা' > এক চাপ কা'। 'হাতে ছাতি' > 'ছাতে হাতি'। 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ' > 'জলে বাঘ ডাঙায় কুমীর'।

৬। উচ্চারণকে সহজ করার প্রবণতা: উচ্চারণকে সহজ ও সাবলীল করার নিরন্তর চেষ্টা মানুষের স্বভাবগত। ভাষা সৃষ্টি ও ভাষা ব্যবহারের প্রথম যুগ থেকেই এই অল্পায়াসপ্রবণতা চলেছে। ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তনের পেছনে ধ্বনিকে সরল ও সহজ-উচ্চার্য করার এই প্রবণতা অনেকখানি দায়ী। সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভবের পেছনেও প্রধানত এই প্রবণতা। আবার প্রাকৃতের ধ্বনিগুলি নব্য ভারতীয় আর্যে আরও সহজ করে আনা হয়েছে। কয়েকটি নমুনা:

সংস্কৃতের 'ধর্ম', 'জন্ম', 'গর্জন', 'হস্ত', 'মৎস্য', 'মক্ষিকা' ইত্যাদি শব্দ প্রাকৃতে হয়েছে > যথাক্রমে 'ধম্ম', 'জম্ম', 'গজ্জন', 'হত্থ', 'মচ্ছ', 'মচ্ছিআ' (সমীভবন-এর প্রভাব)। পরের স্তরে এদের উচ্চারণ বাংলায় আরও সরলীকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে—'ধাম', 'জাম', 'গাজন', 'হাত', 'মাছ', 'মাছি' (ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবনের প্রভাব)।

বিদেশি আগন্তুক শব্দের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। ফারসি 'বুজর্গ', 'কুফল', 'মর্দ', 'গার্ড', 'তুর্ক', 'বার্জ', ইত্যাদি আরবি-ফারসি-ইংরেজি শব্দ বাংলায় দাঁড়িয়েছে 'বুজরুক', 'কুলুপ', 'মরদ', 'গারদ', 'তুরুক', বজরা'। শিশু, গ্রামীণ অশিক্ষিত মানুষ ও বয়স্ক ব্যক্তির উচ্চারণে ধ্বনিকে সহজ করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। যেমন — লাল > নাল, লীলা > নীলা, জ্ঞান > গ্যান, চরণামৃত > চন্নামিত্ত, আহ্নিক > আন্নিক, লক্ষ্মী > নোকখি প্রভৃতি।

৭। শ্বাসাঘাতের নিয়ন্ত্রণাভাব: অনেক সময় অনবধানতার-ফলে-উচ্চারণকালে শব্দে যথাস্থানে আমরা শ্বাসাঘাত দিই না। ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের অভাবে উদ্ধার হয়ে যায় ধার, অলাবু হয়ে যায় লাউ। আদিস্বরে অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতের ফলে 'স্কুল', 'স্টুপিড' হয়ে যায় 'ইস্কুল', 'ইস্টুপিড'।

৮। লোকনিরুক্তির প্রভাব: দুরুচ্চার্য অপরিচিত শব্দকে পরিচিত শব্দের মতো করে উচ্চারণের প্রবণতার ফলে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। Hospital > হাসপাতাল। ভ্রমমতি > ভীমরতি। Chewing gum > চুনকাম।

৯। ভাবপ্রবণতার প্রভাব: সম্বোধনকে অধিকতর আন্তরিক ও হৃদয়গ্রাহী করতে গিয়ে আমরা শব্দের ধ্বনিতে পরিবর্তন নিয়ে আসি। যেমন — মামা > মামু, কাকা > কাকু, বাবা > বাবু, দুষ্ট > দুষ্টু, খোকা > খোকন।

ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা

ধ্বনির পরিবর্তন-প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্যের শেষ নেই। ভাষাতাত্ত্বিকগণ লক্ষ করেছেন শব্দস্থিত ধ্বনিগুলির যাবতীয় পরিবর্তন ঘটে থাকে চার ভাবে।

কখনও শব্দে নতুন কোনো ধ্বনির আবির্ভাব হয়, কখনও কোনো ধ্বনি বিপুপ্ত হয়, কখনও ধ্বনি আগু পিছু জায়গা বদল করে, আবার কখনো কোনো ধ্বনি অন্য কোনো ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। এই চার ধরনের প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে ধ্বনির পরিবর্তনকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন— ক) ধ্বনির আগম খ) ধ্বনির লোপ গ) ধ্বনির স্থানান্তর ঘ) ধ্বনির রূপান্তর।

এই শ্রেণিগুলির অন্তর্গত ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন ধারার পরিচয় পৃথকভাবে দেওয়া হল।

ধ্বনির আগম:

উচ্চারণকে সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে নতুন ধ্বনির আগম ঘটে থাকে। স্বরধ্বনির আগম হলে স্বরাগম এবং ব্যঞ্জনধ্বনির আগম হলে নাম হয় ব্যঞ্জনাগম। নীচে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করা হচ্ছে।

১) স্বরাগম:

আদিস্বরাগম (vowel prothesis): শব্দের আদিতে সংযুক্তব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য এর আগে একটি স্বরধ্বনি বাড়তি উচ্চারিত হয়। যেমন— স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্কুল > ইস্কুল, স্টুপিড > ইস্টুপিড, stable > আস্তাবল, স্ত্রী > প্রা. ইত্থি।

মধ্যস্বরাগম, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Arraptyxis): অনেক সময় শব্দের মাঝে নতুন কোনো স্বরের আগম হয় ও এতে যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে যায়। এর নাম মধ্য-স্বরাগম, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। অতিরিক্ত স্বর এসে সংযুক্ত ব্যঞ্জনটিকে ভেঙে দেয় বলে এর নাম স্বরভক্তি। সংযুক্ত ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয় বলে এই ধ্বনি-পরিবর্তনের অপর নাম বিপ্রকর্ষ।

ভক্তি > ভকতি (ভ্ + অ + ক্ + অ + ত্ + ই। এখানে ক্ + ত্ হয়েছে > ক্ + অ + ত্।) মাঝে 'অ' ধ্বনির আগম হয়েছে। অনুরূপ, গ্লাস > গেলাস, মূর্তি > মূরতি, শ্লোক > শোলোক, ম্লেচ্ছ > মেলেচ্ছ, গার্ড > গারদ, শ্রী > ছিরি, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।

প্রাকৃত ভাষায় বিপ্রকর্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। সংস্কৃতের বহু শব্দ প্রাকৃতে এসে বিপ্রকর্ষের গ্রাসে পড়ে। যেমন: ক্লেশ > কিলেশ, শুক্ল > সুকুল, পদ্ম > পদুম।

বাংলা কাব্যভাষায় বিপ্রকর্ষের নমুনার অভাব নেই। যেমন: মুক্তি > মুকতি, দর্শন > দরশন।

অন্ত্যস্বরাগম (Catathesis): অনেক সময় শব্দের শেষে কোনো স্বরধ্বনি এসে হলন্ত অক্ষরকে স্বরান্ত করে দেয়। বেঞ্চ্ > বেঞ্চি, লিস্ট্ > লিস্টি, গিল্ট্ > গিলটি ইত্যাদি।

২) ব্যঞ্জনাগম:

আদিব্যঞ্জনাগম: বাংলায় এর দৃষ্টান্ত কম। তবে নেই বলা যাবে না। উপকথা > রূপকথা, ওমলেট মামলেট, ওষ্ঠ > ওঠ > ঠোঁট, ওঝা > রোজা। মালদা, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায়ই শোনা যায়— আমের রস > রামের অস। 'আম' হয়ে গেছে 'রাম'।

মধ্যব্যঞ্জনাগম: শব্দের মাঝে অতিরিক্ত কোনো ব্যঞ্জনের আগম ঘটলে তাকে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে। মোকদ্দমা > মোকর্দমা, বানর > বান্দর, বাঁদর। সুনর > সুন্দর।

অন্ত্যব্যঞ্জনাগম: শব্দের শেষে অতিরিক্ত কোনো ব্যঞ্জনের আগম হয়। যেমন— স্ক্রু > স্কুপ, বাবু > বাবুন, চিহ্ন > চিহ্নত।

শ্রুতিধ্বনি (Glide):

শ্রুতিধ্বনি এক ধরনের মধ্যব্যঞ্জনাগম ছাড়া কিছু নয়। বাংলা উচ্চারণে এই ধ্বনিপরিবর্তনের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। মুখ-গহ্বরে কোনো শব্দের উচ্চারণকালে শব্দস্থিত ধ্বনিগুলিকে জিহ্বা বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করে না, জিহ্বা অবিচ্ছিন্নভাবে এক ধ্বনির উচ্চারণস্থান থেকে পরের ধ্বনিতে যায়। অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে মধ্যবর্তী অন্য কোনো ধ্বনিকে জিহ্বা অসতর্কভাবে উচ্চারণ করে ফেলে। এরূপ মধ্যব্যঞ্জনাগমকে বলা হয় শ্রুতিধ্বনি। শুধু মুখের ভাষায় শ্রুতিধ্বনি সীমাবদ্ধ থাকে না, বানানেও ঢুকে পড়ে। বাংলাভাষায় শ্রুতিধ্বনির নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। যথা:

য়-শ্রুতি: বাংলা উচ্চারণে য়-শ্রুতির প্রভাব যথেষ্ট। প্রাকৃত যুগে সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে উদ্ভব ঘটেছে উদ্বৃত্ত স্বর (residual vowel)-এর। বাংলায় এসে উদ্বৃত্ত স্বর রূপান্তরিত হয়েছে য়-শ্রুতিতে। যেমন: শৃগাল > সিআল > শিয়াল, কেতক > কেঅঅ > কেয়া, সাগর > সাঅর > সায়র, যাএ > যায়, খাএ > খায় ইত্যাদি।

শ্রুতি/ওয়শ্রুতি: প্রয়োজনীয় শ্বাসাঘাতের অভাবে ও উচ্চারণকে সহজ করার প্রয়াসে শব্দমধ্যবর্তী কোনো ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে সেখানে কখনও কখনও 'ব/'ওয়' (w) ধ্বনির আবির্ভাব ঘটে। বাংলা বানানে সাধারণত 'ও' ধ্বনির দ্বারা 'ব'-শ্রুতি বোঝানো হয়। যেমন: যা + আ > যাওয়া, খা + আ > খাওয়া ইত্যাদি।

হ-শ্রুতি: বিউলা > বেহুলা, বেয়ালা > বেহালা।

দ শ্রুতি: বানর > বান্দর, জেনারেল > জাঁদরেল ইত্যাদি।

ধ্বনির লোপ:

প্রয়োজনীয় শ্বাসাঘাতের অভাবে ও উচ্চারণকে অধিকতর সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত্য স্বরধ্বনির লোপ ঘটে থাকে। কিছু দৃষ্টান্ত:

আদিস্বরলোপ (Aphesis): অলাবু > লাউ, অভ্যন্তর > ভিতর, উদ্ধার > ধার, অতসী > তিসি ইত্যাদি।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope): গামোছা > গামছা, দেবতা > দেব্‌তা, বসতি > বস্তি, রাঁধনা > রান্না, ভগিনী > ভগ্নী, কলিকাতা > কলকাতা। ইংরেজিতে Do not > don't।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope): বন্ধ > বন্ধ্, অগ্নি > আগ্, সন্ধ্যা > সাঁজ, গঙ্গা > গাঙ। মধ্যযুগে উচ্চারণ ছিল 'কাশীরাম দাস' (ক্ + আ + শ + ঈ + র্ + আ + ম্ দ্ + আ + স্ + অ) > আধুনিক কালে উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে 'কাশীরাম্ দাস্' (ক্ + আ + শ + ঈ + র্ + আ + ম্ দ্ + আ + স্)। এক্ষেত্রে 'দ্ + আ + স + অ' হয়েছে > 'দ্ + আ + স্'। অর্থাৎ স্বরান্ত উচ্চারণ হয়ে গেছে হলন্ত। লিখিত রূপে এই পার্থক্য বোঝার উপায় নেই, কিন্তু উচ্চারণে স্পষ্ট। আধুনিক বাংলার এটি একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিগত বিশেষত্ব।

ব্যঞ্জনলোপ:

শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যব্যঞ্জনের লোপ হলে এ জাতীয় ধ্বনিপরিবর্তনকে ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়।

আদিব্যঞ্জনলোপ: স্থিত > থিতু, শ্মশান > মশান ইত্যাদি। বরেন্দ্রী উপভাষায় শোনা যায় রাম > আম, রস > অস।

মধ্যব্যঞ্জনলোপ; ফলাহার > ফলার, রাধিকা > রাহিআ > রাই

অন্তব্যঞ্জনলোপ: বর্গীর > বর্গী, কহি > কই

ধ্বনির স্থানান্তর

বর্ণবিপর্যয় বা বিপর্যাস: উচ্চারণের সুবিধার্থে অনেক সময় শব্দস্থিত কোনো কোনো ধ্বনি পরস্পর জায়গা বদল করে। অর্থাৎ আগের ধ্বনি পরে ও পরের ধ্বনি আগে উচ্চারিত হয়। এজাতীয় ধ্বনিপরিবর্তনের নাম বর্ণবিপর্যয় বা বিপর্যাস। বাংলায় বর্ণবিপর্যয়-এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

পিশাচ > পিচাশ (প্ + ই + শ্ + আ + চ্ > প্ + ই + চ্ + আ + শ্) এখানে 'শ্' ও 'চ্'—এই ধ্বনি দুটির মধ্যে স্থানগত বিপর্যয় ঘটেছে। আগের ধ্বনি পরে ও পরের ধ্বনি আগে উচ্চারিত হয়েছে।

অনুরূপ, বারাণসী > বেনারসী, লাফ > ফাল, জানালা > জালানা, রিক্সা > রিস্‌কা, ট্যাক্সি > ট্যাস্‌কি, বাক্স > বাস্ক ইত্যাদি।

অপিনিহিতি (Epenthesis):

বাংলাভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ধারায় অপিনিহিতির গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকার্য। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অর্থাৎ বঙ্গালী উপভাষায় সবচেয়ে লক্ষণীয় বিশেষত্ব আপিনিহিতি। মধ্যযুগের বাংলাতেও এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। অপিনিহিতির নানা বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ।

'অপি' শব্দের অর্থ 'আগে', 'নিহিতি' শব্দের অর্থ 'অবস্থান'। অর্থাৎ শব্দে 'ই' ও 'উ' ধ্বনির পূর্বভাবিত উচ্চারণের নাম অপিনিহিতি। ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই দুটি ধ্বনির উচ্চারণগত অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। অপিনিহিতির একাধিক সংজ্ঞা ও বিশেষত্ব নির্দেশ করেছেন।

ক) অনেকসময় শব্দস্থিত ই বা উ ধ্বনি যথাস্থানে উচ্চারিত না হয়ে আগেই উচ্চারিত হয়ে যায়। এর নাম অপিনিহিতি। যেমন: আজি > আইজ (আ + জ্‌ + ই > আ + ই + জ্‌) অনুরূপ, করিয়া > কইর‍্যা, জাগিয়া > জাইগ্যা, মাছুয়া > মাউচ্ছা, গাছুয়া > গাউচ্ছা, দদ্রু > দাউদ।

খ) অনেক সময় শব্দের 'ই' বা 'উ' নিজের স্থানে উচ্চারিত হয়েও আগে আরও একবার অতিরিক্ত উচ্চারিত হয়। এর নাম অপিনিহিতি। যেমন: কাঁচি > কাঁইচি, গাঁতি > গাঁইতি।

গ) আবার এমনও দেখা যায়, শব্দে আদৌ 'ই' বা 'উ নেই, কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনের আগে হঠাৎ 'ই' ধ্বনির আগম ঘটে। এজাতীয় স্বরাগমকে অপিনিহিতি বলে অনেকে গণ্য করেন। যেমন: কাব্য > কাইব্য, গদ্য > গইদ্য, সত্য > সইত্য।

ধ্বনির রূপান্তর

উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দস্থিত কোনো ধ্বনিকে আমরা অনেক সময় অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত করে নিই। এই প্রক্রিয়ার নাম ধ্বনির রূপান্তর। নানা ধরনের রূপান্তর বাংলা ধ্বনির ক্ষেত্রে দেখা যায়। কয়েকটি ধারার পরিচয় নীচে দেওয়া হল:

ঘোষীভবন: অঘোষ ধ্বনি (বর্গের ১ম ও ২য় ধ্বনি) যদি সঘোষ ধ্বনির (৩য় ও ৪র্থ) মতো উচ্চারিত হয়, তবে তাকে বলে ঘোষীভবন। কাক > কাগ, বক > বগ, উপকার > উবকার।

অঘোষীভবন: ঘোষীভবনের উলটো ঘটনা এক্ষেত্রে ঘটে। ঘোষবৎ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হলে বলা হয় অঘোষীভবন। বাংলা উচ্চারণে অঘোষীভবনের প্রভাব যথেষ্ট। ছাদ > ছাত, গুলাব > গোলাপ, খরাব > খারাপ, অবসর > অপসর।

অল্পপ্রাণীভবন: মহাপ্রাণ ধ্বনি (বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি) প্রয়োজনীয় শ্বাসাঘাতের অভাবে অনেক সময় অল্পপ্রাণ ধ্বনির (বর্গের ১ম ও ৩য় ধ্বনি) মতো উচ্চারিত হয়। এর নাম অল্পপ্রাণীভবন। যেমন

খ > ক—শখ > শক

ঘ > গ—বাঘ > বাগ। মহার্ঘ ভাতা > মাগ্‌গি বাতা, মেঘলা > মেগ্‌লা।

ছ > চ—যাচ্ছি > যাচ্চি, বলছি > বলচি

থ > ত—কথা > কতা

ধ > দ—দুধ > দুদ, অবধি > অবদি

ভ > ব—ভাত > বাত

মহাপ্রাণীভবন: এক্ষেত্রে দেখা যায় অল্পপ্রাণীভবন-এর বিপরীত ঘটনা। অনেক সময় শব্দস্থিত অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। উচ্চারণ-প্রযত্ন লাঘবের উদ্দেশেই এমনটি ঘটে থাকে। এর নাম মহাপ্রাণীভবন। যেমন — পতঙ্গ > ফড়িং, কীলক > খিল, জীর্ণ > ঝুনা, ক্রীড়া > খেলা।

নাসিক্যীভবন (Nasalisation): অনেক সময় শব্দের নাসিক্যব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে দেয়। এর নাম নাসিক্যীভবন (Nasalisation)। দন্ত > দাঁত, হংস > হাঁস, চন্দ্র > চাঁদ, কণ্টক > কাঁটা। লক্ষণীয়, এই শব্দগুলিতে, ন্, ণ, ং ইত্যাদি নাসিক্য ব্যঞ্জনের বিলোপ ঘটেছে, কিন্তু আগের ধ্বনিটিকে আনুনাসিক করে দিয়ে গেছে।

স্বতোনাসিক্যীভবন (spontaneous Nasalisation): অনেক সময় শব্দে নাসিক্যব্যঞ্জনের অস্তিত্ব না থাকলেও বা কোনোভাবে নাসিক্যধ্বনির প্রভাবের কারণ না ঘটলেও আপনা-আপনি কোনো ধ্বনিতে আনুনাসিকতা দেখা দিতে পারে। এর নাম স্বতোনাসিক্যীভবন। যেমন — পেচক > প্যাঁচা। হাসপাতাল > হাঁসপাতাল। পুস্তিকা > পুঁথি। কলকাতার উচ্চারণে শোনা যায়: চা > চাঁ। খোকা > খোঁকা।

মূর্ধন্যীভবন (Cerebralisation): আমাদের বর্ণমালায় ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ ইত্যাদি ব্যঞ্জন, মূর্ধন্য ধ্বনি রূপে স্বীকৃত। অনেক সময় ঋ, র, ষ ইত্যাদি ধ্বনির প্রভাবে শব্দস্থিত দন্ত্য ধ্বনিগুলিও (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইত্যাদি) মূর্ধন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। এর নাম মূর্ধন্যীভবন। প্রাকৃত ভাষায় মূর্ধন্যীভবনের ব্যাপক প্রভাব ছিল। বিকৃত > বিকট, ভৃত > ভট, মৃত > মট ইত্যাদি। বাংলা মৃত > মড়া, দক্ষিণ > ডাহিন > ডান, তির্যক > টেরা।

স্বতোমূর্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralisation): কোনো মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্যধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তবে তাকে বলা হয় স্বতোমূর্ধন্যীভবন। যথা: পততি > পড়ে, দংশক > ডাঁশা।

তালব্যীভবন (Palatalisation): দন্ত্যধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র দাঁত ও দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে। অনেক সময় দন্ত্যধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ তালু (Palate)কে স্পর্শ করে বসে। ফলে দন্ত্যধ্বনি হয়ে যায় তালব্যধ্বনি। বাংলা উচ্চারণে তালব্যীভবনের প্রভাব যথেষ্ট। দৃষ্টান্ত: সং. মৎস্য > প্রা. মচ্ছ > বাং. মাছ। অনুরূপ, কুৎসা > কেচ্ছা। সং. মক্ষিকা > প্রা. মচ্ছিআ > বাং. মাছি। সং. কক্ষ > কাছ। ক্ষীর > ছির। কৃত্যক > কড়চা। সত্য > সাচ। মধ্য > মাঝ। অদ্য > আজ।

উষ্মীভবন (Spirantization): স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনকে উষ্মধ্বনির মতো উচ্চারণের প্রবণতা বাংলায় বিশেষ ভাবে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে এই প্রবণতা খুবই বেশি। স্পর্শব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুপ্রবাহকে সম্পূর্ণ নিরোধ করে, আবার পর মুহূর্তেই বাধা সরিয়ে নেয়। কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাধাদানের কাজ হয় খুব শিথিলভাবে, ধ্বনিটির উচ্চারণ এক চোটে না হয়ে সামান্য বেশি সময় ধরে হয়। এর নাম উষ্মীভবন। 'কাগজ', 'ফুল', 'জাহাজ', 'চা', 'পূজা' ইত্যাদি শব্দে 'জ', 'ফ', 'চ' ধ্বনির উচ্চারণ মান্য বাংলা উচ্চারণে যে-ভাবে করা হয়, পূর্ববঙ্গে সেভাবে করা হয় না। বঙ্গালী উপভাষায় উচ্চারণ হয় শিথিলভাবে। বায়ুপ্রবাহ যেন সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হয়ে বাধার স্থানকে ঠেলে নির্গত হয়।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony):

শব্দে পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার্থে বিষম স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সমতা বা সঙ্গতি রচনার প্রবণতা দেখা যায়। এরূপ ধ্বনিপরিবর্তনের নাম স্বরসঙ্গতি। একালের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষায় স্বরসঙ্গতির প্রভাব খুব বেশি। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় স্বরসঙ্গতি নেই বললেই চলে। বাংলা উচ্চারণে চার ধরনের স্বরসঙ্গতি দেখা যায়।

প্রগত স্বরসঙ্গতি: আগের ধ্বনি পরের ধ্বনিকে প্রভাবিত করে। পূজা > পুজো (প্ + ঊ + জ্ + আ > প্ + উ + জ + ও), মূলা > মুলো, ধূলা > ধুলো, বিদ্যা > বিদ্যে।

পরাগত স্বরসঙ্গতি: পরের ধ্বনি অপরিবর্তিত থেকে আগের ধ্বনিকে বদলে দেয়। যেমন দেশি > দিশি (এখানে এ + ই > ই + ই)

মধ্যগত: আগের ও পরের ধ্বনির প্রভাবে মাঝখানের ধ্বনিটি সমতা লাভ করে। — বারেন্দা > বারান্দা, ভিখারি > ভিখিরি, বিলাতি > বিলিতি।

পারস্পরিক: পরস্পরের প্রভাবে আগের ধ্বনি ও পরের ধ্বনি উভয়েই বদলে গেলে হয়। পারস্পরিক স্বরসঙ্গতি। মোজা > মুজো, ক্ষুধা > খিদে ইত্যাদি।

সমীভবন (Assimilation):

উচ্চারণকে সহজসাধ্য করার এক গুরুত্বপূর্ণ রীতি হল সমীভবন। শব্দে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন পরপর উচ্চারণ করতে গেলে বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গগুলির বিশেষ করে জিহ্বার কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয়। এরূপ অবস্থায় দেখা দেয় সমীভবনের প্রবণতা। এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায়:

শব্দে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন পাশাপাশি পৃথকভাবে অথবা যুক্তভাবে থাকলে উচ্চারণকে সহজ করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আমরা এই বিষম ব্যঞ্জনগুলিকে সমব্যঞ্জনে পরিণত করে নিই। সমতাবিধানের এমন প্রবণতার নাম সমীভবন।

স্বরসঙ্গতির সঙ্গে সমীভবনের পার্থক্যের দিকটি মনে রাখা দরকার। বিষম স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে সমতাবিধানের নাম স্বরসঙ্গতি, অন্যদিকে ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে সমতাবিধান ঘটলে তাকে সমীভবন বলা হয়ে থাকে।

প্রাকৃত ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের ধারায় সমীভবনের ব্যাপক প্রভাব ছিল। সংস্কৃতের সব যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে এসে পরিণত হয়েছে সমযুগ্মব্যঞ্জনে। বাংলা ভাষায় সমীভবনের দৃষ্টান্ত-বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তিন ধরনের সমীভবন পাওয়া যায়:

প্রগত: আগের ধ্বনির প্রভাবে পরের ধ্বনিটি পালটে গেলে একে বলা হয় প্রগত সমীভবন। যেমন— পদ্ম > পদ্দ, বিল্ব > বিল্ল, ছদ্ম > ছদ্দ, গল্‌দা চিংড়ি > গল্লা চিংড়ি।

পরাগত: প্রগত সমীভবনের বিপরীত ঘটনা এখানে। পরের ধ্বনি পালটে দেয় আগের ধ্বনিকে। যেমন— দুর্গা > দুগ্গা, ধর্ম > ধম্ম, পাঁচশো > পাঁশশো, কর্তা > কত্তা।

পারস্পরিক : আগের ও পরের দুটি ধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পালটে যায়। যেমন— উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস, সং. সত্য > প্রা. সচ্চ, সং. মধ্য > প্রা. মজ্ঝ, মহোৎসব > মোচ্ছব।

বিষমীভবন (Dissimilation):

সমীভবনের উলটো ঘটনা ঘটে বিষমীভবনে। কখনও কখনও উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দস্থিত দুটি সমধ্বনির মধ্যে একটিকে বদলে নেওয়া হয়। এর নাম বিষমীভবন। বাংলায় এর দৃষ্টান্ত অল্প।

প্রকৃত ভাষায় বিষমীভবনের কিছু নমুনা মেলে। সং. মন্মথ > প্রা. বম্মহ, সং. পিপীলিকা > প্রা. কিপিল্লিকা। বাংলায় শোনা যায় লাঙল > নাঙল, উচ্চারণ > উশ্চারণ, আর্মারিও (armario) > বাং. আলমারি। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়: লাল > নাল, লীলা > নীলা ইত্যাদি।

সাদৃশ্য (Analogy): আমাদের জীবনে সাদৃশ্য তথা অনুকরণের প্রভাব খুব বেশি। ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পৃথিবীর সব ভাষায় সাদৃশ্যের প্রভাব কম-বেশি দেখা যায়।

বাংলার শব্দভাণ্ডারে সাদৃশ্য-সৃষ্ট শব্দের সংখ্যা প্রচুর। সাদৃশ্যের ফলে যেমন বহু শব্দের ধ্বনি পালটে যায়, তেমনি অনেক নতুন নতুন শব্দও সৃষ্টি হয়।

বাংলায় 'শাশুড়ি', 'বউড়ি' ইত্যাদি শব্দের দেখাদেখি তৈরি হয়েছে 'ঝিউড়ি'। 'রুদ্রাণী', 'শিবাণী' ইত্যাদি 'নী'-যুক্ত স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের সাদৃশ্যে বাংলায় তৈরি হয়েছে 'ডাক্তারনী', 'মজুরনী', 'মাস্টারনী', 'ব্যারিস্টারনী'।

অনেক সময় পরিচিত শব্দ-সমষ্টির কোনো ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রেখে অন্য শব্দকে আমরা পাল্টে দিই, শুদ্ধাশুদ্ধির কথা ভাবি না। যেমন: সম > সমতা, দেব > দেবতা ইত্যাদি শব্দের শেষে 'তা' প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য পদ তৈরি করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার দেখাদেখি তৈরি হয়ে গেল: সখ্য > সখ্যতা, যাথার্থ্য > যাথার্থ্যতা, উৎকর্ষ > উৎকর্ষতা ইত্যাদি। অথচ এগুলি ব্যাকরণের নিয়মে সিদ্ধ নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'আম্মার', 'তোম্মার' প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি-সাদৃশ্যে তৈরি হয়েছে 'সম্মার'।

'উর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'রোদসী' (বেদে এর অর্থ 'অন্তরিক্ষ') শব্দের সাদৃশ্যে ব্যবহার করেছেন 'ক্রন্দসী' শব্দটি। অথচ এই শব্দ বেদে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। শুধু ধ্বনি-সাদৃশ্যের টানে কবি এরূপ স্বাধীনতা নিয়েছেন।

ইংরেজিতে shall, will শব্দগুলির অতীতকালের রূপ যথাক্রমে should, would। এই ঘটনার দেখাদেখি ধ্বনিসাদৃশ্যের টানে তৈরি করা হয় নতুন শব্দ can > could।

জোড়কলম (Portmanteau word):

দুটি ভিন্ন শব্দ কাটাজোড়া করে নতুন একটি শব্দ তৈরি করার নাম 'জোড়কলম'। সব ভাষায় জোড়কলম শব্দের দেখা মেলে। এই জাতীয় শব্দ বাংলাভাষায় প্রচুর। সাহিত্যিকগণও জোড়কলম শব্দ সৃষ্টিতে আনন্দ পান। যেমন — কবি সুকুমার রায় তৈরি করেছেন: হাতি + তিমি > হাতিমি, বক + কচ্ছপ > বকচ্ছপ ইত্যাদি।

এছাড়া অন্যান্য কবি-লেখকদের রচনায় পাই, ঘুম + হোমিওপ্যাথি > ঘুমিওপ্যাথি। গুল + গল্প > গুল্প। ইংরাজিতে শোনা যায়: Smoke + fog > Smog, Tiger + lion > Tigon, Oxford + Cambridge > 0xbridge ইত্যাদি।

এগুলির অনুসরণে বাংলায় তৈরি হয়েছে: ধোঁয়া + কুয়াশা > ধোঁয়াশা, বাঘ + সিংহ > বাংহ, অক্সফোর্ড + কেমব্রিজ > অক্সব্রিজ ইত্যাদি।

লোকনিরুক্তি (Folk-etymology):

'লোকনিরুক্তি' কথার মানে 'লোকের দ্বারা সৃষ্ট অর্থ'। অনেক অপরিচিত ও অজ্ঞাতমূল শব্দ আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেগুলির প্রকৃত অর্থ জানা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ নিজের মত করে শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ও নিরুক্তি কল্পনা করে নেয় ও কোনো পরিচিত শব্দের সাদৃশ্যে শব্দগুলির ধ্বনিপরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষের মুখে এই জাতীয় শব্দের উদ্ভব ও ব্যবহার বেশি। মানবমনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি ও কল্পনাশক্তির পরিচয় এখানে স্পষ্ট। বহু সংস্কৃত ও ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় 'লোকনিরুক্তি'র কবলে পড়ে পরিবর্তিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। কিছু নমুনা:

ধরা যাক, 'ঊর্ণনাভ' শব্দটির কথা। অর্থ মাকড়সা। আদিতে শব্দটি ছিল 'ঊর্ণবাভ'। বয়ন করা অর্থে 'বভ্' ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন কালে প্রাচীন ধাতুটি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের ধারণা হয় মাকড়সা নাভি থেকে ঊর্ণা (তন্তু) বয়ন করে। অতএব এই ধারণার বশে শব্দটির মূলধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

'টাকার কুবের' শব্দগুচ্ছ হয়েছে 'টাকার কুমীর'। এর পেছনেও অজ্ঞতাজনিত ভুল ধারণা। টাকার কুবের বা কুবীর মানে ধনী ব্যক্তি। কুবের শব্দটি সাধারণত মানুষের কাছে খুব পরিচিত নয়। কুমীরের পেট কেটে অনেক ধন-সম্পদ মেলে এই ভুল ধারণার কারণে শব্দটি হয়ে যায় 'টাকার কুমীর'।

সাধারণ মানুষের উচ্চারণে 'Arm chair' হয়ে গেছে > 'আরাম কেদারা'। সাধারণ মানুষ 'arm' শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু জানে যে এ চেয়ারে বসে আরাম পাওয়া যায়। তাই শব্দটির ধ্বনি পালটে দেয়। 'সৎকার' > 'সৎকাজ'। 'চুয়িংগাম' (chewing gum) > 'চুনকাম' (চুনের মত রং)। 'ভ্রমমতি' > 'ভীমরতি'। 'ষণ্ডামর্ক' > 'ষণ্ডামার্কা'।

অভিশ্রুতি (Umlaut):

অপিনিহিতির পরের অবস্থা অভিশ্রুতি। অপিনিহিতির প্রভাবে যে-সব শব্দের ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে দেখা যায় উচ্চারণে অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে। অপিনিহিত 'ই' বা 'উ' ধ্বনি অনেক সময় লুপ্ত হয় অথবা পাশের অন্য ধ্বনির প্রভাবে পালটে যায়। এর নাম অভিশ্রুতি।

বাংলা উচ্চারণে অপিনিহিতি-প্রভাবিত ধ্বনিগুলি পূর্ববঙ্গে এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছে, কিন্তু রাঢ়ী উপভাষায় অর্থাৎ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অপিনিহিতির চিহ্ন আর নেই। এখানে দেখা দিয়েছে অপিনিহিতির পরের স্তর অভিশ্রুতি। উল্টোদিকে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বঙ্গালী উপভাষায় অভিশ্রুতির কোনোই প্রভাবই নেই।

আজি > আইজ (অপিনিহিতি) > আজ (অভিশ্রুতি)

কালি > কাইল (অপিনিহিতি) > কাল (অভিশ্রুতি)

চারি > চাইর (অপিনিহিতি) > চার (অভিশ্রুতি)

মাছুয়া > মাউচ্ছা (অপিনিহিতি) > মেছো (অভিশ্রুতি)

গাছুয়া > গাউচ্ছা (অপিনিহিতি) > গেছো (অভিশ্রুতি)

করিয়া > কইর‍্যা (অপিনিহিতি) > ক'রে (অভিশ্রুতি)

হাসিয়া > হাইস্যা (অপিনিহিতি) > হেসে (অভিশ্রুতি)

দদ্রু > দাউদ (অপিনিহিতি) > দাদ (অভিশ্রুতি)

বলিয়া > বইল্যা (অপিনিহিতি) > বলে (অভিশ্রুতি)

হাটুরিয়া > হাটুরা (অপিনিহিতি) > হাটুরে (অভিশ্রুতি) ইত্যাদি।

৮.৪ সারসংক্ষেপ

এই এককে ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন মাত্রা, ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ, ধ্বনিপরিবর্তনের স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সময় পরিবর্তনের ধারায়, ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ধ্বনিপরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন মূলত চারটি পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়। শিক্ষার্থী এই একক পাঠের মাধ্যমে ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন মাত্রাগুলি যেমন ধ্বনির আগম, ধ্বনির লোপ, ধ্বনির স্থানান্তরণ, ধ্বনির রূপান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

একক ৯ ❑ শব্দার্থতত্ত্ব

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ শব্দার্থতত্ত্বের স্বরূপ

৯.৪ শব্দার্থের মধ্যে নিহিত প্রাচীন ইতিহাস

৯.৫ সারসংক্ষেপ

৯.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে—

- শব্দার্থতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়।
- শব্দার্থের অন্তরালে প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য কীভাবে রক্ষিত থাকে।
- শব্দার্থ পরিবর্তনের নানা কারণ।
- শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারার পরিচয়।

৯.২ প্রস্তাবনা

আগে বলা হয়েছে যে, বহতা নদীর মতোই প্রতিটি জীবন্ত ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের একাধিক ক্ষেত্রের অন্যতম হল শব্দার্থ। শব্দের অর্থ কখনোই স্থির ও অচল থাকে না। অর্থ নিয়ত পালটে যায়। কেন পালটে যায়? এই একক-এ তার উত্তর পাওয়া যাবে। কীভাবে অর্থ পাল্টায়, অর্থপরিবর্তনের ধারাগুলি কী, এসম্পর্কেও দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করা হবে।

৯.৩ শব্দার্থতত্ত্বের স্বরূপ

পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডারে-রক্ষিত শব্দ-উপাদানকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে প্রাচীনকাল থেকে এদের শরীরে পরিবর্তনের ছাপ। এই পরিবর্তন শুধু ধ্বনি উচ্চারণ বা গঠনগত নয়, অর্থগতও বটে। পরিবর্তনের ছাপ গায়ে পড়েনি, এমন শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আচার্য সুকুমার সেনের কথা অনস্বীকার্য যে, “এমন কোনো শব্দ বা পদ নাই যাহার অর্থের এতটুকু বিচ্যুতি নাই।” শব্দ প্রতিনিয়ত অসংখ্য গৌণ অর্থ সৃষ্টি করে চলেছে, এক সময় মুখ্যার্থটি হয়তো সম্পূর্ণ হারিয়েই যায়। পরিবর্তনের এই বহুবিচিত্র গতিপ্রকৃতিকে সূত্রবদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

শব্দার্থের পরিবর্তন বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকে প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে আলোচনার শেষ নেই। সংস্কৃত আলংকারিক ও বৈয়াকরণগণ শব্দের তিন প্রকার অর্থ ও শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন -১) অভিধা ২) লক্ষণা ও ৩) ব্যঞ্জনা।

কোনো শব্দের মূল অর্থ বলতে আমাদের মনে জাগে অভিধান-নির্দিষ্ট বাচ্যার্থের কথা। কিন্তু শুধু বাচ্যার্থের মধ্যে শব্দ আবদ্ধ থাকে না, নানা ব্যবহার-বৈচিত্র্যের পথ ধরে সে ব্যুৎপত্তিগত আভিধানিক অর্থের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে আসে ও একাধিক গৌণার্থ তৈরি করে। পরে, সেই গৌণ অর্থগুলির মধ্যে অন্য কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য পেয়ে যেতে পারে। এইভাবে লক্ষণা শক্তির টানে শব্দের নতুনতর তাৎপর্য রচিত হয়। এখানেই শেষ নয়, অনেক সময় শব্দ আভিধানিক অর্থ থেকে একেবারেই সরে যায় ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রভাবে বাচ্যাতিরিক্ত এক প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ করে।

ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য: "শব্দার্থতত্ত্ব বা শব্দার্থপরিবর্তন (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। তবে শব্দার্থতত্ত্ব ঠিক ব্যাকরণের অঙ্গ নয়। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় ইহা আবশ্যিক অনুষঙ্গ। ভাষাবিজ্ঞানের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হইল ইহার ফলিত (practical) প্রয়োগ। শব্দার্থতত্ত্ব এই ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত।"

অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত হওয়ার যোগ্য নয়। নির্দিষ্ট কোনো সূত্র বা নিয়ম ধরে শব্দের অর্থ, পরিবর্তনের পথে সঞ্চালিত হয় না। পরিবর্তনকে কোনো নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যাও করা যায় না। মানুষের মনের গতি-প্রকৃতি, কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক পরিবেশ, অলংকার-প্রবণতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে শব্দের অর্থ সঞ্চালিত হয়। এমন কি, বক্তা ও শ্রোতার আলোচনার প্রসঙ্গ ও মনোভাব অনুযায়ীও অর্থ বদলে যায়। কোনো শব্দের একাধিক গৌণ অর্থ সৃষ্টির নমুনা আমাদের অভিজ্ঞতায় নিতান্ত কম নেই। পরিপ্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ স্পষ্ট না হলে শব্দের একাধিক গৌণার্থ সামনে চলে আসে, শ্রোতার উদ্দিষ্ট সঠিক অর্থ স্পষ্ট হয় না। ধরা যাক, 'কামান দাগা' বাক্যাংশটি। যদি বলা হয়, "তারা নিরন্তর কামান দেগে চলেছেন।" তবে বাক্যের অর্থ নিয়ে শ্রোতার মনে সংশয় থাকে। যদি বলা হয়, "ভারতীয় সেনারা সীমান্তে কামান দেগে চলেছেন"। তবে এর বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। প্রসঙ্গ এখানে সীমান্ত রক্ষা। আর যদি বলা হয়, "সরকার-পক্ষ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কামান দেগে চলেছেন" তখন শব্দের লক্ষণা শক্তি অনুযায়ী কামান দাগা'-র অর্থ আমূল পালটে যায়। এখানে অর্থ দাঁড়ায় — আক্রমণ করা। প্রসঙ্গ এখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব।

কেউ যদি বলেন, "একটা লক্ষ্মী, দুটো ডায়মণ্ড দিন" তখন এই বাক্যের তাৎপর্য উদ্ধার করতে গলদঘর্ম হতে হয়। কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে দাঁড়ালে মুহূর্তে এই বাক্যের মানে স্পষ্ট হয়ে যায় — 'লক্ষ্মী' মানে লক্ষ্মীকান্তপুর, 'ডায়মণ্ড' মানে ডায়মণ্ডহারবার।

ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য যথার্থ:

> "শব্দের অর্থপরিবর্তন কাহিনী বিচিত্র এবং মনোরম। ইহা হইতে মানবমনের চিন্তাধারার বিবিধ ও বিচিত্র বিসর্পণের নির্দেশ পাওয়া যায়।"

'দাঁড়ানো' ক্রিয়াপদের বাচ্যার্থ সবার জানা। কিন্তু যখন বলা হয় — "একটু দাঁড়াও, আমি আসছি' — তখন এর অর্থ 'অপেক্ষা করা'। বাসে উঠে কোনো যাত্রীকে যদি বলি 'চেপে বসুন' তিনি নিশ্চয়ই বসার আসনে আরেকটু চাপ দিয়ে বসবেন না, খানিকটা সরে বসবেন। অর্থাৎ 'চাপা' ক্রিয়াপদের অর্থ দাঁড়িয়ে গেল 'সরে যাওয়া'।

আলংকারিক প্রয়োগের কারণে শব্দ কীভাবে মূল অর্থ থেকে সরে যায় ও বিশিষ্টার্থক হয়ে ওঠে, এর অগণিত দৃষ্টান্ত আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে দেখা যায়। 'মাথা' (< সং. মস্তক) শব্দটির অর্থবৈচিত্র্য দেখা যাক। এর মূল অর্থ শরীরের 'উত্তমঙ্গ'। তার **মাথায়** অনেক চুল', 'রাবণের দশ **মাথা**' প্রভৃতি বাক্যে বাচ্যার্থটি রক্ষিত। কিন্তু বাচ্যার্থের মধ্যে এর অর্থ স্থির নিশ্চল হয়ে রইল না, অসংখ্য গৌণ অর্থে ছড়িয়ে পড়ল।— রামবাবু সমাজের **মাথা**', 'আমার **মাথা** হেঁট হয়ে গেল', 'মিছিলের **মাথায়** ছিলেন মাতঙ্গিনী', 'পেরেকের মাথা', 'ছেলেটির অঙ্কে **মাথা** নেই', 'তোমার কথার **মাথা**-মুণ্ডু বুঝতে পারি না', 'ওকে **মাথায়** তুলো না', 'আমার **মাথা** খাও', 'তুমি চলে যেওনা', '**মাথার** দিব্যি রইল' ইত্যাদি। মনোবিষয়ক কারণ, সাদৃশ্যবোধ, অলঙ্কার সৃষ্টির প্রবণতা ইত্যাদির কারণে এত অর্থ-বৈচিত্র্য এসেছে।

৯.৪ শব্দার্থের মধ্যে নিহিত প্রাচীন ইতিহাস

শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি এক অন্তহীন রহস্যের ভাণ্ডার। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের বৈচিত্র্য ও ইতিহাস ভাষাতাত্ত্বিকদের নিরীক্ষণের বিষয় হলেও, ইতিহাসের গবেষকদের কাছেও এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। প্রতিটি শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের স্তরে স্তরে লুকিয়ে রয়েছে সেই ভাষা-সম্প্রদায়ের সামাজিক বিবর্তনের নানা অজানা তথ্য।

আচার্য সুকুমার সেনের কথা স্মরণযোগ্য যে, "শব্দের অর্থপরিবর্তনের মধ্যে ভাষাসম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসের ও চিন্তাধারার আভাস-ইঙ্গিত লুকানো থাকে। তাই শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি বস্তুব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে এমন অনেক কিছু জানিতে পারি যাহা অন্যথা মিলে না।" শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনার পথ ধরে অতীতের অন্ধকারময় ইতিহাসে আলো-প্রক্ষেপণ সম্ভব, ড. সুকুমার সেন যাকে বলেছেন—"সুদূর অতীত ইতিহাসের জীর্ণদ্ধার।"

ধরা যাক, প্রাচীন বৈদিক 'অসুর' শব্দ। বেদে রয়েছে 'অসুরমেধাঃ'। এর মূল অর্থ 'প্রাণদাতা, ঈশ্বর'। অর্থাৎ প্রাচীনকালে অসুর ছিলেন প্রাচীন আর্যদের আরাধ্য দেবতা। ক্রমে এই শব্দটি বিপরীত অর্থ গ্রহণ করলো— "ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ, দেবশত্রু, দানব'। 'অসুর' আর প্রাণদাতা আরাধ্য দেবতা রইলেন না। অন্যদিকে পশ্চিমদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার যে শাখাটি গেছে, সেই ইরানীয় ভাষায় (অসুর > অহুর) শব্দটির মূল অর্থ অপরিবর্তিত আছে। ভারতীয় আর্যভাষায় 'দেবতা' অর্থে নতুন শব্দ তৈরি হয় 'সুর'। শব্দের এই অভিনব অর্থ-বৈপরীত্য থেকে সেকালের আর্যজাতির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

'আর্য' শব্দের অর্থে প্রাচীন ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। 'আর্য' বলতে আমরা প্রাচীন এক বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীকে বুঝি, কিন্তু আদিতে শব্দটির মানে ছিল 'গমনশীল'। প্রাচীন যুগে এই জাতি যে যাযাবর শ্রেণিভুক্ত ছিল, এটিই তার অকাট্য প্রমাণ। অনুরূপ, 'পাষণ্ড' শব্দ। আগে অর্থ ছিল 'বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়', পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'ধর্মজ্ঞানহীন বিবেকশূন্য ব্যক্তি'। অনুমান করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ধর্মীয় বিদ্বেষ এখানে বলবৎ।

'সন্দেশ' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'সংবাদ', এখন অর্থ 'এক প্রকার মিষ্টদ্রব্য'। সন্দেশ আদান-প্রদান প্রাচীন বাংলার এক বড় লোকাচার। আগে দূরবর্তী কোনো আত্মীয়গৃহের কুশলাদি জানতে বা তাদের কাছে কোনো সংবাদ (সন্দেশ) পাঠাতে অন্য আত্মীয়রা যেত। সঙ্গে অবশ্যই যেত নানা মিষ্টদ্রব্য। সংবাদ আদান-প্রদানই ছিল মুখ্য, কিন্তু ক্রমে 'সংবাদ' এর থেকে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় 'আত্মীয়ের আনীত মিষ্টদ্রব্য'। এক বিশেষ সামাজিক আচারের ইতিহাস এখানে আভাসিত।

'বিবাহ', 'দেওর' প্রভৃতি শব্দেও অতীতের কিছু বিশেষ সামাজিক-পারিবারিক প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্য জনগোষ্ঠীর কন্যাকে জোর করেই হয়তো বহন করে নিয়ে যাওয়া হত ও স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা হত। 'দ্বিবর' থেকে জাত 'দেবর' বা 'দেওর' শব্দের অর্থে ইঙ্গিত রয়েছে। স্বামীর অবর্তমানে বিধবা স্ত্রী স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই দ্বিতীয় স্বামী রূপে গ্রহণ করতেন।

সমাজের ইতিহাসের নানা লুপ্তপ্রায় পদচিহ্ন শব্দার্থের অন্তরালে খোদিত থাকে। প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণায় ঐতিহাসিককে তাই অনেক সময় ভাষাতাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হতে হয়।

৯.৫ সারসংক্ষেপ

শব্দার্থতত্ত্বের সংজ্ঞা, স্বরূপ, শব্দার্থতত্ত্ব সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত, শব্দের অর্তের বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

একক ১০ ❑ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ ও ধারা

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

১০.৩ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

১০.৪ সারসংক্ষেপ

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককে জানা যাবে-

- শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন মাত্রা
- শব্দার্থ পরিবর্তনের বহুমাত্রিক কারণ
- শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

১০.২ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

নানা কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন:

১। ভিন্ন পরিবেশগত কারণ : পরিবেশগত ভিন্নতার কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। এর আবার নানা ধরন। যথা:

বস্তুগত ভিন্নতা: কোনো বিশেষ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে নির্মিত বা উদ্ভূত কোনো বস্তু পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়তে পারে। তখন বস্তুটির পুরোনো অর্থ পালটে যায়।

কলম, পেন, গেলাস প্রভৃতি শব্দের কথা ধরা যাক। এই সামগ্রীগুলির বস্তুগত উপাদান আগে যা ছিল, এখন আর তা নেই। 'কলম' বলতে বোঝাত 'খাগ বা শরের নির্মিত লেখনী'। পরবর্তীকালে সে-সব বস্তু উপাদান বাতিল হয়েছে। অতএব, অর্থও বদলে গেল। বর্তমানে 'কলম' এর অর্থ—যে-কোন ধাতু-নির্মিত লেখনী। অনুরূপ ঘটনা 'পেন' (< Penna, অর্থাৎ পালক)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। পেন বলতে বোঝাত পালকের তৈরি লেখনী', এখন অর্থ যে-কোনো ধাতুতে নির্মিত লেখনী। 'গেলাস' (glass) বলতে বোঝাতে কাঁচের তৈরি পানাধার। এখন অর্থ — যে-কোনো ধাতুতে তৈরি (মাটি, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি) পানাধার। কাঁচের সঙ্গে অর্থের আর কোনো যোগ নেই। সময়ের পরিবর্তনকে স্বীকার করে এখন সেই সব বস্তু উপাদানের বদল ও বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। অর্থ পরিবর্তনের এটি এক বড় কারণ।

কালগত ভিন্নতা: মানব-সমাজ সর্বদা নানা কালগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কালগত ভিন্নতার কারণে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বদল হয়, মানুষের জীবিকার পরিবর্তন হয়। এর ফলে বহু শব্দের অর্থ পালটে যায়।

প্রাচীনকালে 'উপাধ্যায়' বলতে অধ্যাপনা কর্মে-রত শিক্ষিত পণ্ডিতকে বোঝাত। সংস্কৃত শব্দ 'উপাধ্যায়' ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাকৃত হয়ে বাংলায় এসেছে এভাবে: 'উপাধ্যায় > উঅজ্ঝাঅ > ওঝা > রোজা। শব্দটির শুধু ধ্বনি বদলায়নি, হাজার বছরের ব্যবধানে তার অর্থও আমূল বদলে গেছে। 'ওঝা' বা 'রোজা' বলতে এখন বুঝি 'গুনিন'—যিনি ভূত-প্রেতাদি ও আধি-ব্যাধির প্রতিকার করেন, ঝাড়-ফুক করেন।

স্থানগত ভিন্নতা: কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের ব্যবহৃত শব্দ যখন দূরবর্তী কোনো দেশ বা অঞ্চলে যায়, তখন প্রায় অজ্ঞাত মূল শব্দটির পুরোনো অর্থ ধরে রাখা কঠিন হয়। ভিন্ন পরিমণ্ডল ও পরিবেশ শব্দটির অর্থ পালটে দেয়। 'দ্রাখ্‌মে' (মুদ্রা বিশেষ > পরে অর্থ দাম), 'যবন' (গ্রিক জাতি > অস্পৃশ্য জাতি বা মুসলিম), 'ম্লেচ্ছ' (মূল অর্থ ভিন্ন ভাষী > পরে অর্থ অস্পৃশ্য নীচ জাত), কাফের (এক বিশেষ ভাষা > পরে অর্থ ধর্মত্যাগী বা বিধর্মী) প্রভৃতি শব্দ ভিন্ন দেশ থেকে প্রাচীন বা মধ্যযুগে এদেশে এসেছে। বাংলায় এগুলির ব্যবহার রয়েছে, তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোনো শব্দই এখন আর মূল অর্থের ধারে-কাছে নেই।

ভাষাগত ভিন্নতা: এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় গৃহীত হলে প্রায়ই অর্থ পরিবর্তনের কবলে পড়ে। ফারসির 'খুন', 'দরিয়া', বুজুর্গ' শব্দগুলির আদি অর্থ যথাক্রমে 'রক্ত', 'নদী', 'প্রবীণ'। বাংলাভাষায় শব্দগুলির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'হত্যা', 'সমুদ্র' ও 'ভণ্ড' ('বুজর্গ' > বুজরুক)। সংস্কৃতের 'সুতরাং' (অর্থ 'অত্যন্ত') বাংলায় ব্যবহৃত হয় 'অতএব' অর্থে।

২। মনোবিষয়ক কারণ: শব্দের অর্থপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মনের গভীর যোগ। তাই মনস্তাত্ত্বিক কারণে শব্দার্থ পরিবর্তনের ঘটনা খুবই সহজলভ্য।

সাদৃশ্যের প্রভাব: অন্য কোনো বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য রচনা করে অনেক সময় আমরা অন্য শব্দের আসল অর্থটি বদলে দিই। ধরা যাক, রাম' শব্দের অর্থপরিবর্তন। 'রাম' শব্দ ব্যক্তিবাচক। ক্রমে বিশেষণরূপে বিরাটত্ব বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার চলতে থাকে। এই সাদৃশ্যবোধের ফলে 'অত্যন্ত দুষ্টু' বোঝাতে ব্যবহার করি 'রামদুষ্টু', বড় ছাগল বোঝাতে বলি 'রামছাগল', বড় আকারের ধনুক বোঝাতে বলি 'রামধনু', বড় বোকা বোঝাতে বলি 'রামবোকা' ইত্যাদি।

অনবধানতা: 'কোদণ্ড' শব্দের অর্থ ধনুক। কবি দাশরথি রায় অনবধানতা বশত গানে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন 'কোদাল' অর্থে। 'বারুণী' শব্দের অর্থ 'মদ'। কবি মধুসূদন শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বরুণের স্ত্রী' অর্থে। সবই অনবধানতার প্রভাব।

শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা: শব্দ ব্যবহারে শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা অনেক সময় তার অর্থ বদলে দেয়। আমরা যখন বলি 'চা-টা খেয়ে যেও' — তখন 'টা' বলতে বোঝায় 'জলখাবার'।

অঙ্গচ্ছেদ: অনেক শব্দগুচ্ছের সবটা আমরা উচ্চারণ করি না। অংশমাত্র ব্যবহার করে গোটা শব্দের অর্থ প্রকাশ করি। এরূপ অঙ্গচ্ছেদের কারণে শব্দের অর্থ বদল হয়। 'আপনাকে দণ্ডবৎ হই', 'আজ কাগজ আসেনি' ইত্যাদি বাক্যে 'দণ্ডবৎ' বলতে বোঝায় 'দণ্ডবৎ প্রণাম'। 'কাগজ' বলতে 'খবরের কাগজ'। 'বেনারসী' মানে 'বেনারসী কাপড়'।

সংস্কার-বিশ্বাসের প্রভাব: ভাষা-ব্যবহারকারী মানুষজনের মানসিক গঠন, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি কোনো অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণ সুভাষণ (Euphemism) ও বাক্‌নিষিদ্ধতা (verbal taboo)-র প্রভাব নিয়ে নানা দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন।

শিষ্টাচার ও শোভনতা রক্ষার কারণে শব্দের অর্থ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। অপ্রিয়তা কাটাবার এই ভাষাভঙ্গিকে বলা হয় 'সুভাষণ' (euphemism)। সামাজিক ও মানবিক দিকে লক্ষ রেখে বহু সুভাষিত শব্দকোষ তৈরি করে নেওয়া হয়। 'হরিজন', 'জমাদার' 'জনজাতি' 'ঠাকুর' শব্দগুলি এর নমুনা। 'ঘুষ' শব্দে একপ্রকার হীনতা রয়েছে, এই মহান কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা সৌজন্যের খাতিরে 'ঘুষ' এর বিকল্প শব্দ ব্যবহার করেন — 'দস্তুর', 'সেলামী', 'টিপস', 'কাট-মানি' ইত্যাদি।

ধর্মীয় সংস্কার-বিশ্বাস, লোকাচার, মনস্তাত্ত্বিক বাধার কারণে বহু শব্দের উচ্চারণ নিষিদ্ধ হতে পারে। এর নাম বাকনিষিদ্ধতা (verbal taboo)। ভাষাবিজ্ঞানীরা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর সব দেশেই নানা জাতির মধ্যে এই ঘটনা ঘটে থাকে। প্রাচীনকালে তো ছিলই, একালেও আমরা এই অভ্যাসের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারিনি। বিদায়কালে 'যাই, যাচ্ছি, যাও' ইত্যাদি বলায় বারণ, বলতে হয় 'আসি, আসছি, এসো' ইত্যাদি। ভয় ও আশঙ্কা কাজ করে—এই যাওয়াই যদি শেষ যাওয়া হয়! গোঁড়া বৈষ্ণবরা এককালে শাক্তদের দেবদেবী ও শক্তিপূজার উপকরণের নাম পর্যন্ত নিতেন না, এই কারণে তৈরি হয়েছিল নানা প্রতিস্থাপক সুভাষিত শব্দসম্ভার, যেমন — দশহাত ঠাকুর (দুর্গা), ময়লা ঠাকুর (কালী), তে-ফরকা পাতা (বেল পাতা) ইত্যাদি। এক কালে হিন্দুরা মুরগির নামও মুখে নিতেন না, পরে যখন মুরগি পাতে ওঠে তখন শুদ্ধাচারের মুখ চেয়ে নাম পালটে দেওয়া হয়, মুরগি হয়ে যায় 'রামপাখি'। রাম-নামে আর যবন-দোষ রইলো না!

অকল্যাণসূচক ও কুৎসিত কোনো কিছুর প্রকাশকে আমরা ভদ্রতা দিয়ে মুড়ে দিই। ঘরে কোনো সামগ্রীর অভাব হলে গৃহিণীরা 'নেই' বলেন না, বলেন, 'বাড়ন্ত'। 'মৃত্যু'কে সুভাষিত করে বলা হয় 'পরলোক গমন, স্বর্গলাভ' ইত্যাদি।

কোনো কোনো শব্দ ব্যবহারে আমরা মানসিক বাধা ও সঙ্কোচ অনুভব করি। স্ত্রী-ভাষায় এর প্রভাব বেশি। বসন্ত রোগকে নির্দেশ করা হয় 'মা-শীতলার কৃপা'। রাতে সাপের নাম নিতে নেই — তাই শব্দটির পরিবর্তে গ্রাম-বাংলায় শোনা যায় 'লতা' শব্দ। এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হল।

৩। আলংকারিক কারণ: আমরা ভাষায় অলংকার প্রয়োগ করতে ভালোবাসি। আলংকারিকতা কীভাবে শব্দের অর্থ বদলে দেয়, তার কিছু নমুনা নীচে আলোচিত হলো:

ভাবাবেগ ও অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি: আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, বিস্ময় ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় এমন সব বিশেষণ ব্যবহার করা হয় যে, ভাবাবেগের প্রবলতা বশত সেই সব শব্দের অর্থ বদলে যায়। 'দারুণ ব্যাপার', 'ভয়ানক সুন্দর', 'মারাত্মক কথা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে ব্যবহৃত বিশেষণগুলির অর্থ বদলে গেছে। 'দারুণ ভাবে'।

রূপকের প্রয়োগ: রূপক প্রয়োগের প্রবণতা মানুষের মজ্জাগত। 'পুলিশের জালে' আসামী ধরা পড়ে, মাছ নয়। ক্রুদ্ধ হলে আমাদের চোখে 'আগুন জ্বলে'। শোকে অনেক সময় আমরা 'পাথর' হয়ে যাই। শত্রুকে 'হাতে' নয়, 'ভাতে' মারতে চায় অনেকে। পড়া না পারলে ক্লাসরুমে ছাত্রের মাথায় 'গোবর'-এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। নেতাদের আমরা 'মাথায় করে' রাখি। এজাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহৃত ভাষায় পাওয়া যাবে।

১০.৩ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

শব্দার্থ পরিবর্তনকে পাঁচটি ধারায় ভাগ করা হয়। মূলধারা তিনটি, যথা, অর্থপ্রসার, অর্থসংকোচ ও অর্থসংশ্লেষ। এছাড়া আরও দুটি গৌণধারার কথা অনেক ভাষাতাত্ত্বিক উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—অর্থের অবনতি ও অর্থের উন্নতি। দৃষ্টান্ত সহযোগে ধারাগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।

অর্থপ্রসার: অনেক সময় দেখা যায় শব্দের অর্থ মূল আভিধানিক অর্থের গণ্ডি অতিক্রম করে অনেক দূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আদিতে হয়তো শব্দটি একটি মাত্র বস্তু, ভাব, বিষয় বা ব্যক্তিকে বোঝাত, কিন্তু পরবর্তীকালে তা একাধিক বস্তু, ভাব, বিষয় বা ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝাচ্ছে। এরূপ অর্থপরিবর্তনের নাম অর্থপ্রসার। অর্থের পরিধি এক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, তাই এই নাম।

'কালি' শব্দের মূল অর্থ 'কালো রঙ'। বর্তমানে এর অর্থ 'যে-কোনো রঙ'। আমরা বলে থাকি সবুজ কালি, নীল কালি ইত্যাদি।

'তৈল, তেল' বলতে আগে বোঝাত 'তিলের নিষ্কাষিত রস'। এখন শব্দটি শুধু 'তিল'-এ আবদ্ধ নেই। এখন যে-কোনো শস্যবীজের নিষ্কাষিত রস অথবা খনিজ তরলকে আমরা তেল বলে থাকি, যথা, সরষে তেল, নারকেল তেল, কেরোসিন তেল ইত্যাদি। অর্থের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে।

'বর্ষ' শব্দের অর্থ ছিল 'বর্ষাকাল'। ক্রমে অর্থ পালটে তা দাঁড়িয়েছে 'বৎসর'। 'গাঙ' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গঙ্গা নদী', এখন বোঝায় যে-কোনো নদী'। অর্থ প্রসারের সুন্দর নমুনা 'বাঁশি'। শব্দটির উৎপত্তি বাঁশ থেকে, অর্থ ছিল বাঁশ দিয়ে নির্মিত বিশেষ সঙ্গীত-যন্ত্র। এখন বাঁশি শুধু বাঁশ নয় অন্য ধাতুতেও তৈরি হয়। আবার 'whistle"- কেও বলা হয়' বাঁশি।

'পাত্র' বলতে বোঝাত 'কোনো কিছু রাখার আধার'। যেমন, জলপাত্র, দুধের পাত্র। এখন অর্থ প্রসারিত হয়েছে। 'বর'কেও বলা হয়ে থাকে 'পাত্র'। স্মরণীয় সুকুমার রায়ের ছড়া 'সৎ পাত্র'।

অর্থপ্রসারে অনেক সময় শব্দের অর্থ প্রতীকী হয়ে পড়ে। 'ভাত' শব্দের অর্থ সবার জানা। কিন্তু যখন বলা হয় 'তোমাকে হাতে নয় ভাতে মারব' তখন এর অর্থ দাঁড়ায় 'জীবিকার সংস্থান'।

'মীরজাফর' এক ব্যক্তিবিশেষের নাম হলেও এখন সাধারণভাবে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'যে-কোনো বিশ্বাসঘাতক'।

'বিভীষণ' রামায়ণের চরিত্র বিশেষ নন, আত্মীয়বেশী শত্রু বা প্রতারক অর্থে শব্দটির ব্যবহার চলছে।

অর্থসংকোচ: অর্থপ্রসারের বিপরীত ঘটনার নাম অর্থসংকোচ। এক্ষেত্রে শব্দের অর্থের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে সমষ্টি থেকে ব্যষ্টিতে এসে নিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ সহজ করে বলা চলে যে, কোনো শব্দ আগে একাধিক বস্তু, ভাব, বিষয় বা ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝাত, কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। একে বলা হয়ে থাকে অর্থসংকোচ।

ধরা যাক 'মৃগ' শব্দটি। 'মৃগ' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'যে কোনো পশু'। সে-কারণে 'মৃগয়া' শব্দের অর্থ ছিল 'যে-কোনো পশু শিকার'। এখন 'মৃগ' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট একটি পশু 'হরিণ'। অর্থের গণ্ডি ছোটো হয়ে এসেছে।

'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'খাদ্য', এখন এর সংকুচিত অর্থ 'ভাত'।

'পান' (< পর্ণ) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মূল অর্থ 'যে-কোনো পাতা'। কিন্তু একালে আমরা পান বলতে যে-কোনো পাতা বুঝি না, শুধু বিশেষ এক ধরনের চর্ব্যজাতীয় পাতাকে বুঝি। স্পষ্টতই এখানে অর্থের সংকোচ ঘটেছে। ইংরেজি শব্দ 'meat' এর মূল অর্থ 'যে-কোনো খাদ্য'। এখন আর তা বোঝায় না। অর্থ দাঁড়িয়েছে 'মাংস'।

অর্থসংশ্লেষ: অনেক সময় শব্দের অর্থ ক্রমাগত প্রসার ও সংকোচের কবলে পড়ে মূল অর্থ থেকে অনেক দূরে সরে যায়, এমনকি, মূল অর্থের বিপরীত অর্থও জ্ঞাপন করে থাকে। এর নাম অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম।

'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'ধর্মসম্প্রদায়'। এখন এর অর্থ ধর্মজ্ঞানহীন বিবেকহীন মানুষ।

'সন্দেশ' শব্দের আদি অর্থ 'সংবাদ', এখন অর্থ 'এক প্রকার মিষ্টদ্রব্য'।

'গবেষণা' বলতে আগে বোঝাত 'গোরু খোঁজা', এখন গোরু খোঁজার সঙ্গে শব্দটির দূরতম সম্পর্কও আমরা কল্পনা করতে পারি না। একালে গবেষণা বলতে বুঝি কোনো বিষয়ের তত্ত্ব-অনুসন্ধান।

'দারুণ' শব্দের আদি অর্থ 'কাঠের নির্মিত', এখন অর্থ 'চমৎকার, সুন্দর' ইত্যাদি। কোনো কিছুর উচ্চ প্রশংসা করতে আমরা এই বিশেষণটি ব্যবহার করি।

'হঠাৎ' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'হঠকারিতাবশত', এখন পরিবর্তিত অর্থ 'অকস্মাৎ'।

এবার আমরা শব্দার্থ পরিবর্তনের দুটি গৌণ ধারার পরিচয় দেব। উল্লিখিত তিনটি মুখ্য ধারা থেকেই এগুলির উৎপত্তি।

অর্থের উন্নতি: অনেক সময় শব্দের প্রচলিত সাধারণ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ কিছুকে নির্দেশ করে। এর নাম অর্থের উন্নতি।

ধরা যাক, "মন্দির" শব্দটি। আগে এর সাধারণ অর্থ ছিল 'গৃহ'। যে-কোনো ঘরই হল মন্দির। শয়ন মন্দির, ভোজন মন্দির, বিশ্রাম মন্দির ইত্যাদি আরো কত কী। কিন্তু এখন শব্দটির অর্থ একই সঙ্গে সংকুচিত ও উন্নত হয়েছে। 'মন্দির' বলতে আমরা বুঝি বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ গৃহ — দেবতার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ।

'গবেষণা' শব্দের অর্থ-পরিবর্তন অর্থসংশ্লেষ-এ আলোচিত হয়েছে। 'গবেষণা' বলতে আগে বোঝাত 'গোরু খোঁজা', এখন গবেষণা বলতে বুঝি কোনো বিষয়ের তত্ত্ব-অনুসন্ধান। লক্ষ করলে দেখা যাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শব্দটির অর্থের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছে।

'ধন্য' শব্দের আদি অর্থ 'ধনবান'। এখন এর অর্থ 'সর্ব অর্থে সৌভাগ্যবান'।

'থান' (< স্থান) বলতে বোঝাত যে-কোনো স্থান, সেক্ষেত্রে ভালো-মন্দের বিচার ছিল না। বর্তমানে আমরা বলি 'মায়ের থান', 'শীতলার থান', 'পীরের থান'। অর্থাৎ শুধু দেব-দেবীর অধিষ্ঠান-ভূমি বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার। সাধারণ অর্থ ছেড়ে উন্নত গৌরবময় অর্থ প্রকাশ করছে।

'গোধূলি' শব্দের অর্থ 'গোরুর ক্ষুরে উৎক্ষিপ্ত ধূলি'। এখন অর্থ 'সন্ধ্যাকাল'। এখানে অর্থ সংশ্লেষের সঙ্গে অর্থের উৎকর্ষও ঘটেছে।

অর্থের অবনতি: শব্দার্থের উন্নতির বিপরীত ব্যাপার এখানে ঘটে থাকে। অনেক সময় নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে শব্দের মূল অর্থের অবনতি ঘটে থাকে, আগের ভালো অর্থ ছেড়ে শব্দ হীন বা অশ্রদ্ধেয় অর্থ গ্রহণ করে। এর নাম অর্থের অবনতি।

'অসুর' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'প্রাণদাতা, ঈশ্বর'। পরবর্তীকালে প্রাচীন আর্য জাতির গোষ্ঠী-সংঘর্ষের ফলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'দেবশত্রু, দানব'।

'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ 'মহৎ ব্যক্তি'। যেমন, 'মহাজনদের পদাবলি'। এখন অর্থ 'উত্তমর্ণ' ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি সুদের বিনিময়ে অর্থ ধার দেন। যেমন, মহাজনের কাছে আমার অনেক টাকা ঋণ। 'ইতর' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'অপর'। এখন অর্থ 'অধম নীচাশয় ব্যক্তি'।

'ঝি', 'মাসি' ইত্যাদি শব্দের কথা ধরা যাক। গভীর আত্মীয়তা-দ্যোতক এই শব্দগুলির মর্যাদাও আর টিকে নেই একালে। 'ঝি' শব্দের মূল অর্থ 'দুহিতা' অর্থাৎ কন্যা, 'মাসি' বলতে 'মায়ের বোন'। এখন শব্দ দুটির অর্থ বাড়ির কাজের মেয়ে।

'ওঝা' (উপাধ্যায়) শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত শিক্ষক', এখন অর্থ 'গুনিন'—যিনি ভূত-প্রেতাদি ও আধি-ব্যাধির প্রতিকার করেন।

'প্রীতি' শব্দ থেকে উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে (ভগ্ন-তৎসম রূপে) নিষ্পন্ন হয়েছে 'পীরিতি'। অর্থ প্রায় একই রইল, কিন্তু পরিবর্তিত অর্থে অবজ্ঞার ভাব। নিন্দার্থে শব্দটির প্রয়োগ গ্রামীণ সমাজে।

'চাকর'-এর মূল অর্থ কর্মচারী। এখন 'ভৃত্য'। 'ধীবর' মানে 'ধী সম্পন্ন ব্যক্তি' অর্থাৎ' বুদ্ধিমান ব্যক্তি'। এখন এর মানে 'জেলে'। 'অর্বাচীন' শব্দের অর্থ 'নবীন'। এখন অর্থের অবনতির ফলে মানে দাঁড়িয়েছে 'মূর্খ, অপরিণত-বুদ্ধি'। 'নাগর' শব্দের অর্থ ছিল 'নগরের বিদগ্ধ জন', এখন অর্থ 'অবৈধ প্রণয়ী'।

১০.৪ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ যেমন- পরিবেশগত বিভিন্ন কারণ, মনোবিষয়ক বহুবিধ কারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানতে পারবে। সময়ের সঙ্গে, সঙ্গে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ধারাগুলি, যেমন- অর্থপ্রসার, অর্থের সংকোচন, অর্থের উন্নতি, অবনতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আরহণ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

একক ১১ ❑ বাংলা শব্দের রূপতত্ত্ব

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ রূপতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রধান আলোচ্য বিষয়

১১.৪ বাংলা ভাষায় শব্দ ও পদগঠনে প্রভেদ

১১.৫ বাংলায় শব্দগঠন প্রক্রিয়া

১১.৬ সারসংক্ষেপ

১১.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- রূপতত্ত্ব কী?
- রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?
- শব্দ ও পদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়?
- বাংলা শব্দের গঠন কী কী ভাবে হয়ে থাকে?

১১.২ প্রস্তাবনা

এই এককে প্রথমে আমরা রূপতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করব। পরে শব্দের গঠন ও রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত, প্রত্যয়-যোগে শব্দগঠন, উপসর্গ-যোগে শব্দগঠন ও শব্দজোড় বা শব্দদ্বৈত গঠনের দ্বারা নতুন নতুন বাংলা শব্দ তৈরির প্রক্রিয়া বিষয়েও কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়া হবে।

১১.৩ রূপতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রধান আলোচ্য বিষয়

রূপতত্ত্বের আলোচনা ভাষাবিশ্লেষণের এক অতি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে, বিশেষত ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে, রূপতত্ত্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়ে থাকে। রূপতত্ত্বের আলোচনা ব্যতীত ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ অনুধাবন কার্যত অসম্ভব। সব ভাষার ক্ষেত্রেই রূপতত্ত্বের আলোচনা বহু শাখায় বিস্তৃত ও নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী? এর উত্তরে বলা যায় — শব্দের গঠন ও রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অধ্যাপক ড . রামেশ্বর শ'-র ভাষায় বলা চলে:

> "বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে প্রথম আলোচ্য হল বাংলা শব্দ কিভাবে গঠিত হয়, তারপরে আলোচ্য হল এই গঠিত শব্দ ভাষায় যখন ব্যবহৃত হয় তখন কিভাবে তার রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়।"

বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রচলিত বিবিধ প্রকরণ, রীতিনীতি ও বিধিনিষেধের প্রসঙ্গ অপরিহার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, বাংলা ভাষার বিপুল শব্দ ও পদের সম্ভারে সংস্কৃতের প্রভাব অপরিসীম। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারাকে অনুসরণ করেই এক সময় বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল; কিন্তু রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালের ব্যাকরণবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকগণ স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন বাংলা ভাষার আলোচনা বা বিশ্লেষণ কখনওই সংস্কৃতের ব্যাকরণ-বিধিতে বা আদলে হতে পারে না, এই ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অনুযায়ীই এর স্বরূপ বুঝতে হবে। এই ভাষার শব্দনির্মাণ, পদগঠন, বিভক্তিচিহ্ন, প্রত্যয়, অনুসর্গ প্রভৃতির ব্যবহারে সংস্কৃতের উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের অনুবর্তন অত্যন্ত গভীর সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলাকে বাংলা হিসাবেই দেখতে হবে এবং সেকারণে তার রূপতাত্ত্বিক বিশেষত্বও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হবে।

আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—বাংলা ভাষা শব্দ ও পদগঠন প্রক্রিয়া। আমরা সংক্ষেপে এই বহুমুখী ও বহুবিস্তারী বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করব।

১১.৪ বাংলা ভাষায় শব্দ ও পদগঠনে প্রভেদ

শব্দ ও পদের গঠন-প্রক্রিয়া আলোচনার আগে এদের প্রভেদ জেনে নেওয়া আবশ্যক। বাংলায় শব্দ ও পদগঠনের প্রক্রিয়া নানা বৈচিত্র্যে ভরা। প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি যোগ করে বাংলায় নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। তাছাড়া সমাস ও শব্দদ্বৈতের সাহায্যেও নতুন শব্দ তৈরি হয়। গঠনের ক্ষেত্রেও নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, ইংরেজি ভাষায় শব্দ ও পদকে পৃথক করার বিধি নেই। এতে সবই 'word' নামে অভিহিত। ইংরেজির He, Them, Their, This, These, Honest, Honestly ইত্যাদি সবই 'word' ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয়।

শব্দ ও পদের প্রভেদ বিষয়ে বলা চলে, ভাষায় ব্যবহারযোগ্য সব শব্দই আসলে 'শব্দ'। অভিধান খুললে আমরা সারি সারি শব্দের দেখা পাই। সেখানে পদের স্থান নেই। এই শব্দের সঙ্গে যখন বিভক্তি (-র, -এর, -তে, -দের, -কে, -এতে ইত্যাদি) বা নির্দেশক (টা, টি, টে, টুকুন) যুক্ত হয় তখন সেগুলি আর শব্দ থাকে না, হয়ে ওঠে 'পদ'। 'বই', 'ছেলে', 'গোরু' শব্দ, কিন্তু 'বইটা', 'ছেলেটি', 'গোরুটা' 'দুধটুকুন'

হল পদ। তাই বলা হয়ে থাকে, শব্দের স্থান অভিধানে, পদের স্থান বাক্যে। পদের সংজ্ঞায় বলা হয়: বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলা হয় পদ।

উল্লেখ করা যায় যে, শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়, উপসর্গ যুক্ত হলেও সেগুলি শব্দই থাকে, পদ হয় না। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

স্বর্গ, মানব, অক্ষর, গৃহ = শব্দ।

স্বর্গের, মানবের, অক্ষরের, অক্ষরটি, গৃহে, গৃহকে = পদ।

স্বর্গীয়, মানবীয়, মানবিক, অমানবিক, আক্ষরিক, গৃহী = শব্দ। '-ইয়', '-ইক', 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এগুলি 'শব্দ' মাত্র।

"রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার্থে বনে যান।" এটি একটি বাক্য। এতে রয়েছে পাঁচটি পদ — 'রামচন্দ্র', 'পিতৃসত্য', 'রক্ষার্থে', 'বনে', 'যান'।

১১.৫ বাংলায় শব্দগঠন-প্রক্রিয়া

শব্দ হল মানব-কণ্ঠে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। গঠনের দিক থেকে বাংলা শব্দকে সাধারণত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

১) মৌলিক শব্দ: মৌলিক শব্দ হল সেই সব শব্দ যাদের আর বিশ্লেষণ চলে না। আর বিশ্লেষণ করলেও সেই সব বিশ্লিষ্ট শব্দাংশের কোনো অর্থ বা প্রয়োগ-যোগ্যতা থাকে না। হাজার বছর ধরে অন্য ভাষা থেকে বাংলায় শত শত শব্দ এসেছে ও বাংলা শব্দভাণ্ডারের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। মূল ভাষায় হয়তো সেই সব শব্দ মৌলিক শব্দ ছিল না। তবে বাংলায় এদেরকে কীভাবে বিচার করা হবে? উত্তরে বলা চলে — বাংলায় যদি সেগুলির বিশ্লেষণ না করা যায়, বা বিশ্লেষণ করলেও ভাঙা অংশ অর্থবহ না হয়, তা হলে বাংলায় সেগুলি মৌলিক শব্দ বলেই গণ্য হবে।

২) সাধিত শব্দ: যে সব শব্দ বিশ্লেষণযোগ্য তাদের বলা হয় 'সাধিত শব্দ'। গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে সাধিত শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়:

ক) প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ: যে-সব শব্দকে বিশ্লেষণ করে একটি মৌলিক শব্দ ও তার সঙ্গে পাওয়া যায় অতিরিক্ত একটি প্রত্যয়-অংশ, তাকে বলা হয় 'প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ'। অনেক সময় মূল শব্দের আগে প্রত্যয় যুক্ত হয়, এর নাম পূর্বপ্রত্যয় বা উপসর্গ (Prefix) বা এক কথায় উপসর্গীয় প্রত্যয়। অনেক সময় শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়, একে সাধারণত প্রত্যয় (Suffix) নামেই অভিহিত করা হয়।

প্রসিদ্ধ = প্র + সিদ্ধ। এখানে 'সিদ্ধ' মৌলিক শব্দ, 'প্র' উপসর্গ। বাছাই = বাছ + আই। এখানে 'বাছ' মৌলিক শব্দ, '-আই' প্রত্যয়।

খ) সমস্ত বা সমাসবদ্ধ শব্দ: সাধিত শব্দের অন্য একটি শ্রেণি হল 'সমস্ত' বা 'সমাসবদ্ধ শব্দ'। সাধিত শব্দ বিশ্লেষণ করলে একাধিক মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন — রাজপথ = 'রাজ' + 'পথ'। ঘরবাড়ি = 'ঘর' + 'বাড়ি'। এখানে শব্দের দুটি অংশই মৌলিক শব্দ। এবার আমরা বাংলা শব্দ গঠনপ্রক্রিয়ার কিছু বিশেষ দিক তুলে ধরব।

ক) প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন: শব্দের গঠনে প্রত্যয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যয়ের কয়েকটি শ্রেণি। সংক্ষেপে এদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

কৃৎ-প্রত্যয়: যে সব প্রত্যয় ক্রিয়াধাতুতে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে, তাদের বলা হয় কৃৎ-প্রত্যয়। এজাতীয় শব্দের অন্য নাম 'কৃদন্ত শব্দ'। পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত। বাজ + না = বাজনা, রান্ধ + না = রান্ধনা > রান্না। দৃষ্টান্তগুলিতে 'পড়', 'বাজ' 'রান্ধ' ইত্যাদি বাংলা ক্রিয়াধাতু, আর 'অন্ত', 'না' ইত্যাদি কৃৎ-প্রত্যয়।

বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়: সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত (অন, অনীয়, অ, অৎ ইত্যাদি) অসংখ্য শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন— পানীয়, নয়ন, গ্রহণ, স্মরণ, কর্তব্য, প্রীত, শান্ত, বরণীয়, করণীয়, সাধন, লীন, দান, প্রদান, আসীন, জয়, মহৎ ইত্যাদি। এগুলি সবই তৎসম উপাদান।

বাংলা ভাষার নিজস্ব কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বা কৃদন্ত শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই শব্দগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার নিজস্বতা প্রতিফলিত। শব্দগঠনের কিছু নমুনা:

১। অসংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে 'অ' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে অনেক শব্দ। শব্দের অন্তে এই 'অ' অনুচ্চারিত। যেমন—খুঁজ + অ = খোঁজ। ধর + অ = ধর (ধর-পাকড়)। অনেক সময় শেষের 'অ' উচ্চারিত হয়ে থাকে — 'ও' বা 'উ' রূপে। যেমন—পড় (> পড়োপড়ো)। মর (> মরোমরো)। ডুব (> ডুবুডুবু)

২। '-আই' প্রত্যয় যোগে — বাছাই, ঝাড়াই, মাড়াই, চোলাই, সাফাই।

৩। '-অনা' যোগ করে গঠিত শব্দ — বাজনা, পাওনা, মাগনা ইত্যাদি।

৪। '-অন্ত' যোগ করে গঠিত শব্দ — পড়ন্ত, বাড়ন্ত, চলন্ত, ঝুলন্ত ইত্যাদি।

৫। '-অন' প্রত্যয় যোগে — ঝাড়ন, ফলন, বাঁচন, চলন, বলন, গড়ন, খাওন ইত্যাদি।

৬। '-আন' প্রত্যয় যোগে — চালান, উড়ান, চেঁচান ইত্যাদি।

৭। '-আনি', 'অনী', '-উনী' প্রত্যয় যোগে — ভাঙানি, শুনানি, নাচনী, ঢাকনী, বিনুনী, চালুনী, জ্বলুনী ইত্যাদি।

৮। '-তি', '-তা' প্রত্যয় যোগে — উঠ্‌তি, চলতি, পড়তি, ধর্‌তি, বহতা, ধর্‌তা, ফের্‌তা ইত্যাদি।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়: যে সকল প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্য শব্দ গঠন করে, তাদের বলা হয়

তদ্ধিত প্রত্যয়। এর অন্য নাম শব্দ-প্রত্যয়। এই প্রত্যয়-যোগে সৃষ্ট শব্দের নাম 'তদ্ধিতান্ত শব্দ'। বাংলা শব্দ-গঠনে কৃৎপ্রত্যয়ের তুলনায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রভাব বেশি, তদ্ধিতান্ত শব্দের সংখ্যাও বেশি। সংস্কৃত, প্রাকৃত থেকে যেমন বহু তদ্ধিত প্রত্যয় বাংলায় এসে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছে, তেমনি বিদেশি-আগন্তুক ও দেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ও বাংলার শব্দভাণ্ডারকে অকল্পনীয়ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বৈচিত্র্যের কিছু নমুনা:

সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ: ১। -অ (মানব, রাঘব, বৈষ্ণব) ২। -অক (ভক্ষক, শিক্ষক) ৩। -আয়ন (মানবায়ন) ৪।-আল (রসাল, ঘড়িয়াল) ৪। -ইক (বৈদিক, মৌখিক) ৫। -এয় (গাঙ্গেয়, কৌন্তেয়) ৬। -ক (ঘোষক, শূদ্রক) ৭। ইত (সীমিত, পরিমিত, তৃষিত) ৮। -তা (পবিত্রতা, মিত্রতা) ৯।-ই (দাশরথি, মারুতি) ১০। -ইম (আদিম, রক্তিম) ইত্যাদি।

বাংলা তদ্ধিতান্ত শব্দ

১। 'আ' প্রত্যয় যোগে — হাতা, বাঘা, রোগা, জলা।

২। -অট, -ট, টা, টিয়া, টে যোগে — ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে, দাপট, ঝাপটা, ন্যাওটা, ঘোলাটে ইত্যাদি।

৩। 'আই' প্রত্যয় যোগে — চোরাই, জগাই, কানাই ইত্যাদি।

৪। 'ই' যোগে — বাঙালি, বিলাতি, শয়তানি ইত্যাদি।

৫। '-আম', '-আমি', '-আমো' প্রত্যয় যোগে — বাঁদরামি, বাঁদরামো, ন্যাকামি, ছ্যাবলামি ইত্যাদি।

৬। 'আরি', 'উরি' — পূজারি, ভিখারি, পিয়ারি, ডুবুরি, ধুনুরি।

৭। 'আর' প্রত্যয় যোগে — ভাঁড়ার, দোহার ইত্যাদি।

৮। '-আলি', 'উলি' প্রত্যয় যোগে — বাড়িউলি, চৈতালি, পৌষালি।

৯। '-ওয়াল', '-ওয়ালা' প্রত্যয় যোগে — পাহারাওয়ালা, ঘড়িয়াল ইত্যাদি।

আগন্তুক বা বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়: বাংলায় বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রভাব খুবই বেশি। তদ্ধিতান্ত বিদেশি শব্দের সংখ্যাও বেশি। মধ্যযুগে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বৈদেশিক শাসনের সূচনা হয়। ফলে আরবি, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতি ভাষার ব্যাপক প্রভাব আমাদের বাংলায় পড়তে থাকে। এই সূত্রে অসংখ্য ফারসি তদ্ধিত প্রত্যয় বাংলায় গৃহীত হয়। কয়েকটি নমুনা:

১। '-খানা' — বৈঠকখানা, ছাপাখানা, মুদিখানা, ডাক্তারখানা ইত্যাদি।

২। '-আন', '-ওয়ান' — পালোয়ান, দারোয়ান,

৩। '-আনা', 'গান', '-আনি' — বাবুয়ানি, ঘরানা, হিন্দুয়ানি ইত্যাদি।

৪। '-খোর' — নেশাখোর, গুলিখোর ইত্যাদি।

৫। '-গিরি' — বাবুগিরি, দাদাগিরি ইত্যাদি।

৬। '-দানি' — পিকদানি, দোয়াতদানি।

৭। 'দার' — জমিদার, বাজনদার, পাওনাদার

৮। 'বাজ' — ধড়িবাজ, চালবাজ ইত্যাদি।

উপসর্গীয় প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন: নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপসর্গের অবদান অনেক। উত্তরাধিকারসূত্রে সংস্কৃতের উপসর্গগুলি বাংলা ভাষা নিজের ভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণে পেয়েছে। যেমন — প্র (প্রচার, প্রভাব), পরি (পরিষ্কার, পরিমিত), অপ (অপকার, অপবাদ), বি (বিভক্ত, বিশিষ্ট), নিঃ (নীরব, নিস্তেজ) ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গ ছাড়াও বাংলার নিজস্ব উপসর্গ নিতান্ত কম নেই। বিদেশি প্রত্যয়ের সংখ্যাও অনেক। যথা:

১। 'কু-' — কুকথা, কুডাক ইত্যাদি।

২। 'অ-', 'অনা-', 'আ' — অকাজ, আকাল, অনাসৃষ্টি, অকেজো, অবেলা ইত্যাদি।

৩। 'পাতি-' — পাতিলেবু, পাতিহাঁস

৪। 'ভর' — ভরসন্ধ্যে, ভরপেট

৫। 'হা-' — হাঘরে, হাভাতে

৬। 'স-' —সজোরে, সপাটে

৭। 'গর-' — গরহাজির, গরমিল

৮। 'নি-' — নিখরচা, নির্ভরসা

৯। 'বে' — বেচারা, বেনাম, বেঘোরে, বেচাল ইত্যাদি।

১০। 'ফি-' — ফিহপ্তা, ফিবছর

১১। 'আম' — আমদরবার, আমজনতা

১২। 'ফুল-' — ফুলবাবু, ফুলহাতা

১৩। 'হেড' — হেডস্যার, হেডমিস্ত্রি, হেডমৌলবী

১৪। 'হর' — হরবোলা, হরদম, হররোজ, হরেক

১৫। 'বদ' -— বদমেজাজ, বদরাগি ইত্যাদি।

১৬। 'না' — নাচার, নামঞ্জুর, নারাজ, নালায়েক ইত্যাদি।

১৭। 'দর-' — দর-ইজারাদার, দরপত্তনী, দরকচা ইত্যাদি।

খ) সমস্ত বা সমাসবদ্ধ শব্দ: দুই বা তার অধিক সংখ্যক পদের একপদীকরণের নাম সমাস। সমাস-যুক্ত পদকে এক কথায় বলে 'সমস্ত পদ' বা 'সমাসবদ্ধ পদ'।

বাংলা শব্দভাণ্ডারের মূল্যবান সম্পদ সমাসবদ্ধ পদগুলি। শব্দগঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের পরেই সমাসবদ্ধ শব্দের স্থান। এর রূপগত বৈচিত্র্যের সীমা নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাভাষায় সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদগুলির আগমন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। সংস্কৃত সমাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেও গঠন ও প্রয়োগের দিক দিয়ে বাংলা সমাস বহুক্ষেত্রে নিজের বিশেষত্ব ভালোভাবেই ধরে রেখেছে। সংস্কৃতে এক সময় বহু শব্দের শৃঙ্খল তৈরি করে অতি দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ রচনার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। বাংলায় সচরাচর দুটি বা কখনও কখনও তিনটি শব্দ নিয়ে সমাসবদ্ধ পদ রচনার প্রচলন দেখা যায়—মুখচন্দ্র, মন-মাঝি, জীবনতরী, মরণ-সাগর, গোপীজনবল্লভ, মদনমোহন ইত্যাদি।

বাংলা সমাসের সমস্যমান পদ (অর্থাৎ যে শব্দগুলি যুক্ত হয়ে সমাসবদ্ধ পদ তৈরি করে)-এর বৈচিত্র্য বেশি। শুধু তৎসম উপাদান নয় — তার বাইরেও তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দ একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাস সৃষ্টি করেছে। এমন 'গুরুচণ্ডালী' বিন্যাসের ফলে বাংলার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বাংলাভাষার প্রকাশ-ক্ষমতাও নিঃসন্দেহে অনেকগুণ বেড়েছে। প্রচলিত বিধি ভেঙে 'শবদাহ' বা 'মড়া-পোড়া' জাতীয় শব্দকে বাংলায় আমরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছি 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' রূপে। অনুরূপ ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে আগত উপাদানের দ্বারা তৈরি হয়েছে নতুন নতুন সমাসবদ্ধ পদ। যেমন: হাফহাতা, হেডমিস্ত্রি, ভোটকেন্দ্র, আইনসিদ্ধ, হেডমৌলবী, চাঁদবদন, শ্বশুরঘর ইত্যাদি।

সমাসের ভাগ-উপবিভাগের বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রেখে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সমাসকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। — ক) সংযোগমূলক সমাস (Copulatative compounds) খ) ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস (Determinative compounds) ও গ) বর্ণনামূলক সমাস (Descriptive compounds)। এদের অন্তর্গত বিভিন্ন সমাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শব্দগঠনের নমুনা নীচে দেওয়া হচ্ছে।

ক) সংযোগমূলক সমাস (Copulatative compounds): দ্বন্দ্বসমাস এই শ্রেণিভুক্ত। এই সমাসে উভয় পদের গুরুত্ব সমান থাকে। যথা: ধন-দৌলৎ, ছেলে-মেয়ে, মা-বাপ, রাজা-উজীর, মাঝিমাল্লা, মিষ্টিমধুর ইত্যাদি। এর কয়েকটি উপশ্রেণি:

১। **অলুক দ্বন্দ্ব:** মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে ইত্যাদি।

২। **সমার্থক দ্বন্দ্ব:** চিঠিপত্র, উকিল-ব্যারিস্টার, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি।

খ) ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস (Determinative compounds): এর অন্তর্গত সমাসগুলি হল — তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু প্রভৃতি। এদের শব্দগঠনের নমুনা দেওয়া যাচ্ছে:

তৎপুরুষ সমাস: ঘর-চাপা (কর্তৃবাচক), রথ-দেখা (কর্মবাচক), ঢেঁকি-ছাঁটা (করণবাচক), বিলাতফেরত (অপাদানবাচক), লিচু-বাগান (সম্বন্ধবাচক), গাছ-পাকা (অধিকরণবাচক), গায়ে-হলুদ (অলুক তৎপুরুষ), ছেলেধরা (উপপদ তৎপুরুষ), দিনভর (অব্যয়ীভাব) ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস: খাসমহল (সাধারণ কর্মধারয়), ফাঁসিকাঠ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), মিশকালো (উপমান কর্মধারয়), আঁখিপাখি (রূপক কর্মধারয়)

দ্বিগুসমাস: পাঁচ-হাত।

সমাহার দ্বিগুসমাস: শতাব্দী, পঞ্চবটী।

গ) বর্ণনামূলক সমাস (Descriptive compounds): বহুব্রীহি সমাস এই পর্যায়ে পড়ে। বহুব্রীহি সমাসের কয়েকটি ভাগ। — উট-কপালী (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি), লালপাগড়ি, নষ্টকীর্তি, ছিন্নশাখা (সমানাধিকরণ), হাতাহাতি (ব্যতিহার), মুখে-মধু (অলুক বহুব্রীহি)।

শব্দদ্বৈত বা শব্দজোড়: বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের এক অক্ষয় সম্পদ শব্দদ্বৈত বা শব্দজোড়। বাংলা ভাষার প্রকাশগত সৌন্দর্য ও ক্ষমতাকে এই জাতীয় শব্দ বহুমাত্রায় বৃদ্ধি করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণির শব্দজোড়ের ব্যবহারিক ও সাহিত্যিক গৌরব ব্যাখ্যা করে এক কালে দীর্ঘ প্রবন্ধও রচনা করেছেন। শব্দদ্বৈতে একটি শব্দের বদলে জোড়া শব্দ ব্যবহার করা হয়। জোড়া শব্দের গঠনে বৈচিত্র্য রয়েছে। জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির প্রকৃতি অনুযায়ী শব্দদ্বৈতের শ্রেণি নির্ধারিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণ নানাভাবে এদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যথা: পুনরুক্ত শব্দ, অনুকার শব্দ, অনুগামী শব্দ, সমার্থক শব্দ ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত:

১। পুনরুক্ত শব্দ: এর অন্য নাম দ্বিরুক্ত শব্দ। একই শব্দ পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে এদের বলা হয় দ্বিরুক্ত বা পুনরুক্ত শব্দ। এই শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে থাকে না। বাংলায় এই জাতীয় শব্দজোড়ের প্রাচুর্য দেখা যায়। ব্যাপকতা, প্রাচুর্য, বিস্তার ও বহুবচনের অর্থ বোঝাতে পুনরুক্তি জাতীয় শব্দদ্বৈতের ব্যবহার ঘটে।

যেমন—ঘরে ঘরে প্রেম বিলিয়েছেন তিনি। পথে পথে ঘুরে কী হবে? জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছি। চোখে চোখে রেখো। ছোটো ছোটো শিশু। কাছে কাছে থেকো। নিজে নিজে অঙ্ক করো। বড়ো বড়ো কথা। ভালোয় ভালোয় চলে যাই। বসে বসে কী হবে? আসতে আসতে তোমার কথা ভেবেছি। যাই যাই করো না।

২। অনুকার শব্দ: বাংলায় এজাতীয় শব্দের সংখ্যা অনেক। বিরক্তি, অবজ্ঞা প্রকাশ করতে এই ধরনের জোড়া শব্দ গঠন করা হয়। দ্বিতীয় শব্দটির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের প্রতিধ্বনির মতো সামান্য পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

যথা— **বই-টই** ফেলে দাও, **মুখ-টুখ হাত-টাত** ধুয়ে নে। **গান-টান** আমার ভালো লাগে না। **চাকর-বাকর** কোথায়? **ভাত-টাত** খেয়েছো? **জল-টল** খেয়ে নাও। **আধা-আধি** ভাগ।

৩। অনুগামী শব্দ: এতে প্রথম শব্দের ধ্বনি ও অর্থের সঙ্গে মিল রেখে দ্বিতীয় শব্দ তৈরি হয়। দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের নিকট সম্পর্কীয় হয়।

যেমন — গাছ-গাছড়া লাগিয়ে দাও। ছেলে-পিলে ক-জন? কাছে-পিঠে জন-মানব নেই। পথে-ঘাটে ভয় আছে। কাছাকাছি থেকো ইত্যাদি।

৪। সমার্থক শব্দ: দুটি শব্দ সম্পূর্ণ সমার্থক হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অংশের স্বাধীন নিজস্ব ব্যবহার থাকতে পারে। এর নমুনা; দলিল-দস্তাবেজ, মামলা-মোকদ্দমা, চিঠি-পত্র, মাপজোখ, লেখাপড়া, দাবিদাওয়া, রাজাবাদশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, টাকা-পয়সা নেই। টাকা-কড়ি কি আছে? ইত্যাদি।

শব্দদ্বৈত নানা অর্থ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ভাষার ভাব-প্রকাশের সামর্থ্য বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এরূপ শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগের বৈচিত্র্যের আরও কিছু নমুনা দেওয়া হল।

যথা—

ক) ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বোঝাতে: যেতে যেতে একলা পথে। খেতে খেতে এসো। ফিরে ফিরে চাই। মরতে মরতে বেঁচে গেছি।

খ) পারস্পরিক ভাব বা ঘটনা বোঝাতে: হাতাহাতি, কোলাকুলি, হাড্ডাহাড্ডি, ধরাধরি, মারামারি, গড়াগড়ি, চুলোচুলি ইত্যাদি।

গ) সাদৃশ্য, মৃদুতা, স্বল্পতা বা ঈষৎ-ভাব বোঝাতে: জ্বর-জ্বর ভাব, শীত-শীত ভাব, হাসি হাসি মুখ, মর-মর অবস্থা, যাই-যাই করা, গরম-গরম কথা, লাল-লাল চোখ ইত্যাদি। অনেক সময় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে শব্দদ্বৈত তৈরি হয়।

যেমন—ঝন-ঝন, টন-টন, কন-কন, বন্-বন্ খস-খস, টস-টস ফোঁশ-ফোঁশ, ঝিন-ঝিন, গুন-গুন, মিউ-মিউ, ঘেউ-ঘেউ, গিজ-গিজ।

১১.৬ সারসংক্ষেপ

এই এককে ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনার পরবর্তী ধাপে বাংলা শব্দগঠন সম্পর্কে আলোচনা করছি। বাংলা শব্দ গঠন, পদ গঠন, প্রত্যয়, অনুসর্গের ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তুলে ধারণা চেষ্টা করেছি। বিস্তারিত উদাহরণের সাহায্যে বাংলা শব্দ গঠনে প্রত্যয়ের ব্যবহার, সংস্কৃত প্রত্যয় থেকে দেশি-বিদেশি প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন। এছাড়াও শব্দ নির্মাণে অনুসর্গ, উপসর্গের ব্যবহার, সমাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

একক ১২ ❑ বাংলা পদগঠন প্রক্রিয়া

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ কারক ও বিভক্তি

১২.৩ বাংলা পদগঠন প্রক্রিয়া

১২.৪ সারসংক্ষেপ

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবে—

- পদের গঠন, পদের সংজ্ঞা, পদের শ্রেণিবিভাজন
- বাংলা কারক, বিভক্তি, অনুসর্গ
- বাংলা কারকের শ্রেণিবিভাগ
- বাংলা লিঙ্গ, বচন

১২.২ কারক ও বিভক্তি

বাংলা পদগঠন প্রক্রিয়ায় কারক-বিভক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর কয়েকটি শ্রেণি। যথা — কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক। সম্প্রদান কারক: কোনো কিছু নিঃস্বার্থ ভাবে দান করা অর্থে সম্প্রদান কারক হয়। এই কারকের পদ গঠনে ‘কে’, ‘এ’, ‘তে’, ‘র’ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা— দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্রদান পরমধর্ম। দেবতার নৈবেদ্য এখনো সাজানো হয় নি। “আচার্যে দক্ষিণা দিন নিষাদকোঙর।” কারক-ভেদে পদগঠনের বৈচিত্র্যের নমুনা:

কর্তৃকারক : বাংলায় কর্তৃকারকে সচরাচর বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, অর্থাৎ শূন্য বিভক্তি হয়। অনেকে একে বলেন ‘অ’ বিভক্তি। যথা— মাঝি গান গায়। পাখি গায়। বাঘ ডাকে। চর্যায় পাই — চঞ্চল চীএ পইঠা কাল। লুই ভণই। তবে ‘-এ’, ‘য়’, ‘-য়ে’, ‘-তে’ প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগও যথেষ্ট। — বাঘে মানুষ খেয়েছে। পাগলে কী না বলে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। মায়ে ডাকে। গোরুতে লাঙ্গল টানে। ঘোড়ায় গাড়ি টানে। চণ্ডীদাসে কয়। বঙ্গালী ও কামরূপী উপভাষায় শোনা যায় —বাবায় কয়। দুগ্গা মায় এবার পাল্কিতে আইবো। বাপ-বেটায় লড়াই কত্তে যায়।

কর্মকারক: বাংলায় এই কারকে শূন্য বিভক্তির ব্যবহার প্রচুর। বাঘে হরিণ খায়। পাখিতে ধান খায়। প্রাচীন বাংলায় অর্থাৎ চর্যায় পাই—গুরু পুচ্ছিত্র জাণ। তাছাড়া, 'কে', 'য়', বিভক্তিযোগে কর্মকারকের পদগঠন পরিচিত ঘটনা।—আমি তোমাকে ডেকেছি। রাম বাবাকে সান্ত্বনা দিলেন। পাওনাদার তোমায় ছাড়বে না। আমায় দে মা তবিলদারী। কাব্যভাষায় ও কোনো কোনো উপভাষায় 'রে' বিভক্তির ব্যবহার রয়েছে। তারে বলে দিও। তোমারে কই।

করণ কারক: করণ কারকের পাঠনে 'দ্বারা', 'দিয়া', 'দিয়ে', 'কর্তৃক' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার এক পরিচিত ঘটনা। তবে '-এ', 'তে' বিভক্তির ব্যবহারও যথেষ্ট। তোমার দ্বারা কোনো কাজ হবার নয়। বিশুকে দিয়ে কাজটা করাবো। তোমা কর্তৃক কোনো কাজই সিদ্ধ হবার নয়। পেন্সিলে লেখা হয় না। বঁটিতে কাটা যাবে না। চর্যায় ছিল '-এ'। অপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী।

অপাদান কারক: এই কারকে অনুসর্গের ব্যবহারই বাংলায় বেশি। সাধারণত 'থেকে', 'হতে', 'হইতে' ইত্যাদি অনুসর্গ দ্বারা পদ গঠন হয়ে থাকে। যথা — মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আজি হতে শতবর্ষ পরে। বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি।

অপাদান কারকে কখনও কখনও 'এ' বিভক্তির ব্যবহারও দেখা যায়। এই মেঘে বৃষ্টি হওয়ার নয়।

অধিকারণ কারক: বাংলায় অধিকরণের পদ গঠনে সাধারণত 'এ', 'তে', 'এতে', 'য়' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। যথা — পুকুরে মাছ নেই। নদীতে ঢেউ রয়েছে। বুকে ব্যথা রয়েছে। পায়েতে কীসের আঘাত? দইয়ে বিচ্ছিরি গন্ধ। চর্যায় ছিল 'হি', 'তে' -এ। হিঅহি ন পইসই। সাঙ্কমত চড়িলে। গীবত গুঞ্জরী মালী। চঞ্চল চীএ পইঠা কাল। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। একালেও বঙ্গালী ও কামরূপী উপভাষায় শোনা যায় — বাবা বাড়িত নাই।

সম্বন্ধ পদ: বাংলায় 'র', '-এর' প্রভৃতি বিভক্তি যোগে সম্বন্ধ পদের গঠন হয়। নিজের কথা, তাহার সমস্যা, গোলাপের গন্ধ, মিথ্যার ঝুলি ইত্যাদি। চর্যায় পাই—ডোম্বীএর সঙ্গে। রুখের তেন্তলী।

১২.৩ বাংলা পদগঠন প্রক্রিয়া

পদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এবার বাংলা পদের নানা বিভাগ ও গঠনগত বৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ্য পদ:

যে-কোনো বস্তু, বিষয়, স্থান, দেশ, অবস্থা, জাতি, দোষ, গুণ বা ব্যক্তির নামকে বিশেষ্য বলা হয়। অর্থাৎ বিশেষ্যপদকে আমরা নামপদ বলতে পারি। বিশেষ্যের অনেক শ্রেণি। যথা:

১। ব্যক্তিবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদে ব্যক্তি, বিষয়, বস্তু, স্থান প্রভৃতির নাম সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়, তাকে বলা হয় ব্যক্তিবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। এরূপ পদের আবার দুটি ভাগ; প্রানীবাচক ও অপ্রানীবাচক। রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি প্রানীবাচক। কলকাতা, বেনারস প্রভৃতি অপ্রানীবাচক।

২। বস্তুবাচক বিশেষ্য: এর দ্বারা বস্তুকে নির্দেশ করা হয়। যেমন — মাটি, ফুল, গাছ, বই, পাথর, টেবিল, ফুল ইত্যাদি।

৩। জাতিবাচক বিশেষ্য: এরূপ বিশেষ্য দ্বারা জাতি তথা শ্রেণি নির্দেশিত হয়। যথা — পাখি, পশু, মানুষ, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, মানুষ ইত্যাদি।

৪। সমষ্টিবাচক বিশেষ্য: কিছু বিশেষ্য পদ রয়েছে যেগুলি সমষ্টি নির্দেশ করে। যেমন — সংঘ, গোষ্ঠী, দল। সংঘের নিয়ম মেনে চলতেই হবে। দল কী বলে?

৫। গুণবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্যের দ্বারা দোষ, গুণ, স্বভাব, প্রকৃতি বোঝায়, তাদের বলা হয় গুণবাচক বিশেষ্য। যথা—দয়া, মমতা, স্নেহ, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রীতি, মোহ ইত্যাদি। দয়া পরম ধর্ম। স্নেহ অতি বিষম বস্তু। মোহ মানুষকে বিপথে চালিত করে।

৬। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য: এই বিশেষ্যের দ্বারা ক্রিয়া বা কাজ বোঝায়। যথা — আসা, খাওয়া, যাওয়া, দর্শন। মন্দিরে এখন দর্শন বন্ধ আছে। বিয়েবাড়ির খাওয়া কেমন হল? খেলা শেষ। হাঁটা বন্ধ করো। ওখানে গমন নিষিদ্ধ। এখন তোমার আসা কমে গেছে।

সর্বনাম:

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বনামের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে: " বাক্য-মধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত, অথবা অজ্ঞাত, কোনও সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যে-সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেগুলিকে সর্বনাম বলে।" সহজ করে বলা যায়, বাক্যে বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দের ব্যবহার করা হয়, তাকেই বলে সর্বনাম। 'সর্ব' অর্থাৎ সবার নামের স্থলে ব্যবহৃত হয় বলে এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। সর্বনাম-পদ ব্যবহারের দ্বারা আমরা একই পদের পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমি দূর করে থাকি। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, লেখায় বা কথা বলার সময় কোনো একটি বিশেষ্যের বারবার ব্যবহার আমরা পছন্দ করি না, এতে ভাষার গঠন ও প্রকাশগত চারুত্ব থাকে না। ধরা যাক, নীচের বাক্যগুলি:

"রাম এদিকে আসছে। রাম আমাকে একটি বই দেবে। রাম বইটি আমার জন্য অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করেছে। রামকে এজন্য ধন্যবাদ দিতেই হবে।" সন্দেহ নেই 'রাম' শব্দের পুনরাবৃত্তি ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। রাম শব্দের পৌনঃপুনিকতা বর্জন করে তাই আমরা বলে থাকি "রাম এদিকে আসছে, সে আমাকে একটি বই দেবে। সে অনেক কষ্ট করে আমার জন্য এটি সংগ্রহ করেছে। তাকে এজন্য ধন্যবাদ

দিতেই হবে।" 'রামে'র পরিবর্ত হিসাবে 'সে', 'বইটি'র পরিবর্ত হিসাবে 'এটি' সর্বনামের ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যায়, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গ অনুযায়ী সর্বনামের রূপভেদ হয়ে থাকে। বাংলায় তা নয়। বাংলায় সর্বনাম পদের শ্রেণিবৈচিত্র্য নিম্নরূপ:

১। পুরুষবাচক বা ব্যক্তিবাচক (personalpronoun): বাংলায় পুরুষ (Person) তিন প্রকার। পুরুষ অনুযায়ী সর্বনামেরও তিনটি উপশ্রেণি রয়েছে। পদ-নির্মাণ বিধি নিম্নরূপ:

উত্তম পুরুষের সর্বনাম (First Person): উত্তমপুরুষের সর্বনামগুলি হল:

১। একবচনে কারকভেদে: আমি, মুই, আমার, আমাকে, আমা-হতে, আমা-থেকে, আমাতে ইত্যাদি। উপভাষায়: মুই। কাব্যের ভাষায় পাওয়া যায়: মম, মোর।

২। বহুবচনে কারকভেদে: আমরা, আমাদের, আমাদেরকে, আমাদের-হতে, আমাদের মধ্যে, আমাদের মাঝে, আমাদিগতে ইত্যাদি। কাব্যের ভাষায়: মোরা, মোদের।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বাংলায় উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'আমি' সংস্কৃত থেকে আগত তদ্ভব শব্দ। তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের 'ময়া' (আমার দ্বারা) ও বহুবচনের 'স্মাভিঃ' (আমাদের দ্বারা) থেকে বাংলায় উত্তম পুরুষের সর্বনামের দুটি রূপ 'মুই' ও 'আমি' এসেছে।

সং. ময়া > প্রা. মএ > প্রা. বাং. মই > ম. বাং. মুঞি > আধুনিক বাংলায় মুই। একালের শিষ্ট বাংলায় এর ব্যবহার নেই, উপভাষায় আছে।

'অস্মদ' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনের 'অস্মাভিঃ' > অপভ্রংশে 'অম্‌মহি' > প্রাচীন বাংলায় 'আম্‌হে', 'অম্ভে' > মধ্যবাংলায় 'আম্মি' > আধুনিক বাংলায় 'আমি'।

প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় ছিল 'হাঁউ', 'হু'। "তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী"। একালে উত্তমপুরুষের এই সর্বনাম পদগুলি লুপ্ত।

উল্লেখ করা যায়, তির্যক কারকের বাংলার প্রচলিত প্রাতিপদিকগুলি হলো — 'আমা', 'মো-', 'ম-' ইত্যাদি। আমাকে ডেকো। আমাদেরকে নিয়ে যেও। 'মোরে ডাকি লয়ে যাও'।

মধ্যম পুরুষের সর্বনাম (second Person): এর মূলত তিনটি রূপভেদ রয়েছে:

ক) সাধারনার্থে একবচন: 'তুমি, তোমার, তোমাকে, তোমা থেকে, তোমা হতে'। কাব্যের ভাষায় পাওয়া যায়:

'তব, তুহু'।

সাধারনার্থে বহুবচনের রূপ: 'তোমরা, তোমাদের, তোমাদেরকে, তোমাদিগতে'।

'তুমি' 'সংস্কৃত 'যুস্মদ্' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

খ) তুচ্ছার্থে একবচন পাই: 'তুই, তোর, তোকে'।

তুচ্ছার্থে বহুবচনের পদ: 'তোরা, তোদের, তোদেরকে'।

এই সর্বনামগুলির ব্যবহার হয় তুচ্ছার্থে, অনাদরে বা নিকট-সম্বন্ধ বোঝাতে। তুই এখানে আয়। তোরা কেমন আছিস?

গ) সম্মানার্থে একবচনের পদ: 'আপনি, আপনাকে, আপনারা'।

সম্মানার্থে বহুবচনের পদ: আপনারা, আপনাদের, আপনাদেরকে। সম্মানীয় ব্যক্তির বেলায় ও সম্ভ্রম প্রকাশের ক্ষেত্রে 'আপনি', 'আপনার', 'আপনারা', 'আপনাদের' ইত্যাদির ব্যবহার একালের বাংলার সাধারণ নিয়ম। মধ্যম পুরুষের সর্বনাম রূপে এই পদের ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় নেই। মধ্যযুগের শেষদিকে এর প্রচলন শুরু হয়।

'তুই' এর উৎস 'ত্বম' প্রাকৃতে 'তং, তুবং' > প্রা. বা. 'তু, তো' > ম. বা. 'তোঁ, তুঞি' > আধুনিক বাং. 'তুই'।

প্রথম পুরুষ সর্বনাম (Third Person): যেখানে আলোচনা চলছে বা কথোপকথন হচ্ছে সেখানে অনুপস্থিত থেকেও কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু যদি সেই কথাবার্তায় উল্লিখিত হয়, তবে তাকে বলা হয় প্রথম পুরুষ। প্রথম পুরুষ বাচক সর্বনামগুলি হল: 'সে, ও, তা, তিনি, উহা, তাকে, ওকে, ওর, ওঁর' ইত্যাদি (একবচনে)। তারা, ওরা, তাঁরা, তাঁহারা, ওঁরা, তাদেরকে, তাঁদেরকে, ওদের, উহারা, উহাদিগের' ইত্যাদি (বহুবচনে)। বচন ভেদে সর্বনামের পদ পরিবর্তিত হলেও এতে লিঙ্গভেদের কোনো প্রভাব নেই।

প্রথম পুরুষের সর্বনামের অন্য বিশেষ রূপভেদ লক্ষ করা যায় — সাধারণ, তুচ্ছার্থক ও সম্ভ্রমাত্মক। সাধারণ রূপ হল — 'সে, ও' ইত্যাদি। তুচ্ছার্থক বা অপ্রানীবাচক রূপ — ওটা, ওগুলো, তা, সেগুলো' ইত্যাদি। আর রয়েছে সর্বনামের সম্ভ্রমাত্মক রূপ — 'তিনি, উনি, ওঁকে, তাঁকে, তাঁর, তাঁহার তাঁহারা' ইত্যাদি।

ইংরেজির সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় যে, ইংরেজিতে এজাতীয় সম্ভ্রমাত্মক সর্বনাম নেই। সেক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ (Third Person)-এ শুধুই 'He, They, His, Him, She, Their' ইত্যাদি।

২। নির্দেশক সর্বনাম (demonstrative pronouns): এই সর্বনাম দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করা হয়। এর নানা ভাগ। যেমন—

সাধারণ নির্দেশক: সে, তিনি, তা।

নিকট নির্দেশক বা প্রত্যক্ষ নির্দেশক : এ, এই, এরা, ইনি, এঁরা, এটা।

দূর নির্দেশক: ও, ওই, উনি, ওরা, ওগুলি, ওঁরা ইত্যাদি।

সাপেক্ষ তথা পারস্পরিক সম্বন্ধ-নির্দেশক: যে-সে, যত-তত, যতক্ষণ-ততক্ষণ, যেমন-তেমন, যখন-তখন। যত চাইবে তত পাবে। যেমন কর্ম তেমন ফল।

প্রশ্নবাচক সর্বনাম: কে, কাকে, কারা ইত্যাদি। কাকে চান? কারা এসেছে?

অনির্দেশক সর্বনাম: কেউ, কিছু, কোনো ইত্যাদি। কেউ এসেছে। কোনো এক দিন।

আত্মবাচক সর্বনাম: নিজে, স্বয়ং ইত্যাদি। নিজে এসে দেখুন। আপনি স্বয়ং একবার যান।

ক্রিয়াপদ

বাক্যে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব বেশি। সাধারণত বাক্যে দুটি অংশ থাকে — উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate)। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ক্রিয়াপদের সংজ্ঞায় বলেছেন: "বিধেয়-দ্বারা যখন ইহা জানানো হয় যে, বাক্যের উদ্দেশ্য কোনও বিশেষ অবস্থায় রহিয়াছে, বা কোনও কার্য করিতেছে, করিয়াছে বা করিবে, তখন সেই বিধেয়কে ক্রিয়াপদ বলে।"

যেমন: সুশীল খায়। রামচন্দ্র বনে যাবেন। দশরথ রাজা ছিলেন। এই বাক্যগুলিতে উদ্দেশ্যাঙ্গ—সুশীল, রামচন্দ্র ও দশরথ। আর বিধেয় ক্রিয়াপদ হলো — খায়, যাবেন, ছিলেন।

ক্রিয়াপদ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। একে বিশ্লেষণ করে যে অবিভাজ্য মৌলিক অংশ পাওয়া যায়, যার দ্বারা ক্রিয়াপদের প্রকৃত স্বরূপ ও ভাব প্রকাশ পায়, তার নাম ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় — 'পড়ে, পড়িল, পড়েছে, পড়িতে, পড়িয়া, পড়িবে' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের মৌলিক অবিভাজ্য অংশটি হল — 'পড়' ধাতু। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়, বিভক্তি যোগ করে, এর বিকার ঘটিয়ে বা পূর্তি ঘটিয়ে ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করা হয়। এই ক্রিয়াপদগুলিই বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করে। উল্লেখ করা যায়, ধাতু কখনও বাক্যে ব্যবহার হয় না। তবে আধুনিক বাংলায় অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে তুচ্ছার্থে, অনাদরে বা নিকট-সম্বন্ধে ক্রিয়ার যে বিভক্তিহীন রূপটি আমরা ব্যবহার করি তা আসলে ক্রিয়ার ধাতু। যেমন — তুই খা। বইটি পড়। আমার সঙ্গে চল্। দাম দে। কী চাই বল্।

সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিশাল সম্ভার রয়েছে। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ প্রায় দু'হাজার ধাতুর তালিকাও তৈরি করেছেন। অবশ্য কালে কালে বহু ধাতু ও ক্রিয়াপদের বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন সাকুল্যে প্রায় সাতশ' ধাতুর দেখা মেলে সংস্কৃতে। বাংলায় ধাতু ও ক্রিয়াপদের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। অবশ্য বহু পুরোনো ক্রিয়াপদের ব্যবহার লোপ পাচ্ছে।

উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার করে বাংলা ধাতুগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা —

ক) সিদ্ধ ধাতু (Primary Roots): এই ধাতুগুলি স্বয়ংসিদ্ধ। ভাষায় এগুলির ভাঙা বা বিশ্লেষ করা সম্ভব হয় না। বাংলা সিদ্ধ ধাতুগুলিতে উৎসগত ও প্রকৃতিগত নানা বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যেমন — সংস্কৃত

থেকে প্রাপ্ত তৎসম জাতীয় সিদ্ধ ধাতু, বিশুদ্ধ বাংলা ধাতু, প্রাকৃতজ ধাতু, তদ্ভব ধাতু, অর্ধ-তৎসম ধাতু, অজ্ঞাতমূল দেশি ধাতু, বিদেশি ধাতু প্রভৃতি। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন: 'আছ্, কর্, কাঁদ্, খা, ছাড়্, মাখ্, জি, জাগ্, লহ্, খোল্, বাঁচ্, পুছ্, ধা, টান্, কাঁপ্, নড়্, ফেল্, বাছ্, পুঁত্, ভাস্, খস্, ঘির্, গর্জ্, চুম্ব্, বর্জ্, বর্ত্, ভৎস্, জম্, কম্, দাগ্, কুদ্' ইত্যাদি।

খ) সাধিত ধাতু (Secondary Roots): এই ধাতুগুলি বিশ্লেষ করলে এর মধ্যে অন্য একটি ধাতু বা নাম-শব্দ ও প্রত্যয় পাওয়া যায়। যথা — করা (কর্ + আ প্রত্যয়), হাতা (হাত + আ প্রত্যয়) ইত্যাদি। সাধিত ধাতুর আবার কয়েকটি শ্রেণি বর্তমান। যথা — ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু, নাম-ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু ইত্যাদি।

গ) সংযোগ মূলক ধাতু (Compounded Roots): 'কর্, হ্, দে, পা' প্রভৃতি কিছু বিশেষ ধাতুর সঙ্গে বিশেষ্য, বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ যোগ করে বাংলায় সংযোগমূলক ধাতু বা ক্রিয়া তৈরি হয়। বাংলায় এজাতীয় ক্রিয়ার প্রয়োগ ও জনপ্রিয়তা খুবই বেশি। যেমন ইংরেজিতে 'Ask' ও হিন্দিতে 'পুছা', কিন্তু বাংলায় আমরা বলে থাকি — 'জিজ্ঞাসা করা'। অনুরূপ, ইংরেজিতে পাই Gain, Leave, hurt, start, kill ইত্যাদি এক-শব্দবিশিষ্ট ক্রিয়াপদ। অথচ বাংলায় ব্যবহার করি—লাভ করা, ত্যাগ করা, আঘাত করা, শুরু করা, হত্যা করা ইত্যাদি। সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদ ব্যবহারে এই জাতীয় প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 'শোনা, খাওয়া, পড়া, শেখা, ছোঁয়া, জপা, দেখা' ইত্যাদির বদলে ব্যবহার করা হয় 'শ্রবণ করা, ভোজন করা, পাঠ করা, শিক্ষা করা, স্পর্শ করা, জপ করা, দর্শন করা' ইত্যাদি। অনেকের মতে সরল সিদ্ধ বাংলার নিজস্ব ধাতুর ব্যবহার বর্জন করে, অনাবশ্যক বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ এরূপ সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের প্রবণতা ভাষার দুর্বলতার লক্ষণ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ সাধু-ব্যবহারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। বাংলায় আরো কয়েক প্রকার ধাতু রয়েছে। যেমন:

ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু: যখন কর্তা নিজে কাজ করে না, অপরকে দিয়ে কাজ করায় তখন সেই ধাতুকে বলা হয় ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু। 'করাব, দেখিয়েছি, খাওয়াচ্ছি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ এজাতীয় ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে।

নাম ধাতু: নামপদ বা বিশেষ্য পদের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত করে ক্রিয়াপদ তৈরি করা হলে তাকে বলা হয় নামধাতু। যেমন—জুতা > জুতানো। চোরটাকে খুব করে জুতিয়েছে। বেত > বেতানো। মাস্টারমশাই ছাত্রদের বেতিয়ে চলেছেন। হাত > হাতানো। কত টাকা হাতিয়েছিস?

ধ্বন্যাত্মক ধাতু: ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে -আ প্রত্যয় যুক্ত করে পাওয়া যায় ধ্বন্যাত্মক ধাতু। টগ্‌বগ + আ > টগ্‌বগা। ভন্‌ভন + আ > ভন্‌ভনা। হন্‌হন + আ > হন্‌হনা। ঘোড়া চলেছে টগ্‌বগিয়ে। মাছি ভন্‌ভনিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। হন্‌হনিয়ে চললে কোথা?

ক্রিয়াপদের কয়েকটি শ্রেণি: বাংলায় বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াপদের পরিচয় নীচে দেওয়া হল:

যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verbs) পদ: উল্লেখ করতে হয় যে, সংযোগমূলক ক্রিয়াপদের প্রথম অংশটি বিশেষ্য হয়। এজাতীয় ক্রিয়াপদ ছাড়াও বাংলায় রয়েছে প্রচুর যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verbs) পদ। দুটি ভিন্ন ধাতু মিলিত হয়ে এই ক্রিয়াপদ তৈরি করে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ইতে, ইয়া, ইয়ে প্রভৃতি যোগ করে যেমন: খেয়ে ফেলে দিয়ে দাও। মেরে ফেলো। বসতে দাও। যেতে পারো। লিখিতে থাকো। চাহিয়া দেখো। খুলিয়া বলো। হাসতে থাকো।

সমাপিকা ক্রিয়া: বাক্যের যে-ক্রিয়া বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে ও বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করে, তাকে বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া। ওরা গান গাইছে। সে আজ আসবে। আমি বাড়ি যাই। এই নমুনাগুলিতে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বক্তব্যকে ক্রিয়াপদ দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

অসমাপিকা ক্রিয়া: যখন কোনও ক্রিয়াপদ বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে না বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে না এবং যেখানে বাক্যের শেষ হয় সেখানে অন্য ক্রিয়াপদের অপেক্ষা থাকে, তখন সেই ক্রিয়াপদকে বলে অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন — আমি ভাত খেয়ে (যাব)। ছেলেরা হাসতে হাসতে (আসছে)। তুমি ডাকলে (আমি আসবো)।

অকর্মক ক্রিয়া: এরূপ ক্রিয়া একান্তই কর্তৃনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্তাকে অবলম্বন করে ঘটে ও সম্পূর্ণ হতে অন্য কোনো বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। যেমন — আমি আছি। সুমনা আসবে। সে গিয়েছিল।

সকর্মক ক্রিয়া: যেখানে ক্রিয়াপদের দ্বারা বর্ণিত ব্যাপার উদ্দেশ্য থেকে প্রসৃত হয়ে অন্য বস্তুকে অবলম্বন করে তবে সম্পূর্ণ হয়, সেখানে তাকে বলা হয় সকর্মক ক্রিয়া। যেমন — আমি ইতিহাস পড়ি। আমি অঙ্ক করি। মা ভাত রাঁধছেন। সে আমাকে বইটি দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যকে চিঠি লিখেছিলেন।

সকর্মক ক্রিয়া সম্বন্ধে 'কী', 'কাকে' ইত্যাদি সর্বনাম দিয়ে প্রশ্ন করা যায় এবং উত্তরও পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অকর্মক ক্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন করার উপায় নেই।

বিশেষণ

যে-পদ দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রভৃতি নির্দেশ করা হয় তার নাম বিশেষণ। সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি অনুযায়ী বিশেষণের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি নির্ধারিত হয়। প্রাচীন যুগের বাংলায় এই রীতির প্রভাব ছিল, কিন্তু আধুনিক কালে নেই বললেই চলে। বিশেষণ পদের গঠন-বৈচিত্র্যের কিছু দৃষ্টান্ত:

১। নাম বিশেষণ: দুরন্ত ছেলে, ভালো মানুষ, সবুজ ঘাস, লাল মাটি, ক্লান্ত প্রাণ, ছুটন্ত বাস, উন্নত দেশ, বোম্বে লঙ্কা, হাজার বছর, জাপানি ফুল ইত্যাদি।

২। সংখ্যাবাচক বা পূরণবাচক বিশেষণ: হাজার টাকা, বাইশে শ্রাবণ, একুশে ফেব্রুয়ারি, পয়লা আশ্বিন, দোসরা মে ইতাদি।

৩। **ক্রিয়াবিশেষণ:** জোরে ছোটো। ধীরে ধীরে এসো। তাড়াতাড়ি করো।

৪। **বিশেষণের বিশেষণ:** খুব সুন্দর। ভীষণ তেতো।

৫। **সম্বন্ধ বিশেষণ:** দেশের কথা। সোনার আংটি। আমার কথা।

৬। **অব্যয়জাত বিশেষণ:** বিনিসুতোর মালা, উপরি পাওনা। হঠাৎ-রাজা।

৭। **বহুপদী বিশেষণ:** একাধিক পদে গঠিত বিশেষণের ব্যবহার বাংলায় সহজলভ্য। যেমন তাড়া-খাওয়া বাঘটি ঝোপে লুকিয়ে আছে। সাদা জামা নীল প্যান্ট পরা লোকটাকে ডাকো। পেছনে-ফেলে আসা জীবন।

অব্যয়

নামের মধ্যেই পদের পরিচয় নিহিত। অব্যয় অর্থাৎ যে পদের ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই, রূপান্তর নেই। সব বিভক্তিতেই অব্যয়ের সমান রূপ। এর সংজ্ঞায় বলা হয় — "যে সকল শব্দে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না বা যাদের কোন পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় না, তাকেই বলা হয় অব্যয় পদ"।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অব্যয়কে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—১। সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক (Conjunctions) ও ২। মনোভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক (Interjections)। বাংলা অব্যয়ের গঠন-বৈচিত্র্য দেখানো হল।

ক) সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক (Conjunctions): সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয় — ও, আর, বা, কিংবা ইত্যাদি। সে আর আমি। রাম বা রহিম। পুরুষ কিংবা নারী।

যেমন—প্রতিষেধক অব্যয় — তো, নয়তো, তথাপি, আবার, তবু, কিন্তু, বরঞ্চ, এদিকে ইত্যাদি। আমি তো ভেবেছি। এদিকে ওরা বেড়াতে যাচ্ছে। এও ভাবার কথা বটে।

কারণাত্মক — যেহেতু, যে কারণে, কারণ। যেমন— যেহেতু ওরা আসেনি, তোমাদের থাকতে বলছি।

অবস্থাত্মক — যদি, যদি না হয়, নইলে। যেমন—যদি আমি যাই, বলেই যাব।

অনুধাবনাত্মক — এই জন্য, এদিকে, তাইতে, সুতরাং। যেমন—এদিকে সবাই চিন্তিত। ওরা এসেছে সুতরাং আর দেরি নয়।

ব্যবস্থাত্মক — তাহলে, তবে, তাই। যেমন—তাহলে আমি যাই। তবে তাই হোক।

সমাপ্তিসূচক—যা'তে। যেমন—তুমি এমনভাবে কাজটা করো, যা'তে কাজটা শেষ হয়।

বাক্যালংকাররূপে, পাদপূরণে — বটে, তো। যেমন—তুমি যাবে তো? তুমি আসবে না, বটে?

প্রশ্নবাচক — কি? অ্যাঁ? হ্যাঁ? যেমন—এ কেমন কথা বলছো, অ্যাঁ? তুমি যাবে না, না?

খ) মনোভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক (Interjections):

সম্মতিজ্ঞাপক — হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, আচ্ছা, তা বটে। যেমন—হাঁ আমি যাবই। তুমি আসবে। আচ্ছা।

অসম্মতিজ্ঞাপক — না, না তো, আদৌ না, নয়। যেমন—আমরা খাব না। এটা মোটেই শেষ কথা নয়।

অনুমোদনজ্ঞাপক — বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, মরি মরি, হায় হায়, বেড়ে। যেমন—বাঃ বাঃ কী সুন্দর গলা। ওহে সুন্দর মরি মরি। হায় কী যে হল। বেড়ে বলেছো গুরু।

ঘৃণা বা বিরক্তিব্যঞ্জক — ছি, ছিঃ, কি আপদ, থুঃ, রাম রাম। যেমন—ছি, এমন কথা বলতে নেই। এখন শিশুটাকে কার কাছে রাখি, কি আপদ। রাম রাম, কী ঘেন্না।

মনঃকষ্টবাচক — ওঃ, আঃ, উঃ, মাগো, বাবাগো। যেমন—আঃ কী করো। ওঃ কী কষ্ট। মাগো বাবাগো মরে গেলুম গো।

বিস্ময়বোধক — ওমা, ও বাবা, বাব্বা, তাই তো, অ্যা। যেমন—ও মা কী আশ্চর্য তোমরা কখন এলে? ও বাবা এ তো অনেক টাকা। বাব্বা এতো লোক। তাই তো, আমার ভুল ভেঙে গেল।

আহ্বানজ্ঞাপক — হেদে, ওগো, ওলো। যেমন—হেদে গো পদ্মারাণী। হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। ওলো তোরা দেখে যা। ওগো মা করুণাময়ী।

লিঙ্গ

যথা—লিঙ্গ তিন প্রকার; পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। ইংরেজিতে এর অতিরিক্ত একটি লিঙ্গ রয়েছে—উভয়লিঙ্গ। অনেকে ইংরেজির অনুকরণে বাংলায়ও উভয়লিঙ্গকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। বিভিন্ন ভাষায় লিঙ্গবিধিতে নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান। বাংলা ভাষায় লিঙ্গ নির্ভর করে অর্থের ওপর। ড. রামেশ্বর শ'-এর ভাষায় বলা যায়: "বাংলায় লিঙ্গ অর্থনির্ভর, অর্থাৎ শব্দের দ্বারা পুরুষ-জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী-জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে স্ত্রীলিঙ্গ, আর অপ্রাণীবাচক বস্তুকে বোঝালে ক্লীবলিঙ্গ হয়।" বাংলা লিঙ্গবিধি নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তৎসম, তদ্ভব, দেশি শব্দের লিঙ্গান্তর বিধির মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক:

১। সংস্কৃতজাত তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে '-আনী', 'ঈ', 'ইনী '-আ' ইত্যাদি যোগ করে লিঙ্গান্তর— রুদ্র > রুদ্রাণী, ভব > ভবানী, তরুণ > তরুণী, কুমার > কুমারী, মায়াবী > মায়াবিনী, মালী > মালিনী, প্রথম > প্রথমা, বিপুল > বিপুলা। বিশেষ্য পদের সঙ্গে প্রত্যয়-ভেদে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-বৃদ্ধ (পুং)-বৃদ্ধা (স্ত্রী)। অনুরূপভাবে, সিংহ-সিংহী, বাঘ-বাঘিনী, বেদে-বেদেনী ইত্যাদি।

২। বাংলায় বিশেষ্যের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে শব্দের রূপভেদ হলেও সর্বনাম ও বিশেষণের ক্ষেত্রে সচরাচর তা হয় না। যেমন, আমি, তুমি, সে, তোমরা, তারা, ওরা, ওদের, তোমাদের, আমরা ইত্যাদি

সর্বনামবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একই। সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। হিন্দিতেও তা-ই। বাংলায় বিশেষণের বেলায় লিঙ্গভেদ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে থাকলেও একালে অনেকেই এই ভেদ মানেন না। আগে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকায় ভেদ ছিল, একালে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে 'অধ্যাপক'-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। আগে 'সুন্দর' ও 'সুন্দরী'র পৃথক ব্যবহার ছিল, একালে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেই 'সুন্দর' দিয়ে কাজ চালানো হয়। যেমন, উত্তমকুমার সুন্দর ছিলেন, সুচিত্রাও কম সুন্দর ছিলেন না। লম্বা, ছোটো, মোটা, সরু, ফরসা, ভালো, মন্দ ইত্যাদি বিশেষণ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। ইংরেজিতে যেমন— tall, short, good, bad ইত্যাদি বিশেষণের লিঙ্গভেদ নেই বাংলাতেও তাই।

বচন

বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতির সংখ্যা বোঝানো হয় বচনের দ্বারা। একটি বস্তু বা একজন ব্যক্তি বোঝালে একবচন, একের অধিক বোঝালে বহুবচন হয়ে থাকে। অধিকাংশ ভাষায় বচনের দুটি রূপ, বাংলায়ও তা-ই, কিন্তু সংস্কৃতে এদের অতিরিক্ত ছিল। দ্বিবচনের রূপ। অবশ্য সংস্কৃতের দ্বিবচনের পদ প্রাকৃত যুগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলায় বচন নির্দেশক পদের গঠন ও প্রয়োগের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মূল লক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

১। বাংলায় শব্দমাত্রই একবচনাত্মক। প্রাচীন বাংলায় একবচন ও বহুবচনের পদের রূপ একই ছিল। 'একঠো পদুমা', 'বতিস জোইনী', 'পঞ্চবি ডাল' বাক্যগুলির পদুমা, জোইনী, ডাল ইত্যাদি পদের রূপ উভয় বচনে একই।

২। মধ্যবাংলায় বহুত্ববোধক 'রা' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা দেয়। যেমন — আম্মারা, তোম্মারা। পরবর্তীকালে আসে '-এরা'। যেমন — তারা, ওরা, যারা, রামেরা, যদুরা ইত্যাদি। 'রা' এর ব্যবহার স্বরান্ত শব্দে, 'এরা'র ব্যবহার ব্যঞ্জনান্ত শব্দে। যেমন — অন্ধরা, শিশুরা, শিক্ষকেরা, লোকেরা, গরিবেরা। অপ্রানীবাচক শব্দে এই বিভক্তিগুলির ব্যবহার নেই।

৪। ফারসি 'দিগর' থেকে নিষ্পন্ন '-দিগ', '-দে' প্রভৃতি প্রাতিপদিক কারক-বাচক বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনের পদ গঠন করে থাকে।-আমাদিগকে, তোমাদিগকে, তোমাদের, এদের ইত্যাদি।

৫। বহুত্ববোধক প্রত্যয় 'গুলি', 'গুলা'র ব্যবহার বাংলায় প্রচুর। অনুমান হয় সংস্কৃত 'গোলক', 'গোলিকা' বা 'গুল' থেকে এগুলি নিষ্পন্ন। গ্রামগুলি, লোকগুলা, মেয়েগুলা ইত্যাদি।

৬। বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ প্রভৃতি পদের পুনরুক্তি দ্বারা বহুবচনের পদ গঠিত হয়। যেমন—জনে জনে বলেছি। লাল লাল ফুল। যে যে এসেছে। কে কে এসেছে? সভায় কাকে কাকে ডেকেছ?

১২.৪ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা বাংলা পদের গঠন, পদের সংজ্ঞা, প্রতিটি পদের শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এছাড়াও এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পাশাপাশি বাংলা কারক, বিভক্তি, লিঙ্গ ও বচন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।

প্রত্ন বাংলা, মধ্য বাংলা, নব্য বাংলা ভাষার উদাহরণের সাহায্যে বিভিন্ন কালে বাংলা কারক, পদ ব্যবহারের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলি

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচারের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভেদ নির্দেশ করুন।

২। বাগ্‌যন্ত্রের একটি ছবি এঁকে এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্দেশ করুন।

৩। শ্বাসবায়ুর নির্গমন পথের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থানগুলি নির্দেশ করুন।

৪। উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করুন।

৫। উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করুন।

৬। ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৭। শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণসমূহ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

৮। যথাযথ দৃষ্টান্তসহ শব্দ ও পদের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৯। বিশেষণ পদ কাকে বলে? বাংলায় বিশেষণ পদের বৈচিত্র্য নির্দেশ করুন।

১০। সমাস কাকে বলে? বাংলায় নতুন শব্দ গঠনে সমাসের ভূমিকা আলোচনা করুন।

১১। "বাগ্‌ধ্বনি সৃষ্টি করা বাগ্‌যন্ত্রের গৌণ কাজ।"—এই কথার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

১২। একটি চিত্রের সাহায্যে বাগ্‌যন্ত্র কর্তৃক বাগ্‌ধ্বনি সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

১৩। আমাদের উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি পৃথকভাবে তৈরি হয়, বুঝিয়ে লিখুন।

১৪। মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal Vowels) কাকে বলে? মৌলিক স্বর ক'টি ও কী কী? একটি ছকের সাহায্যে মুখ-গহ্বরে মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান দেখান।

১৫। মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে বাংলার মূল স্বরের পার্থক্য নির্দেশ করুন। ছকের সাহায্যে এই পার্থক্য কীভাবে দেখানো যেতে পারে?

১৬। স্বরধ্বনির উচ্চারণ-প্রকৃতি কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

১৭। মুখ-গহ্বরে জিহ্বার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি কীভাবে স্বরধ্বনির উচ্চারণগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে—আলোচনা করুন।

১৮। স্বরধ্বনির উচ্চারণগত বৈচিত্র্য কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? একটি ছকের সাহায্য নিয়ে বাংলা স্বরধ্বনির বর্গীকরণ করুন।

১৯। ভাষাকে কেন বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, ধ্বনি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করুন।

২০। ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন শ্রেণির স-দৃষ্টান্ত পরিচয় দিন।

২১। ধ্বনির আগম বলতে কী বোঝায়? এর শ্রেণিবৈচিত্র্যের পরিচয় দিন।

২২। ধ্বনির লোপ বলতে কী বোঝায়? এর শ্রেণিবৈচিত্র্যের পরিচয় দিন।

২৩। ধ্বনির রূপান্তর বলতে বোঝায়? এর অন্তর্গত যে-কোনো দুটি ধারার পরিচয় দিন।

২৪। শব্দার্থতত্ত্বের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করুন।

২৫। শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দিন।

২৬। শব্দার্থ পরিবর্তনের মধ্যে ইতিহাসের তথ্য কীভাবে লুকিয়ে থাকে দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করুন।

২৭। প্রত্যয়যোগে কীভাবে বাংলা শব্দগঠন হয়—আলোচনা করুন।

২৮। বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের অবদান স্পষ্ট করুন।

২৯। বাংলা শব্দভাণ্ডারকে কীভাবে শব্দজোড় বা শব্দদ্বৈত সমৃদ্ধ করেছে তার পরিচয় দিন।

৩০। বাংলা শব্দগঠনের প্রক্রিয়া বিষয়ে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

৩১। সর্বনাম কী? বাংলায় কীভাবে সর্বনাম পদ গঠিত হয়, দেখান।

৩২। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবৈচিত্র্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩৩। অব্যয়ের সংজ্ঞা দিন। বাংলায় অব্যয় পদের গঠনের বৈচিত্র্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩৪। বাংলায় লিঙ্গ নির্দেশক পদের গঠন ও প্রয়োগের বৈচিত্র্য আলোচনা করুন।

৩৫। বাংলা সমাসকে মোটামুটি কটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে? বর্ণনামূলক সমাসের অন্তর্গত সমাসটির পরিচয় দিন।

৩৬। বাংলায় বচন নির্দেশক পদের গঠন ও প্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। নাসিক্যব্যঞ্জন কাকে বলে?

২। মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির উল্লেখ করুন।

৩। পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয় দিন।

৪। অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির একটি করে উদাহরণ দিন।

৫। জোড়কলম শব্দ কীভাবে তৈরি হয়?

৬। 'সন্দেশ' শব্দটির আদি অর্থ নির্দেশ করুন।

৭। 'মহাজন' শব্দটির পরিবর্তিত অর্থ নির্দেশ করুন।

৮। শব্দের ত্রিবিধ শক্তিগুলির নামোল্লেখ করুন।

৯। শব্দের অর্থের উন্নতির উদাহরণ দিন।

১০। দ্বন্দ্ব সমাসের পদ গঠন কীভাবে হয় লিখুন।

১১। সংক্ষেপে আলোচনা করুন: বাগ্‌যন্ত্রের গঠন, স্বরযন্ত্র, সঘোষ ধ্বনি, অঘোষধ্বনি।

১২। অঘোষধ্বনি ও সঘোষধ্বনির পার্থক্য দেখান।

১৩। টীকা লিখুন: মৌলিক স্বরধ্বনি, সম্মুখ স্বর, সংবৃত স্বর, উচ্চাবস্থিত স্বর, বাংলা দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন, পার্শ্বিক ব্যঞ্জন।

১৪। ধ্বনি সৃষ্টিতে স্বরতন্ত্রীর ভূমিকার পরিচয় দিন।

১৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন:

অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, বিপর্যাস, স্বরভক্তি, আদি স্বরাগম, আদি স্বরলোপ, মূর্ধন্যীভবন, তালব্যীভবন, নাসিক্যীভবন, উষ্মীভবন, ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, অল্পপ্রাণীভবন, লোকনিরুক্তি, সাদৃশ্য, জোড়কলমশব্দ।

১৬। সংক্ষেপে আলোচনা করুন:

ইতিহাসের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্বের সম্পর্ক, শব্দার্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের সংস্কার বিশ্বাসের প্রভাব, আলংকারিক কারণে শব্দার্থের পরিবর্তন, অর্থের প্রসার, অর্থের সঙ্কোচ, অর্থের সংশ্লেষ, অর্থের উন্নতি, অর্থের অবনতি।

১৭। নীচের শব্দগুলির আদি অর্থ ও পরিবর্তিত অর্থ নির্দেশ করুন:

অসুর, নাগর, মোরগ, মৃগ, পান, কলম, পাত্র, গেলাস, তেল, ধীবর, ঝি, ইতর, হঠাৎ, বাঁশি, কালি, প্রদীপ।

১৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন:

বাংলা বিশেষণ পদগঠন, বাংলা ক্রিয়াপদ গঠন, মনোভাববাচক অব্যয়, বাংলা অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া, উপসর্গীয় প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন, তদ্ধিতান্ত শব্দ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২। *ভাষার ইতিবৃত্ত* — সুকুমার সেন

৩। *বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা* — দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

৪। *বাগর্থ* — বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

৫। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* — রামেশ্বর শ'।

৬। *বাঙলা ভাষা* — হুমায়ুন আজাদ

৭। *ভাষা জিজ্ঞাসা* — পবিত্র সরকার

৮। *ভাষাবিদ্যা পরিচয়* — পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৯। *ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা* — সুভাষ ভট্টাচার্য

মডিউল ৩

বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কারক ও বিভক্তি, বাক্যগঠন, বাংলা বানান

একক ১৩ ❑ বচন, লিঙ্গ

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ বচন

১৩.৪ লিঙ্গ

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

১৩.১ উদ্দেশ্য

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার মূল্য অপরিসীম। ভাষা মানুষের মনের কথা বক্তব্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যবহারিক জীবনে শুদ্ধভাবে বাংলা বলা, লেখা ও পড়ার জন্য বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া। এই পর্যায়ের আলোচনায় শিক্ষার্থীরা নির্ভুল বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত হবেন।

১৩.২ প্রস্তাবনা

মানুষের মনের বা ভাবের আদান-প্রদানের প্রধান বাহন ভাষা। মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে অন্যের বোধগম্য বা বোঝার উপযোগী কোনো আওয়াজ বা ধ্বনি উচ্চারণ করলে, সেই ধ্বনি বা আওয়াজ হল 'শব্দ'। সাধারণত অন্যের বোধগম্য অর্থযুক্ত শব্দকেই 'কথা' বলা হয়। আর মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কথাকে 'ভাষা' বলা হয়। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক—"মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্য উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে **ভাষা** বলে।" (দ্র. ভূমিকা, 'সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ')। আর ভাষাকে বহুজনবোধ্য হতে গেলে তার ব্যবহারের জন্য কিছু নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন—সেই নিয়ম শৃঙ্খলার কথা যে গ্রন্থে থাকে, তাকে 'ব্যাকরণ' বলা হয়। প্রত্যেক ভাষার ব্যবহারের জন্য নিজস্ব নির্দিষ্ট কিছু বিধি-নিয়ম থাকে, যার সাহায্যে ভাষা বহুজনবোধ্য ও সুন্দর হয়ে ওঠে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ব্যাকরণের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—"যে শাস্ত্রে কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝাইয়া দেওয়া হয়, সেই শাস্ত্রকে বলে সেইভাষার ব্যাকরণ (Grammar)। যে শাস্ত্রের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সব দিক দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বলে 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' বা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

এই ব্যাকরণের আলোচনা তিনভাবে হয়—তাই ব্যাকরণও তিনপ্রকার—১. বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar), ২. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar), ৩. তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar)।

"কোন নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে অবস্থিত কোন ভাষার বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনা বর্ণনামূলক ব্যাকরণের বিষয়। যেমন এখনকার দিনের কথা অথবা লেখ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ।" (দ্র. সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত,' ৩য় অধ্যায়।) আমাদের বর্তমান আলোচনা এই ভাগের মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বাংলা ভাষার ব্যাকরণ আমাদের আলোচ্য। এই ব্যাকরণের আলোচনায় যে বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক, তা হল—শব্দভাণ্ডার, বাক্যগঠন, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক ও বিভক্তি। এর পূর্ববর্তী পর্যায়ে শব্দগঠন, পদগঠন বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই পর্যায়ে বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কারক ও বিভক্তি, বাক্যগঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। বাক্যগঠন প্রধান বিষয়; কিন্তু সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কারক ও বিভক্তি আলোচনা প্রয়োজন। তাই সেগুলি আগে পৃথকভাবে আলোচিত হবে এবং শেষে বাক্যগঠন সম্পর্কিত আলোচনা হবে। তারপর পাঠ্যসূচি অনুসারে বাংলা বানান সম্পর্কিত আলোচনা করা হবে। ভাষা মুখে উচ্চারিত হয়, কিন্তু সেই ভাষাকে লিখে রাখার ব্যবস্থাও করতে হয়, সেখানেই মূলত বানানের প্রয়োজন। বাংলা বানান নিয়ে নানান বিভ্রান্তি চলছিল ও এখনও চলছে, সব ভাষাতেই হয়। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানান সংস্কার কমিটি বাংলা বানানের বিধি নিয়ম নির্ধারিত করে। তারপরেও নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে ১৯৯৭ সালে আবার নতুন বানান বিধি চালু হয়। আমাদের আলোচনায় তার পরিচয় দেওয়া হয়।

১৩.৩ বচন

'বচন' শব্দটির অর্থ কথা, বাক্য, শব্দ। কিন্তু ব্যাকরণে 'বচন' শব্দটি এক বিশেষ পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত। 'বচন' শব্দটির দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা হয়। যেমন—'দিন তো গেল সন্ধ্যা হল'। 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'। বাক্য দুটিতে 'দিন' শব্দের দুটি রূপ দেখতে পাচ্ছি। প্রথমটিতে 'দিন' বলতে একটি দিন, পরেরটিতে একাধিক দিনের কথা বোঝাচ্ছে। আবার—'আমি কান পেতে রই', 'আমরা চাষ করি আনন্দে' বাক্য দুটিতে যথাক্রমে 'আমি' দ্বারা একজনকে বোঝাচ্ছে এবং 'আমরা' দ্বারা বহুজনকে বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ দিন, দিনগুলি, আমি, আমরা, খাঁচা প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যা বোঝাচ্ছে। তাই বলা যায়—

যার দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়, বা, যার দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা জন্মায় তাকে বলে 'বচন'। একেই ইংরিজিতে বলা হয় Number।

● এখানে মনে রাখতে হবে, যার সংখ্যা হয় বা যা গণনাযোগ্য সেক্ষেত্রেই 'বচন'-এর প্রশ্ন ওঠে। যা গোনা যায় না, বা সংখ্যা হয় না তার ক্ষেত্রে 'বচন'-এর প্রশ্ন ওঠে না। আমরা হাওয়াগুলো, জলগুলো বলি না।

বাংলা ব্যাকরণে বচন দু'প্রকার। একবচন ও বহুবচন।

একবচন: কোনো শব্দে একটি সংখ্যা বোঝালে তাকে **একবচন** বলে।

গাছটির ডালে **পাখিটা** বসে আছে। **তিনি** পায়চারি করছেন। **কলমটা** আনো। বাক্যগুলিতে কলমটা, গাছটির, পাখিটা শব্দগুলির দ্বারা একটি গাছ, একটি পাখি, একটি কলম, একজন ব্যক্তি বোঝাচ্ছে, তাই এগুলিকে একবচনের দৃষ্টান্ত বলা যায়।

বাংলা ভাষায় শব্দের মূল রূপটিতেই একবচন বোঝানো হয়। অনেক সময় টা, টি, খানি, গাছা প্রভৃতি প্রত্যয় মূল শব্দে যুক্ত করেও একবচনের ভাবটিকে স্পষ্ট করা হয়। একবচন বোঝানোর জন্য শব্দের আগে এক, একখানা, একগাছি শব্দও যোগ করা হয়—একগাছি দড়ি, এক রাজা ইত্যাদি।

বহুবচন: কোনো শব্দে একের অধিক শব্দ বোঝালে তাকে **বহুবচন** বলে।

বন্যেরা বনে সুন্দর, **শিশুরা** মাতৃক্রোড়ে। এই বাক্যে 'বন্যেরা' শব্দের দ্বারা একাধিক বন্যপ্রাণী এবং 'শিশুরা' শব্দে অনেক শিশুর কথা বোঝাচ্ছে। তাই এগুলি বহুবচনের উদাহরণ।

এখন একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরের প্রসঙ্গে আসা যাক। সাধারণত ৬টি উপায়ে বাংলায় বহুত্ব বোঝানো হয়ে থাকে।

১. শব্দের পরে 'রা', 'এরা' প্রভৃতি বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে।

২. বিশেষ্যের আগে সমষ্টিবাচক শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহার করে।

৩. বিশেষ্যের পরে 'গণ', 'পুঞ্জ', 'দল', 'কুল' প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করে।

৪. শব্দের দ্বিরুক্তি বা একই শব্দ পাশাপাশি দু'বার ব্যবহার করে।

৫. মূল শব্দের সঙ্গে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে।

৬. এক বচনের রূপে বহুবচনের ইঙ্গিতে।

এবারে বহুত্বজ্ঞাপক উপায়গুলি ব্যবহারের উদাহরণ নেওয়া যাক।

১. শব্দের পরে বিভক্তি বা প্রত্যয়ের প্রয়োগ ঃ

(ক) 'রা', 'এরা' (-য়েরা), 'দের', 'দেরকে', 'দিগকে' প্রভৃতি বিভক্তি যোগ: শিশুরা, বন্যেরা, ছেলেরা, আপনাদের ইত্যাদি।

(খ) প্রাণী ও অপ্রাণীবাচক উভয় প্রকার শব্দেই 'গুলা', 'গুলি', 'গুলো' প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন—ছেলেগুলি,বইগুলো প্রভৃতি।

মান্যগণ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'গুলা', 'গুলি', 'গুলো' ব্যবহার করা হয় না—মাস্টারগুলো, ছাত্রগুলো—বলা হয় না। তবে অবজ্ঞায় বা অশ্রদ্ধায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার দেখা যায়—"পোড়ার মুখো মাস্টারগুলো কি ওকে পাস করতে দেয়?" [বিন্দুর ছেলে] 'এই লোভী ব্রাহ্মণগুলোকে শ্রদ্ধা করার কিছু নেই'—ইত্যাদি। সাধারণত ছেলেগুলি, মেয়েগুলি ব্যবহার হয় কিন্তু অনাদরে অবহেলায় বা বিরক্তিতে ছেলেগুলো, মেয়েগুলো ব্যবহার করা হয়। তবে এসব ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোনো বিধি নেই। তা নির্ভর করে বক্তার উদ্দেশ্য, প্রসঙ্গ, পরিস্থিতির উপর। রবীন্দ্রনাথের মতে—"ওই মোষরা পাঁকে ডুবে গেছে, বলা যায় কিন্তু 'মোষগুলো পাঁকে ডুবে আছে' বললে মানানসই হয়। টেবিলরা চৌকিরা নিষিদ্ধ। জড়পদার্থের 'গুলো' ছাড়া গতি নেই।"

২. (ক) বিশেষ্যের আগে বহুত্বজ্ঞাপক বিশেষণ ব্যবহার করে (বহুত্বজ্ঞাপক বিশেষণ বসলে বিশেষ্যর পরে 'রা', 'এরা', 'গুলি' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহার করা যাবে না) যেমন: '**সব শিয়ালের** একই রা', '**সবপাখি** ঘরে আসে', **সব নদী**, ফুরায় এ জীবনের সব **লেনদেন**'।

(খ) যে, সে প্রভৃতি সর্বনামপদ এবং বহুত্ববাচক সব, সকল প্রভৃতির একসঙ্গে ব্যবহার যেমন: **যে-সব পরীক্ষার্থী** এখনো ফি জমা দেননি, **যে-সব পরীক্ষার্থীকে** আজকের মধ্যে তা দিতে হবে। **ওসব বাহানা** চলবে না।

(গ) বিশেষ্যের আগে বহুজ্ঞাপক সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসিয়ে: **পাঁচ** টাকা, **দশজন** মানুষ, দশ আঙুল। এখানে বিশেষ্যের পরে আর বহুত্ববাচক প্রত্যয় বসবে না—দশজন মানুষ**গুলি**, পাঁচটি আঙুল**গুলি** অশুদ্ধ।

(ঘ) এত, অনেক, কত, কতক বিশেষ্যের আগে বসলে কখনো কখনো গুলো, গুলি প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বসে—কতকগুলি ছাত্রী, তুমি অনেকগুলো বছর নষ্ট করেছ। **এতগুলো টাকা** খরচ করে ফেললি?

৩. বিশেষ্যের পরে সমষ্টিবাচক শব্দ (গণ, দল, মণ্ডলী, পুঞ্জ) যোগ করে—

প্রাণীবাচক শব্দে:

কুল: পিককুল, পক্ষীকুল। "কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটলো **অলিকুল**"।

দল: ছাত্রদল, সৈন্যদল। "বেড়িয়াছে **বৈরিদল** স্বর্ণলঙ্কাপুরী"।

পাল: পঙ্গপাল, পতঙ্গপাল। "**পঙ্গপালে** ফসল নষ্ট করে দিল"।

বর্গ, বৃন্দ: বন্ধু**বর্গ**, নেতৃ**বর্গ**, বীর**বৃন্দ**, পুরনারী**বৃন্দ**।

যূথ: হস্তীযূথ, মহিষযূথ।

অপ্রাণীবাচক শব্দে:

আবলি/আবলী: রচনাবলী (রচনাবলি), প্রশ্নাবলি, দীপাবলি

গুচ্ছ, গ্রাম: ইন্দ্রিয়গ্রাম, গুণগ্রাম, পুষ্পগুচ্ছ

চয়/নিচয়: পুষ্পাচয়, তরঙ্গ-নিচয়

জাল: কেশজাল, শরজাল। আলুলায়িত **কেশজাল**।

দাম: কুসুমদাম, শৈবালদাম। সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।

নিকর: তরঙ্গনিকর, শীকর-নিকর। "ক্রোধে জলে রাবণের নয়ন-নিকর"

পুঞ্জ: কুসুম পুঞ্জ, পুষ্পপুঞ্জ, "বনবীথিকার কীর্ণ বকুল**পুঞ্জ**"।

মালা, রাজি, রাশি: আলোকমালা, রত্নরাজি, পুষ্পরাশি।

প্রাণী ও অপ্রাণীবাচক উভয় ক্ষেত্রেই:

মণ্ডলী: পণ্ডিত মণ্ডলী, সম্পাদক মণ্ডলী, পরিচালক মণ্ডলী

শ্রেণী/শ্রেণি: তরুশ্রেণী, অশ্বশ্রেণি

সমূহ: গ্রাম সমূহ, লোকসমূহ

মহল: **ছাত্রমহল** এই **সিদ্ধান্তে** ক্ষুব্ধ হল। **মেয়ে-মহলে** গুঞ্জন উঠল।

৪. শব্দের দ্বিরুক্তি বা একই শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে:

(ক) **বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি:**

গাড়িগাড়ি পুলিশ, **বস্তাবস্তা** ধান, "**মাঠে মাঠে** ধান ধরে নাকো আর"।

(খ) **বিশেষণের দ্বিরুক্তি:**

উঁচু উঁচু পাহাড়, পাকা পাকা আম

৫. একই অর্থবাচক দুটি শব্দ ব্যবহার করে:

টাকা—টাকা পয়সা, ছেলে—ছেলেপিলে, বন্ধু—বন্ধুবান্ধব, চিঠি—চিঠিপত্র, গাছ—গাছপালা/ গাছগাছালি, ভাবনা—ভাবনা চিন্তা।

৬. একবচনের রূপে বহুবচনের ইঙ্গিত:

অনেক সময় একবচনের শব্দ ব্যবহার করে বহুবচনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। '**পাগলে** কীনা বলে, **ছাগলে** কী না খায়'। '**ছাত্রের** প্রধান কাজ পড়াশুনা করা'। **মানুষ পশুর** মতো চার পায়ে চলে না।

এখানে পাগল = পাগলেরা, ছাগল = ছাগলেরা, ছাত্রের = ছাত্রদের, মানুষ = মানুষেরা, পশুর = পশুদের এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

- ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। কানাই, তপন, মধুসূদন—কানাইরা, তপনরা, মধুসূদনরা হবে না।

১৩.৪ লিঙ্গ

'লিঙ্গ' সম্পর্কে আলোচনার আগে নিম্নোক্ত বাক্যগুলি লক্ষ করা যাক:

গৌতম চিঠি লিখছে। **সাবির** আড্ডা দিচ্ছে। **সোমা** গান গাইছে। **শকুন্তলা** স্কুলে যাচ্ছে। **তিনি** লিখছেন। **মানুষ** শান্তিপ্রিয়। **বৃষ্টি** পড়ে টাপুর টুপুর। **পাখিসব** করে রব। **জিনিসপত্র** কোথায়?

উপরের বাক্যগুলিতে গৌতম, সাবির শব্দদুটিতে পুরুষ বোঝাচ্ছে। সোমা, শকুন্তলা শব্দদুটিতে স্ত্রী বোঝাচ্ছে। তিনি, মানুষ, পাখি শব্দগুলিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বোঝাচ্ছে। জিনিসপত্র, চিঠি, আড্ডা শব্দগুলিতে স্ত্রী-পুরুষ কিছুই বোঝাচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে— কোনো প্রাণী পুরুষ অথবা স্ত্রী। যা পুরুষ নয়, স্ত্রী-ও নয়, তাকে বলে 'ক্লীব'। স্ত্রী পুরুষের ভেদ বোঝানোর জন্য 'লিঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ভাষাতেও স্ত্রীবাচক ও পুরুষবাচক শব্দ আছে। স্ত্রী-বাচক শব্দ বোঝানোর জন্য 'স্ত্রী-লিঙ্গ' ও পুরুষবাচক শব্দ বোঝানোর জন্য পুংলিঙ্গ এবং প্রাণী ছাড়া অন্য সব কিছু বোঝানোর জন্য ক্লীবলিঙ্গ কথাটি ব্যবহৃত। আর কিছু শব্দ আছে যাদের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বোঝায়, সেগুলিকে 'উভলিঙ্গ' শব্দ বলে।

১. **পুংলিঙ্গ:** যে শব্দে পুরুষ বোঝায় (বা যে শব্দ পুরুষ বাচক) তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন—দাদা, কাকা, মামা, চাচা, রফিক, আশিস্, সিরাজ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি।

২. **স্ত্রীলিঙ্গ:** যে শব্দ স্ত্রীবাচক শব্দ বোঝায় তাকে বলে স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন—মা, মাসি, চাচি, শ্যামা, শম্পা, মমতাজ, বৃদ্ধা, গায়িকা, হস্তিনী প্রভৃতি।

৩. **ক্লীবলিঙ্গ:** যে শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটাই বোঝায় না, যা প্রাণীবাচক নয়—অপ্রাণীবাচক, তা ক্লীবলিঙ্গ। যেমন—ফুল, ফল, গাছ, পাথর, চেয়ার, টেবিল, আলো, বাতাস প্রভৃতি।

- এই তিনপ্রকার লিঙ্গবাচক শব্দ ছাড়াও বাংলা ভাষায় কিছু শব্দ আছে। যেগুলির দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ

দুইই বোঝায়। এই ধরনের শব্দগুলি 'উভয়লিঙ্গ' নামে পরিচিত। যেমন—লোক, মানুষ, শিশু, সন্তান, বন্ধু প্রভৃতি। এছাড়া ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলিও (তুমি, আমি, সে, তিনি, আপনি প্রভৃতি) 'উভয়লিঙ্গ'।

তাহলে, বলা যায় বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ প্রধানত তিন প্রকার। কিছু শব্দ আছে যেগুলি 'উভলিঙ্গ' নামে পরিচিত। তাই সাকুল্যে বাংলায় লিঙ্গ চার প্রকার।

লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন:

পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে অথবা স্ত্রীবাচক শব্দকে পুরুষবাচক শব্দে পরিবর্তিত করা অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করার ব্যাপারটিকে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গপরিবর্তন বলে।

উদাহরণসহ লিঙ্গান্তরের কিছু নিয়ম:

- **তৎসম শব্দ**

১. 'আ' প্রত্যয় যোগ করে:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অচল	অচলা	উত্তম	উত্তমা
অজ	অজা	অধীন	অধীনা
অঞ্জন	অঞ্জনা	উর্বর	উর্বরা
আধুনিক	আধুনিকা	প্রথম	প্রথমা
মনোরম	মনোরমা	রক্তবসন	রক্তবসনা
শ্যামল	শ্যামলা (শ্যামলী)	সুজল	সুজলা
তৃতীয়	তৃতীয়া	দীন	দীনা
মাননীয়	মাননীয়া	বৈবাহিক	বৈবাহিকা
মলিন	মলিনা	রক্তাম্বর	রক্তাম্বরা

২. 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অষ্টম	অষ্টমী	চিন্ময়	চিন্ময়ী
ঈদৃশ	ঈদৃশী	ভুজঙ্গ	ভুজঙ্গী

কুরঙ্গ	কুরঙ্গী	মৎস্য	মৎস্যী
নদ	নদী	ষোড়শ	ষোড়শী
ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী
শ্যামাঙ্গ	শ্যামাঙ্গী	হেমাঙ্গ	হেমাঙ্গী
হংস	হংসী	সিংহ	সিংহী
ময়ূর	ময়ূরী	রজক	রজকী

৩. 'আনী' প্রত্যয় যোগ করে:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী
বরুণ	বরুণানী	ভব	ভবানী
রুদ্র	রুদ্রাণী	শিব	শিবানী
ঈশ	ঈশানী	শর্ব	শর্বাণী
মহেন্দ্র	মহেন্দ্রানী	পণ্ডিত	পণ্ডিতানী

অন্য অর্থে—

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
অরণ্য	অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য অর্থ)	যবন	যবনানী (যবনদের লিপি অর্থে)
বন	বনানী (বৃহৎ বন অর্থে)	হিম	হিমানী (ব্যাপক অর্থে)

৪. যেসব পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে অক্ আছে, সেখানে 'অক'-এর স্থানে 'ইকা' যোগ করে:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	গায়ক	গায়িকা
নায়ক	নায়িকা	পরিচালক	পরিচালিকা
শিক্ষক	শিক্ষিকা	সম্পাদক	সম্পাদিকা
গ্রাহক	গ্রাহিকা	পালক	পালিকা

লেখক	লেখিকা	যাচক	যাচিকা
নাবিক	নাবিকা	অভিভাবক	অভিভাবিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	প্রব্রাজক	প্রব্রাজিকা
পুস্তক	পুস্তিকা (ক্ষুদ্র অর্থে)	নাটক	নাটিকা (ক্ষুদ্র অর্থে)

ব্যতিক্রম:

রজক—রজকী (বাংলায় 'রজকিনি'ও ব্যবহৃত)

নর্তক—নর্তকী

চাতক—চাতকী

গণক—গণকী

৫. যেসব শব্দ 'ইন্' প্রত্যয়যোগে গঠিত এবং কর্তৃকারকের একবচনে 'ঈ' কারান্ত রূপ হয় (হস্তিন্ > হস্তী, যোগিন > যোগী প্রভৃতি), সেই সব মূল শব্দে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে (ইন্ + ঈ = ইনী) লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়:

পুংলিঙ্গ	**মূলশব্দ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**মূলশব্দ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
হস্তী	হস্তিন্	হস্তিনী	যোগী	যোগিন	যোগিনী
প্রতিযোগী	প্রতিযোগিন্	প্রতিযোগিনী	আলাপী	আলাপিন্	আলাপিনী
কামী	কামিন্	কামিনী	করী	করিন্	করিণী
ধনশালী	ধনশালিন্	ধনশালিনী	মালী	মালিন্	মালিনী
			[মাল্যবান]		[মাল্যবতী]
বিজয়ী	বিজয়িন্	বিজয়িনী	মানী	মানিন্	মানিনী
দুঃখ	দুঃখিন্	দুঃখিনী	বিলাসী	বিলাসিন্	বিলাসিনী

৬. '-বিন্' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দের সঙ্গে 'ই' প্রত্যয় যোগ করে (বিন্ + ঈ = বিনী)। মনে রাখতে হবে '-বিন্' প্রত্যয়ের 'ব' বর্গীয় নয়, অন্তঃস্থ 'ব' অর্থাৎ w বা হিন্দীর व এর মতো। যেমন—যশঃ + বিন্ = যশস্বিন্ > যশস্বী। এই রকম:

পুংলিঙ্গ	**মূলশব্দ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**মূলশব্দ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
তেজস্বী	তেজস্বিন্	তেজস্বিনী	পয়স্বী	পয়স্বিন্	পয়স্বিনী

ওজস্বী	ওজস্বিন্	ওজস্বিনী	স্রোতস্বী	স্রোতস্বিন্	স্রোতস্বিনী
যশস্বী	যশস্বিন্	যশস্বিনী	মায়াবী	মায়াবিন্	মায়াবিনী

৭. তৃ, বৎ, মৎ, ঈয়স্ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের মূল শব্দের সঙ্গে 'ঈ' যোগ করে:

পুংলিঙ্গ	**মূলশব্দ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**মূলশব্দ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
কর্তা	কর্তৃ	কর্ত্রী	নেতা	নেতৃ	নেত্রী
জগদ্ধাতা	জগদ্ধাতৃ	জগদ্ধাত্রী	রচয়িতা	রচয়িতৃ	রচয়িত্রী
শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িতৃ	শিক্ষয়িত্রী	বিধাতা	বিধাতৃ	বিধাত্রী
কারয়িতা	কারয়িতৃ	কারয়িত্রী	ধাতা	ধাতৃ	ধাত্রী
ভগবান	ভগবৎ	ভগবতী	বিদ্বান	বিদ্বস্	বিদুষী
আয়ুষ্মান	আয়ুষ্মৎ	আয়ুষ্মতী	ভূয়ান্	ভূয়স্	ভূয়সী
শ্রেয়ন্	শ্রেয়স্	শ্রেয়সী	প্রেয়ান্	প্রেয়স্	প্রেয়সী

ব্যতিক্রম: জামাতা (জামাতৃ), পিতা (পিতৃ), ভ্রাতা (ভ্রাতৃ) শব্দের সঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হয় না।

৮. যে সব শব্দের শেষে 'অৎ' থাকে সেখানে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করা হয়:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
সৎ	সতী	মহৎ	মহতী
অসৎ	অসতী	বৃহৎ	বৃহতী

৯. কিছু শব্দে 'আ', 'ঈ' দুই প্রত্যয়ই ব্যবহৃত হয়:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
সুকেশ	সুকেশা, সুকেশী	কৃশোদর	কৃশোদরা, কৃশোদরী
কৃশাঙ্গ	কৃশাঙ্গা, কৃশাঙ্গী	কোকিলকণ্ঠ	কোকিলকণ্ঠা, কোকিলকণ্ঠী

১০. নেত্র, ভুজ, নয়ন, বদন প্রভৃতি শব্দের পর 'আ' প্রত্যয় হয়—'ঈ' নয়:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
সুনেত্র	সুনেত্রা	চারুনেত্র	চারুনেত্রা
মৃগনয়ন	মৃগনয়না	দ্বিভুজ	দ্বিভুজা

দশভুজ	দশভুজা	ত্রিনেত্র	ত্রিনেত্রা
সুনয়ন	সুনয়না	শশিবদন	শশিবদনা

[বাংলায় শশীবদনী, সুনয়নী, ইন্দু, নিভাননী প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়।]

১১. কিন্তু শব্দের একাধিক স্ত্রীরূপ প্রচলিত, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে:

আচার্য — আচার্যা (যে-নারী নিজেই আচার্য), আচার্যানী (আচার্য-পত্নী)

উপাধ্যায় — উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (যে-নারী নিজেই উপাধ্যায়), উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়-পত্নী)

ক্ষত্রিয় — ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী), ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ানী (ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রী)

শূদ্র — শূদ্রা (শূদ্র-জাতীয় স্ত্রী), শূদ্রাণী (শূদ্র পত্নী)

চণ্ড — চণ্ডা (ক্রুদ্ধা স্ত্রী), চণ্ডী (দুর্গা)

প্রাজ্ঞ — প্রাজ্ঞা (প্রজ্ঞাবতী নারী), প্রাজ্ঞী (প্রজ্ঞাবানের স্ত্রী)

সূর্য — সূর্যা (সূর্যের দেবীপত্নী), সূরী (সূর্যের মানবী পত্নী, কুন্তী)

১২. পৃথক শব্দ ব্যবহার করে:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
পতি	পত্নী	পুত্র	কন্যা
ভ্রাতা	ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ	দেবর	ননদ (দেবরের বোন)
			জায়া, জা (দেবরের পত্নী)
বর	বউ	স্বামী	স্ত্রী

- **খাঁটি বাংলা শব্দ:**

বাংলা শব্দের লিঙ্গান্তরের নিয়ম ঃ ১. স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করে, ২. পৃথক শব্দ ব্যবহার করে, ৩. পুংবাচক শব্দের স্থানে স্ত্রী-বাচক শব্দ ব্যবহার করে, ৪. উভলিঙ্গ শব্দের ক্ষেত্রে পুংবাচক/স্ত্রীবাচক শব্দযোগ করে।

১. আনি, আনী, ইনি, উনি, নি প্রত্যয় যোগে:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
অভাগা	অভাগিনি/অভাগিনী	কাঙাল	কাঙালিনি/কাঙালিনী
ডোম	ডোমনি	জমাদার	জমাদারনি
মালি	মালিনি	বেদে	বেদেনি

ডাইনি	ডাইনি	মজুর	মজুরনি
গয়লা	গয়লানি	ধোপা	ধোপানি
জেলে	জেলেনি	চৌধুরী	চৌধুরানি

২. পত্নী অর্থে 'ঈ' (ই) প্রত্যয় যোগে:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
মামা	মামি	কাকা	কাকি
নানা	নানি	চাচা	চাচি
মেসো	মাসি	খুড়ো	খুড়ি

- **সমজাতীয় স্ত্রীলোক অর্থে:**

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
বোষ্টম	বোষ্টমী	ঘোড়া	ঘুড়ি
শালা	শালি, শালাজ (শালার স্ত্রী)	মাছওয়ালা	মাছওয়ালি, মাছউলি
শাহাজাদা	শাহজাদি		

৩. পৃথক শব্দ ব্যবহার করে:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
কর্তা	গিন্নি	গোলাম	বাঁদি
জামাই	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
চাকর	ঝি	সাহেব	মেম
পো	ঝি	বাদশা	বেগম
নবাব	বেগম	রাজা	রানি, রাণী

৪. আগে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে:

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
কবি	মহিলা কবি	প্রভু	প্রভুপত্নী
	কবিজায়া, কবিপত্নী	ডাক্তার	লেডি-ডাক্তার
গয়লা	গয়লা বৌ	নাপিত	নাপিত বউ
ভদ্রলোক	ভদ্রমহিলা	ভাইপো	ভাইঝি

৫. উভলিঙ্গ শব্দে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে লিঙ্গান্তর:

উভলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মানুষ	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ
সন্তান	পুত্র সন্তান	কন্যা সন্তান
ছেলে	বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে
বন্ধু	পুরুষ বন্ধু	মেয়ে বন্ধু
কুকুর	মদ্দা কুকুর	মাদি কুকুর

❒ **বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়:**

- অনেক সময় লিঙ্গান্তর না করে উভলিঙ্গবাচক একটি মাত্র শব্দ দ্বারা কাজ চলে, সেখানে বাক্যের অর্থের উপর ভিত্তি করে লিঙ্গ নির্ণয় করতে হয়। যেমন—গরুতে দুধ দেয় (এখানে গরু = গাই গরুতে), গরুতে গাড়ি টানে (এখানে গরু = বলদ গরু)। —[সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়]
- কিছু শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ, তাদের স্ত্রীরূপ হয় না: মৃতদার, বিপত্নীক, কাপুরুষ, কৃতদার, স্ত্রৈণ, ঢাকি, ঢুলি ইত্যাদি।
- কিছু শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, তাদের পুংরূপ হয় না: বিধবা, অঙ্গনা, সধবা, সপত্নী, সতীন, ললনা, লক্ষ্মী, ভার্যা, বন্ধ্যা, গর্ভবতী, গর্ভিনী, গর্ভধারিণী, ধাই প্রভৃতি।
- গ্রন্থাগারিক, বিচারপতি, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, সভাপতি, সাংবাদিক প্রভৃতি শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। তবে সভাপতি স্থলে সভানেত্রী, সম্রাটের স্থলে সম্রাজ্ঞী ব্যবহার বাংলায় দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে বর্তমানে সবাপতি বা সবানেত্রীর বদলে উভলিঙ্গবাচক 'সভামুখ্য' শব্দটির প্রচলন লক্ষ্যনীয়।

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

বাংলা শব্দ গঠন, পদগঠনের ক্ষেত্রে রূপতত্ত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লিঙ্গ বচন পুরুষ প্রভৃতি রূপতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়। আমরা এই এককে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বচন এবং লিঙ্গ-এর স্বরূপ সংজ্ঞা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। প্রাণীবাচক অপ্রাণীবাচক শব্দ বচনের ব্যবহার, বিভিন্ন প্রত্যয় যুগের লিঙ্গ পরিবর্তনের উদাহরণ বিস্তৃত আকারে তুলে ধরা হয়েছে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে।

একক ❑ ১৪ পুরুষ

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ পুরুষ সম্পর্কিত সাধারন ধারনা

১৪.৩ সারসংক্ষেপ

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা বাংলা পুরুষের ব্যবহার, তার সংজ্ঞা স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

১৪.২ পুরুষ সম্পর্কিত সাধারন ধারনা

আমরা জানি, বাক্যগঠনে একটি ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়ার সাধনের জন্য একটি কর্তা থাকবেই। ক্রিয়া একজন কর্তাকে আশ্রয় করে বাক্যে অবস্থান করে। ক্রিয়ার আশ্রয়কে ব্যাকরণের পরিভাষায় 'পুরুষ' বলা হয়। ইংরাজিতে একে বলা হয় Person। ব্যাকরণের এই 'পুরুষ' শব্দের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই। 'পুরুষ' এখানে লিঙ্গবাচক নয়, ব্যক্তিবাচক শব্দ। যেমন 'বচন' একটি পারিভাষিক শব্দ।

'পুরুষ' সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে √কর্ ধাতু বা 'করা' ক্রিয়াদ্বারা গঠিত তিন ধরনের বাক্য এবং তাদের আশ্রয়কে লক্ষ করুন:

১. আমি করি

২. তুমি কর। আপনি করেন। তুই করিস।

৩. সে করে। তিনি করেন।

প্রথম ধরনের বাক্যে ক্রিয়ার আশ্রয় 'আমি'। দ্বিতীয় ধরনের বাক্যে ক্রিয়ার আশ্রয়, 'তুমি' 'আপনি', 'তুই'। তৃতীয় ধরনের বাক্যে ক্রিয়ার আশ্রয় সে, তিনি।

এই তিন ধরনের বাক্যে (১) আমি, (২) তুমি (আপনি, তুই), (৩) সে, (তিনি) তিন ধরনের সর্বনাম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা পুরুষকে বোঝাচ্ছে। বাংলা ব্যাকরণে এই তিন ধরনের সর্বনামকে যথাক্রমে **উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ** ও **প্রথম পুরুষ** বলা হয়। এই ভাগ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে, ইংরিজিতে এরা যথাক্রমে 1st Person, 2nd Person, 3rd Person।

এখন তিন পুরুষের পরিচয় নেওয়া যাক:

উত্তমপুরুষ: ক্রিয়ার কর্তা নিজেকে বোঝাতে বা নিজের নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম পদ ব্যবহার

করে তাকে 'উত্তম পুরুষ' বলা হয়। 'আমি' সর্বনাম ও তার বিভিন্ন রূপ **উত্তম পুরুষ**। ক্রিয়ার রূপও পুরুষ অনুসারে হয়—আমি দেখেছি, আমি দেখব, আমরা দেখব ইত্যাদি।

মধ্যমপুরুষ: ক্রিয়ার কর্তা কাউকে কিছু বলার সময় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে যে সর্বনাম পদ ব্যবহার করে বা অন্যকে সম্বোধন করে কিছু বলে, সেই সম্বোধিত ব্যক্তিবাচক সর্বনাম 'মধ্যমপুরুষ'। তুই, তুমি, আপনি এবং তাদের বিভিন্ন রূপ মধ্যম পুরুষ। যেমন—তুমি ছবি দেখবে, আপনি দেখবেন, তুই দেখবি।

প্রথমপুরুষ: কারও সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সেই ব্যক্তিকে (আমি, তুমি প্রভৃতি ছাড়া কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে) বোঝানোর জন্য যে বিশেষ্য বা সর্বনাম ব্যবহার করা হয় সেই বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ '**প্রথম পুরুষ**'। আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তুই, আপনি প্রভৃতি উত্তম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষ বাচক সর্বনাম ছাড়া সমস্ত সর্বনাম পদ ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যপদ প্রথম পুরুষ। **সে** যাবে, **তারা** যাবে। **শচীন** যাবে, **তিনি** যাবেন। রফিক যাবে ইত্যাদি।

ক্রিয়ার রূপ পুরুষ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এখানে ক্রিয়া বলতে সমাপিকা ক্রিয়া বুঝতে হবে।

একটি ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের পরিচয় দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

√কর্ ধাতু ('করা' ক্রিয়া)

সাধারণ বর্তমান কাল

	একবচন	**বহুবচন**
উত্তম পুরুষ—	আমি করি	আমরা করি
মধ্যমপুরুষ—	তুমি কর/আপনি করেন/তুই করিস	তোমরা কর/ আপনারা করেন/তোরা করিস
প্রথম পুরুষ—	সে করে/তিনি করেন/অসীম করে	তারা করে/তাঁরা করেন/অসীমরা করে।

সাধারণ অতীত কাল

	একবচন	**বহুবচন**
উত্তম পুরুষ—	আমি দেখলাম/দেখেছিলাম	আমরা দেখলাম/দেখেছিলাম
মধ্যমপুরুষ—	তুমি দেখলে/আপনি দেখলেন/ তুই দেখলি/দেখেছিলে/দেখেছিলেন/ দেখেছিলিস	তোমরা দেখলে/আপনারা দেখলেন/ তোরা দেখলি/দেখেছিলে/দেখেছিলেন/ দেখেছিলিস
প্রথম পুরুষ—	সে দেখল/তিনি দেখলেন/ অসীম দেখল/দেখেছিল/দেখেছিলেন	তারা দেখল/তাঁরা দেখলেন/ অসীমরা দেখল/দেখেছিল/দেখেছিলেন

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ—	আমি দেখব	আমরা দেখব
মধ্যমপুরুষ—	তুমি দেখবে/আপনি দেখবেন/ তুই দেখবি	তোমরা দেখবে/আপনারা দেখবেন/ তোরা দেখবি
প্রথম পুরুষ—	সে দেখবে/তিনি দেখবেন/ অসীম দেখবে	তারা দেখবে/তাঁরা দেখবেন/ অসীমরা দেখবেন

১৪.৩ সারসংক্ষেপ

বাংলা বাক্য গঠনে পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা অবহিত। বাংলায় মূলত তিন প্রকার যে পুরুষ দেখতে পাওয়া যায় এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে এই এককে। মূলত ক্রিয়ার পুরুষের রূপ বদলে যায়। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সম্যক ধারণা দেবার চেষ্টা করেছে এই এককটি।

একক ১৫ ❑ কারক ও বিভক্তি

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ কারক ও বিভক্তি

১৫.৩ বিভক্তি ও অনুসর্গ

১৫.৪ সারসংক্ষেপ

১৫.১ উদ্দেশ্য

বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্ধারণ করা হয়। এই এককে আমরা বাংলা কারক, বিভক্তি, অনুসর্গ সম্পর্কে আলোচনা করব।

১৫.২ কারক ও বিভক্তি

কোনো বাক্যের প্রাথমিক শর্ত হল, কর্তা ও ক্রিয়াপদ থাকতেই হবে। বাক্যে ক্রিয়াপদ ও সেই ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য একটি কর্তা থাকবেই। কর্তা সাধারণত নামপদ বা বিশেষ্য ও সর্বনাম হয়। বাক্যের পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক একটা সম্বন্ধ থাকেই; তবে সেই সম্পর্ক বিশেষত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদগুলির সম্পর্ক। বাক্যের কোনো পদই খাপছাড়া হয় না। প্রত্যেকটি পদ পরস্পর এক সম্বন্ধ-সূত্রে গাঁথা থাকে। এই কারণেই তাদের মিলিত অবস্থার একটি সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। বাক্যে ক্রিয়াপদের ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। ক্রিয়াপদকে প্রশ্ন করলেই অন্য পদগুলির সঙ্গে সম্বন্ধটি জানা যায়। একটি বাক্যের উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক—

আজ দুপুরবেলা মা আলমারি থেকে ভাইয়ের জন্য একটা নতুন জামা এনে নিজের হাতে আমাকে দিলেন।

বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ 'দিলেন'। এই ক্রিয়াপদটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করলে বাক্যের বিভিন্ন পদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ জানা যাবে—

কে দিলেন?— মা

কাকে দিলেন?—আমাকে

কী দিলেন?—নতুন জামা

কীভাবে দিলেন?—নিজের হাতে

কার জন্য দিলেন?—ভাইয়ের জন্য

কোথা থেকে দিলেন?—আলমারি থেকে

কখন দিলেন?—দুপুরবেলা।

উপরের বাক্যের ক্রিয়া পদটিকে করা প্রশ্ন ও উত্তর দেখে বোঝা যাচ্ছে, 'দিলেন' ক্রিয়াপদের সঙ্গে মা, আমাকে, নতুন জামা, নিজের হাতে, ভাইয়ের জন্য, আলমারি থেকে, দুপুরবেলা এই পদগুলি কোনো-না-কোনো ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আর পদগুলি নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য অথবা সর্বনাম। দেখা যাচ্ছে ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদগুলির যে সম্বন্ধ তাকে **কারক** বলা হয়।

বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে ঐ বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে অন্বয় বা সম্বন্ধ, তাকে কারক বলে।

এই সম্বন্ধকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। 'মা'—কর্তৃসম্বন্ধ কারক, 'আমাকে' ও 'নতুন জামা'—কর্মকারক, 'নিজের হাতে'—করণকারক, 'ভাইয়ের জন্য'—নিমিত্ত কারক, 'আলমারি থেকে'—অপাদান কারক, 'আজ', 'দুপুর বেলা'—অধিকরণ কারক।

বাংলায় কারক প্রধানত—কর্তৃ, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকারণ—এই পাঁচটি। আর নিমিত্ত অর্থে যে গৌণকর্ম, তাকে আলাদাভাবে কারক হিসাবে চিহ্নিত করলে বাংলায় কারকের সংখ্যা ছয়।

বি. দ্র. [সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলায় 'সম্প্রদান' কারক এতদিন ব্যবহার হয়ে আসছিল। বাংলায় সম্প্রদান কারককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এর বিভক্তি ও কর্মকারকের বিভক্তি এক। রামমোহন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বৈয়াকরণগণ বাংলা ব্যাকরণে 'সম্প্রদান' কারকের যৌক্তিকতা স্বীকার করেননি। এটিকে কর্মকারকের গৌণ কর্মের অন্তর্গত করে দেখতে চেয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার।]

এখন কারক সম্বন্ধে আলোচনার আগে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার পরিচয় নিতে হবে।

বক্তব্যের সম্পূর্ণতার বিচারে ক্রিয়াপদ দু'প্রকার—(১) সমাপিকা এবং (২) অসমাপিকা।

সমাপিকা: যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ ভাব ও বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন—আমি **খেলাম**। তুমি **খাবে**। সে **এসেছে**।

অসমাপিকা: যে ক্রিয়াপদের বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তার সঙ্গে আর একটি সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন—তুমি **এলে** আমি যাব। ভাত **খেয়ে পড়তে** বসব। বাক্যদুটিতে এলে, খেয়ে, পড়তে এগুলির দ্বারা বক্তব্য স্পষ্ট হচ্ছে না, তার জন্য সমাপিকা ক্রিয়া 'যাব' এবং 'বসব' প্রয়োজন হচ্ছে।

সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদের কর্ম থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—'আমাকে চা দাও' বাক্যে 'দাও' ক্রিয়াকে **কী** এবং **কাকে** প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় যথাক্রমে 'চা' ও 'আমাকে' এই দুটি উত্তর হল। 'কর্ম' তাই দেওয়া ক্রিয়াটি '**সকর্মক**'। আবার জয়বাবু দিল্লি যাচ্ছেন' বাক্যে 'যাচ্ছেন' ক্রিয়াকে 'কী' এবং 'কাকে' প্রশ্ন করা যায় না, ক্রিয়াটির কর্ম নেই। তাই 'যাওয়া' ক্রিয়াটি **অকর্মক**।

কর্তৃকারক: তপন গল্প করছে। নৌকা চলছে।—বাক্যদুটিতে সমাপিকা ক্রিয়াকে 'কে গল্প করছে?' বা 'কে চলছে' প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় যথাক্রমে 'তপন' ও 'নৌকা'। বাক্যদুটিতে ক্রিয়া সম্পাদন করছে তপন ও নৌকা।

কোনো বাক্যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকেই ক্রিয়ার কর্তা বলে। ক্রিয়ার কর্তাকে কর্তৃকারক (বা কর্তা কারক) বলে।

● সমাপিকা ক্রিয়াকে 'কে' প্রশ্ন করলে বা 'কারা' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা কর্তা।

কর্মকারক: '**ওকে** মেরো না'। **জল** দাও—বাক্য দুটির সমাপিকা ক্রিয়াকে 'কাকে' ও 'কী' প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়—ওকে এবং জল। এই পদ দুটির দ্বারা ক্রিয়ার **বিষয়** বোঝায়। ক্রিয়ার বিষয়কে 'কর্ম' বলে। সহজকথায়, কর্তা যা করেন তাই কর্ম।

বাক্যের অন্তর্গত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে ক্রিয়ার বিষয় বা কর্মকে বোঝায় তাকে **কর্মকারক** বলে।

● সমাপিকা ক্রিয়াকে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে 'কর্ম' পাওয়া যায়।

করণকারক: ওরা হাত দিয়ে ভাত মাখে। জবা ট্রেনে যাতায়াত করে। বাক্যদুটিতে 'ভাত মাখা' ও 'যাতায়াত' করা ক্রিয়াদুটি কীসের সাহায্যে সম্পন্ন হচ্ছে, তার উত্তরে জানা যায়— 'হাত দিয়ে', 'ট্রেনে' এই দুটি পদ।

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে 'করণ' বলে।

বাক্যের অন্তর্গত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে ক্রিয়া সম্পাদনের উপায় বোঝায়, তাকে করণকারক বলে।

সমাপিকা ক্রিয়াকে 'কী দিয়ে', 'কীসের সাহায্যে' এই প্রশ্ন করলে 'করণ' পাওয়া যায়।

অপাদান কারক: অফিস থেকে কখন ফিরলেন? তিল থেকে তেল হয়।—বাক্য দুটির ক্রিয়াপদকে 'কোথা থেকে' বা 'কী থেকে' প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, একটি জায়গা বা কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, আলাদা হওয়া।

একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হলে, যেখান থেকে বা যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাকে অপাদান বলে। **বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে এই বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিশ্লিষ্ট হওয়া বোঝায়, তাকে অপাদান কারক বলে।**

'অফিস থেকে' ও 'তিল থেকে' **অপাদান কারক**। যেমন—বন থেকে বেরোল টিয়ে। গাছ থেকে আম পড়ল। রাম দোকান থেকে বাড়ি ফিরছে।

অধিকরণ কারক: ছেলেরা **মাঠে** ফুটবল খেলে। মেয়েরা **সকালে** হাঁটতে যায়। এরা **বিজ্ঞানে** কাঁচা। **বোতলে** জল আছে। এই বাক্যগুলির ক্রিয়া পদগুলিকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়— (১) কোথায় খেলে?—**মাঠে**, (২) কখন হাঁটতে যায়?—**সকালে**, (৩) কোন বিষয়ে কাঁচা?—**বিজ্ঞানে**, (৪) কোথায় জল আছে?—**বোতলে**। উত্তরগুলির দ্বারা (মোটা অক্ষরে দেওয়া) ক্রিয়ার স্থান, কাল, বিষয়, পাত্র বা আধার বোঝাচ্ছে।

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। আধার বলতে—স্থান, কাল, বিষয় ও পাত্রকে বোঝায়। যে স্থান, কাল, বিষয় ও পাত্রে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ক্রিয়ার সেই আধারকে অধিকরণ কারক বলে।

আধার বলতে দেশ বা স্থান, কাল ও বিষয় বোঝায়—এই তিন প্রকার আধার অনুযায়ী অধিকরণ কারকও তিন প্রকার— (১) স্থানাধিকরণ বা দেশাধিকরণ, (২) কালাধিকরণ, (৩) বিষয়াধিকরণ।

● ক্রিয়াকে 'কোথায়' প্রশ্নে স্থানাধিকরণ, 'কখন' প্রশ্নে কালাধিকরণ, 'কীসে বা কোন বিষয়ে' প্রশ্নে বিষয়াধিকরণ জানা যায়।

নিমিত্ত কারক: 'প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি', 'কিসের তরে, অশ্রু ঝরে' 'কার জন্য বসে আছ'?—বাক্য তিনটির ক্রিয়াপদকে কী কারণে, কেন প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়—বুদ্ধের লাগি, কিসের তরে, কারজন্য। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, কোনো কিছুর নিমিত্তে, জন্যে বা কারণে। যেমন—

তোমার জন্য আজ বাড়ি ফিরতে পারলাম না।

মানুষের জন্য কাজ করা উচিত।

সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

যখন কোনো কিছুর নিমিত্তে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন সেই নিমিত্ত বা কারণকে **নিমিত্ত কারক** বলে।

বিভক্তি ও অনুসর্গ

কয়েকটি শব্দ দিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। যা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে শব্দকে পদে পরিণত করে তাকে বলে **বিভক্তি**। শব্দ বিভক্তিযুক্ত না-হলে বাক্যে ব্যবহার করা যাবে না। বিভক্তি-যুক্ত শব্দই পদ। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি নামপদের পরে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে যে বিভক্তি, তা হল—শব্দবিভক্তি এবং ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় যে বিভক্তি, তা ধাতু বিভক্তি বা ক্রিয়া বিভক্তি।

'লোক' শব্দটিকে বাক্যে বিভিন্নরূপে দেখা যায়—লোকে, লোকেরা, লোককে, লোকের, লোকেতে, লোকদের প্রভৃতি। এখানে লোকশব্দের সঙ্গে 'এ', 'এরা', 'কে', 'এর', 'এতে' এগুলি হল বিভক্তি। বিভক্তির কোনো অর্থ নেই, এরা শব্দই নয়।

বাংলায় ব্যবহৃত সব পদই বিভক্তিযুক্ত হয় না, বিভক্তির সংখ্যা বাংলায় কম, তাই বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় বাক্যে পদের সঙ্গে বিভক্তি লক্ষ করা যায় না। যেমন— 'অসিত গান গায়'—বাক্যে 'অসিত' ও 'গান' দুটি শব্দেই বিভক্তি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাক্যে যখন ব্যবহৃত, তখন বিভক্তি থাকবেই। বিভক্তি আছে, তা অদৃশ্য—তাই বলা হয় শূন্যবিভক্তি।

তাহলে, **যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে নামপদে পরিণত করে এবং বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা দান করে, তাকে 'বিভক্তি' বলে।**

একবচন ও বহুবচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়:

একবচন	**বহুবচন**
এ, কে, রে, এরে, তে, য়েতে, এতে, র, এর, কার	রা, এরা, এদের, এদেরকে, দেরকে, দিগকে দিগের

অনুসর্গ ঃ যেসব অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে আলাদাভাবে বসে বিভক্তির কাজ করে, তাদের অনুসর্গ বলে। যেমন,—**তোমার দ্বারা** কোনো কাজ হবে না। **রাম কর্তৃক** রাবণ নিহত হলেন। বাক্যদুটিতে দ্বারা ও কর্তৃক অনুসর্গ।

বিভিন্ন কারকে বিভক্তি ও অনুসর্গ:

কর্তৃকারকে: কর্তৃকারকে সাধারণত বিভক্তি অদৃশ্য থাকে, শূন্য বিভক্তি বলা হয়।

'এ' বিভক্তি:	ছাগলে কী না খায়।
'য়' বিভক্তি:	রাজায় রাজায় যুদ্ধ।
'তে' বিভক্তি:	তোমাতে-আমাতে আজ বোঝাপড়া।
'র' এর বিভক্তি:	মৌমাছির মধুসঞ্চয় পরের জন্য।
অনুসর্গ:	ছাগল দিয়ে চাষ। চামচ দিয়ে ভাত খাও। রাম কর্তৃক রাবণের নিধন।

কর্মকারকে: কর্মকারকে সাধারণত কে, রে, দের, য় বিভক্তি হয়।

'কে, রে' বিভক্তি:	রেখো মা দাসেরে মনে। আমাকে দাও।
'দের' বিভক্তি:	ছাত্রদের বইগুলি দাও, আপনাদের ডাকছি।
'য়' বিভক্তি:	তোমায় কেউ বিশ্বাস করে না।
'এ' বিভক্তি:	পুলিশে খবর দাও।

কর্মকারকে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় না।

করণকারকে: করণকারকে এ, য়, তে বিভক্তি এবং দ্বারা, দিয়া, দিয়ে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

‘এ’ বিভক্তি: নবীণ ধান্যে হবে নবান্ন।

‘তে, য়’ বিভক্তি: টাকায় কী না হয়! টাকাতে বাঘের দুধ মেলে।

‘এর’ বিভক্তি: বড়বাবুর কলমের খোঁচায় তার চাকরি গেল।

অনুসর্গ:

দ্বারা: তোমার দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

দিয়া, দিয়ে: ডালপালা দিয়ে পথ আটকানো ছিল। ওকে দিয়ে একাজ হবে না।

অপাদান কারক:

‘এ’ বিভক্তি: তিলে তেল হয়।

‘য়’ বিভক্তি: ছাতায় এখনো জল ঝরছে।

‘কে’ বিভক্তি: চোরকে ভয় নাই।

‘তে’ বিভক্তি: সমুদ্রতে রত্ন পাওয়া যায়।

‘এর’ বিভক্তি: যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।

অনুসর্গ:

দিয়ে: মুখ দিয়ে লালা ঝরে

থেকে: চোখ থেকে জল পড়ে। গাছ থেকে ফুল পড়ে।

হতে: সকাল হতে বৃষ্টি পড়ছে।

চেয়ে: ইহার চেয়ে হতেন যদি আরব বেদুইন।

অপেক্ষা: যদু অপেক্ষা মধু বেশি চালাক।

অধিকরণ কারক:

‘শূন্য’ বিভক্তি: কাল বাড়ি থাকবি?

‘এ’ বিভক্তি: বান এসেছে মরা গাঙে। ঘরে কেউ আছেন?

‘তে’ বিভক্তি: “বিমলাতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল না।”

‘য়’ বিভক্তি: সকালবেলায় ঘাসের আগায়।

‘কে’ বিভক্তি: বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।

অনুসর্গ:

করে: আপনার আদেশ মাথায় করে নেব।

দিয়ে: এই পথ দিয়ে বাস যায় না।

নিমিত্ত কারক: নিমিত্তকারকে জন্য, লাগি, তরে, লাগিয়া প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহার হয়। বিভক্তি নেই।

'জন্য': তোমার জন্য বসে আছি।

'লাগি' : প্রভু বুদ্ধ লাগি।

'লাগিয়া' : তোমার লাগিয়া।

'তরে' : কিসের তরে অশ্রু ঝরে

সম্বন্ধ পদ: কারক ছাড়াও সম্বন্ধ পদেও বিভক্তির ব্যবহার হয়—র, এর, দের দিগের প্রভৃতি।

'এর' বিভক্তি: বনের হরিণ।

'র' বিভক্তি: মুখ্যমন্ত্রীর সফর আজ শেষ।

'দের' বিভক্তি: তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

১৫.৪ সারসংক্ষেপ

বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য, সর্বনাম পদের সম্পর্ককে কারক বলে। ক্রিয়াপদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে অন্যান্য পদের সঙ্গে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকেই কারক বলি।

আমরা উদাহরণের সাহায্যে বাংলার বিভিন্ন কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

একক ১৬ ❑ বাক্যগঠন

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ বাক্যগঠন

১৬.৩ বাক্য নির্মাণের শর্ত

১৬.৪ বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ

১৬.৫ সারসংক্ষেপ

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করব-

- বাক্যের সংজ্ঞা
- বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্য
- বাক্যগঠনের শর্ত
- গঠনগত বিচারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

১৬.২ বাক্যগঠন

কয়েকটি শব্দ মিলে বক্তার মনের কোনো ভাব স্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করলে, সেই শব্দসমষ্টিকে বাক্য বলে। তবে এই শব্দগুলির মধ্যে একটি ক্রিয়া ও একটি কর্তা থাকতে হবে। আর শব্দগুলিকেও একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সাজাতে হবে।

দেখতে আমরা আজ নাটক যাব—এই এলোমেলো ভাবে বসানো শব্দগুলির দ্বারা কোনো স্পষ্ট অর্থ বা ভাব বোঝানো হচ্ছে না। কিন্তু যদি লেখা হয়—**আজ আমরা নাটক দেখতে যাব**। তাহলে একটা অর্থ বোঝা যায়।

উপরের বাক্যে দুটি বিষয় দেখা যাচ্ছে—(১) কর্তা আছে—যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হচ্ছে, (২) উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে।

বাক্যের দুটি অংশ থাকে। একটি উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়। যাকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য করে বা যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকেই বলে বাক্যের উদ্দেশ্য। বাক্যে ক্রিয়ার কর্তাই উদ্দেশ্য। ক্রিয়াকে ‘কে’ বা ‘কারা’ প্রশ্নের উত্তরে উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে।

বাক্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় বা যা বিধান করা হয়, তাকে বলে বাক্যের বিধেয়। 'আমরা নাটক দেখতে যাব'—বাক্যে উদ্দেশ্য হল—আমরা, বিধেয় হল—নাটক দেখতে যাব।

উদ্দেশ্য অংশ বা বিধেয় অংশ উভয়কেই সম্প্রসারণ করা যায়। একটি উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক :

উদ্দেশ্য	**বিধেয়**
রবীন্দ্রনাথ	নোবেল পুরস্কার পান
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান
সরস্বতীর বরপুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান

উদাহরণে মূল উদ্দেশ্য 'রবীন্দ্রনাথ'। দ্বিতীয় বাক্যে একটি ও তৃতীয় বাক্যে তিনটি শব্দ যোগ করে 'উদ্দেশ্য'-র সম্প্রসারণ হয়েছে। মূলবিধেয় 'নোবেল পুরস্কার পান' দ্বিতীয় বাক্যে তিনটি শব্দ ও তৃতীয় বাক্যে ছয়টি শব্দ যোগ করে সম্প্রসারণ ঘটনা হয়েছে।

আমাদের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও ক্রিয়া থাকতেই হবে। কর্তাকে উদ্দেশ করে তার সম্পর্কে কিছু বলা হয় একটি বাক্যে। বাক্যের দুটি ভাগ উদ্দেশ্য ও বিধেয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুটি অংশকেই সম্প্রসারিত করা যায়।

১৬.৩ বাক্য নির্মাণের শর্ত: [যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি]

আমরা বাক্যের গঠন সম্পর্কিত আলোচনায় দেখলাম বাক্যের উদ্দেশ্য, বিধেয়, কর্তা-ক্রিয়ার গুরুত্ব। কিন্তু উদ্দেশ্য, বিধেয়, কর্তা, ক্রিয়া থাকলেই বাক্য সার্থক, একথা বলা যাবে না—অন্য কিছু শর্ত আছে বাক্যের সার্থকতায়।

- যদি লিখি: "মোর না খাঁচায় সোনার রইল দিনগুলি"—পাশাপাশি শব্দগুলি বসিয়ে কোনো ভাব স্পষ্ট হল না। কিন্তু শব্দগুলি যদি একটু সাজিয়ে নিয়ে লিখি—"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।" তাহলে একটা অর্থ ও ভাব স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়।
- আবার যদি লিখি—"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়"—তাহলে ভাব বা বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শ্রোতা অপেক্ষা করে থাকে আরো কিছু শোনার জন্য, অর্থাৎ বক্তার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয়নি।
- আবার কেউ যদি বলে—'এরোপ্লেন ভাজা দিয়ে ভাত খাব"—অথবা 'ঘোড়াগুলি ডিমে তা দিচ্ছে'— তাহলে এগুলিকে প্রলাপ বলে মনে হবে; কারণ বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি ও সম্ভাব্যতা নেই। ঘোড়া ডিম পাড়ে না, তাই তা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এরোপ্লেন ভাজা দিয়ে ভাত খাওয়া

অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যে এদের বাক্য বলা যায় না। যদিও এর ক্রিয়া, কর্তা উদ্দেশ্য বিধেয় আছে।

উপরের আলোচনার সূত্রে বলা যায়, কতকগুলি শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই তা বাক্য হয় না—বাক্যগঠনের কিছু শর্ত আছে। সেগুলি হল—(১) যোগ্যতা, (২) আকাঙ্ক্ষা, (৩) আসত্তি। তিনটি শর্তের সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যাক।

১. যোগ্যতা: বাক্য নির্মাণের ক্ষেত্রে বাক্যের বক্তব্য বা অর্থ বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সম্ভাব্যতা ও সুযুক্তির অনুসারী হবে এবং বাক্যের পদগুলির পরস্পরের মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত সঙ্গতি ও মিল থাকবে। বাক্য নির্মাণের এই শর্তকে বলা হয় যোগ্যতা (Compatibility or Propriety)।

যেমন—'গরু ঘাস খায়'—এটির বাক্য হিসাবে যোগ্যতা আছে। এখানে গরুর ঘাস খাওয়া সম্ভব। তিনটি পদের মধ্যে সঙ্গতিও আছে। কিন্তু যদি বলা যায়—'গরু কমপিউটার চালাচ্ছে' কথাটির মধ্যে সম্ভাব্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তাই বাক্য হিসাবে এর যোগ্যতা নেই, যদিও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আছে।

২. আকাঙ্ক্ষা: বক্তার বক্তব্য বা ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্য শ্রোতার গ্রহণ করার জন্য। তাই শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা পূরণ করা প্রয়োজন। বক্তার বক্তব্য সম্পূর্ণ হওয়ার আগে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। তাই বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে হবে। বাক্যের সম্পূর্ণতা সাধনের এই শব্দকে আকাঙ্ক্ষা (Expectancy) বলা হয়।

যেমন—'খেলোয়াড়রা ফুটবল নিয়ে'— এটুকু বললেই বক্তব্য শেষ হয় না। খেলোয়াড়দের ফুটবল নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা থাকলেও বাক্যটি সার্থক নয়। শ্রোতা অপেক্ষা করবে, ফুটবল নিয়ে খেলোয়াড়রা কী করল জানার জন্য। 'মাঠে নেমে পড়ল' কথাগুলি ঐ অসমাপ্ত বাক্যের সঙ্গে যোগ করতে হবে, শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য।

৩. আসত্তি: বাক্যের অর্থবোধের জন্য পদগুলিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পরস্পরের মধ্যে অর্থগত সঙ্গতি বা সম্পর্কযুক্ত পদগুলি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পরপর ব্যবহৃত হয়—একে বলে নৈকট্য বা আসত্তি (Proximity)।

যেমন—'আমি গতকাল বাড়ি থেকে ফিরেছি' বাক্যের পদগুলি যদি এইভাবে সাজানো হয়— 'থেকে ফিরেছি বাড়ি গতকাল আমি' তাহলে পদগুলির আসত্তি রক্ষিত হল না তার ফলে বাক্যটি সার্থক হল না। আসত্তি রক্ষার জন্য ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পদগুলির সঙ্গতি রক্ষা করা প্রয়োজন— ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তা বা পুরুষের বা অন্যপদের সঙ্গতি থাকতে হবে।

১৬.৪ বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ:

গঠনগত বিচারে বাক্য তিন ধরনের—(১) সরল বাক্য (Simle), (২) জটিলবাক্য (Complex), ও (৩) যৌগিক বাক্য (Compound)।

১. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরলবাক্য বলে। বাক্যগঠনের নিয়মানুসারে একটি বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও কর্তা থাকবে। 'দাদা কলকাতা যাবে' বাক্যে কর্তা দাদা, সমাপিকা ক্রিয়া যাবে, দুটিই আছে তাই এটি বাক্য এবং সরল বাক্য। উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের প্রসার এখানে লক্ষণীয়।

২. জটিল বাক্য: 'তিনি কলকাতা যাবেন' বাক্যটিতে কর্তা, ক্রিয়া, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা সবই আছে তাই এটি একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণবাক্য। কিন্তু 'যদি ছুটি পান তাহলে কলকাতা যাবেন' এখানে 'তিনি কলকাতা যাবেন' সম্পূর্ণ স্বাধীন বাক্যের সঙ্গে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য যোগ করা হয়েছে। 'যদি ছুটি পান' অসম্পূর্ণ বাক্য। এর দ্বারা বক্তার বক্তব্য সম্পূর্ণ হচ্ছে না, তাই অন্য অংশটির উপর তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বাক্যটির দুটি অংশের একটি অংশ সম্পূর্ণ, অন্যটি খণ্ড এবং নির্ভরশীল। এই অন্যের উপর নির্ভরশীল বাক্যকে অধীন খণ্ডবাক্য বলে।

একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য নিয়ে গঠিত বৃহত্তর বাক্যকে জটিলবাক্য বলে। জটিল বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া একটিই থাকে এবং সেটি থাকে প্রধান খণ্ডবাক্যে।

উদাহরণ: (তলায় দাগ দেওয়া অংশ অপ্রধান বা অধীন খণ্ডবাক্য, বাকি অংশটি প্রধান খণ্ড বাক্য।)

- যদি মন দিয়ে পড় তাহলে পাস করবে।
- তুমি যদি না খাও, তবে আমিও খাব না।

৩. যৌগিক বাক্য: 'কাল ছুটির অনুমোদন আসবে এবং দাদা কলকাতা যাবেন', এখানে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ একটি বাক্য যার দুটি অংশ 'এবং' অব্যয় দিয়ে যুক্ত। দুটি বাক্যই স্বাধীন। দুটি সরল বাক্যের যোগে একটি বড় বাক্য তৈরি হয়েছে।

দুই বা দুইয়ের অধিক স্বাধীন বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘতর বাক্য গঠন করলে, সেই দীর্ঘতর বাক্যকে যৌগিক বাক্য বলে। দুটি সরলবাক্য মিলে একটি যৌগিক বাক্য হতে পারে, একটি সরল, একটি জটিল মিলে যৌগিক বাক্য হতে পারে। অনেক সময় সংযোজক অব্যয় অনুপস্থিত থাকে। যেমন—'আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম।' বাক্যটিকে সংযোজক অব্যয় নেই। তিনটি সরলবাক্য 'কমা' দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৬.৫ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাক্য গঠনের বিভিন্ন আঙ্গিক, গঠনগত বৈশিষ্ট্য থেকে গঠনগত শ্রেণিবিভাজন, বাক্য নির্মাণের শর্ত সম্পর্কে জ্ঞন লাভ করতে পারবে।

একক ১৭ ❑ বাংলা বানান

গঠন

১৭.১ উদ্দেশ্য

১৭.২ বাংলা বানান

১৭.৩ বানান: তৎসম শব্দ

১৭.৪ বানান: অ- তৎসম শব্দ

১৭.৫ সারসংক্ষেপ

১৭.১ উদ্দেশ্য

ভাষা সচল, পরিবর্তনশীল। ভাষা পরিবর্তনের ধারায় বাংলা বানানের পরিবর্তন, পরিমার্জনা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এই এককে আমরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করব-

- বানান পরিবর্তনের স্বরূপ
- বানান সংস্কার সম্পর্কে বিদ্বজনদের মতামত
- বানানের বিভিন্ন নিয়ম
- তৎসম ও অ-তৎসম শব্দ অনুসারে বাংলা বানানের স্বরূপ

১৭.২ বাংলা বানান

এই এককে আমরা ভাষার উৎপত্তি, ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস, ভাষা বিবর্তনের দারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

ভাষা মুখে উচ্চারিত হয় কিন্তু সেই ভাষাকে ভবিষ্যতের জন্য বা জনান্তরে প্রকাশের জন্য লিখে রাখার প্রয়োজন হয়, আর সেখানেই প্রয়োজন হয় লিপি ও বানানের। ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে বানানেরও পরিমার্জনের বা সংস্কারের প্রয়োজন হয়। নানান কারণে কিছুদিন অন্তর বানানের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বানানের সর্বজনগ্রাহ্যতা না থাকলে বক্তব্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে যথাযথভাবে গৃহীত হয়। যাইহোক, শুদ্ধ ও সর্বজনবোধ্য বানানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাই মাঝে মাঝে বানান-সংস্কারের প্রয়োজন হয়। একই শব্দের একাধিক বানান পাঠকের কাছে বিভ্রান্তিকর—অর্ধবোধও বিঘ্নিত হতে পারে। তাই বানান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর

উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানও সবসময় গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ব্যক্তিবিশেষে উচ্চারণের পার্থক্য ঘটতে পারে। প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের ক্ষেত্রেও জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন, 'স্বীকার' ও 'শিকার' শব্দদ্বয়ের উচ্চারণ বাংলায় এক, কিন্তু অর্থ আলাদা।

শুদ্ধ বানান লেখার জন্য অভিধানের বা শব্দকোষের সমস্ত বানান মুখস্থ করা সম্ভব নয়, বা অভিধান খুঁজে খুঁজে বানান দেখে লেখাও সম্ভব নয়। তবে শব্দগঠনের নিয়ম বা কৌশল সম্পর্কে ধারণা থাকলে শুদ্ধ বানান লেখা সম্ভব হয়। বানানভুল মূলত (১) সন্ধিঘটিত, (২) পদান্তর ঘটিত, (৩) ণত্ব-ষত্ব, ঘটিত হ্রস্ব-দীর্ঘ (ই,ঈ,উ,ঊ-কার) ঘটিত কারণে হয়ে থাকে। এই নিয়মগুলি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হলে বানানের অশুদ্ধি এড়ানো যাবে।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে বানানের বিভিন্নতা নিয়ে বিদগ্ধমহলে বেশ আলোড়ন ওঠে, বানানের সমতা আনার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সেই সমিতি বিভিন্ন বিদগ্ধব্যক্তির পরামর্শ ও মতামতের মাধ্যমে বানান সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেন (৮ মে, ১৯৩৬)। তারপর বিভিন্ন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০ মে ১৯৩৭ উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ তৃতীয় সংকরণ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, এই নতুন বিধি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রশ্নপত্রাদি মুদ্রিত হবে। কিছুদিন পুরাতন বানানও চালু থাকবে।

তারপর দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী বাংলা বানান নিয়ে আবার সমস্যা তৈরি হয় এবং ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে বানান সম্পর্কিত নতুন বিধানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী বানান-বিধির উদ্দেশ্য ছিল বানান সরলীকরণ এবং বিভিন্ন বানানের মধ্যে সমতা রক্ষণ; বাংলা আকাদেমিরও লক্ষ্য বানান সরলীকরণ ও সমতা রক্ষা। নতুন বানান-বিধিতে শব্দগুলিকে তৎসম এবং অতৎসম ও দেশি-বিদেশি শব্দ এই দু'ভাগে ভাগ করে নিয়মগুলি আলোচিত। আমাদের আলোচনায় প্রথমেই তৎসম শব্দগুলির বানান সম্পর্কে অবহিত হবার চেষ্টা করব।

১৭.৩ বানান : তৎসম শব্দ

বাংলায় তৎসম বা সংস্কৃত থেকে সরাসরি আগত শব্দগুলির বানান সংস্কৃতের মতই থাকবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। যেমন ঃ

১. ই-কার/ঈ-কার ও উ-কার/ঊ-কারের ক্ষেত্রে:

যেসব বানানে ই-কার, উ-কারের বিকল্পে ঈ-কার, ঊ-কার দুইই সংস্কৃত প্রচলিত, সে-সব ক্ষেত্রে বাংলায় শুধু ই, উ বা ই-কার, উ-কার-ই ব্যবহৃত হবে। যেমন : অঙ্গুরি/অঙ্গুরী, অঙ্গুলি/অঙ্গুলী, কুটির/কুটীর, উষা/ঊষা-র ক্ষেত্রে যথাক্রমে অঙ্গুরি, অঙ্গুলি, কুটির, উষা বানানই লেখা হবে।

এইরকম আরো কিছু শব্দ—অবনি, আবলি, আবির, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধরণি, ধমনি, গাগরি, সরণি, সুরভি, যুবতি প্রভৃতি।

২. ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ:

- সংস্কৃতে ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের কর্তৃকারকের একবচনে যেখানে দীর্ঘ ঈ-কার হয় সেখানে তাই থাকবে। যেমন, গুণিন্ > গুনী, ধনিন্ > ধনী, আততায়িন্ > আততায়ী, অধিকারিন্ > অধিকারী, বিদ্রোহিন্ > বিদ্রোহী প্রভৃতি।
- কিন্তু ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি কিছু ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ হলে দীর্ঘ-ঈ হ্রস্ব হয়ে যায়। যেমন মন্ত্রী + গণ = মন্ত্রিগণ, প্রাণী + বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা। বাংলায় এই জটিলতা থাকবে না, সমাসবদ্ধ হলেও ঈ-কারই থাকবে— মন্ত্রীগণ, আগামীকাল, পরবর্তীকাল, প্রাণীবিদ্যা, হস্তীদল প্রভৃতি।
- তবে উক্ত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে সেখানে ই-কার বজায় থাকবে। যেমন, প্রতিযোগী > প্রতিযোগিতা, উপযোগী > উপযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহযোগিতা, মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি।

৩. বিসর্গের ব্যবহার:

- সংস্কৃত শব্দের অন্তে বা শেষে যে বিসর্গ আছে বাংলায় তা থাকবে না। যেমন, ক্রমশঃ > ক্রমশ, অন্ততঃ > অন্তত। এইরকম—ফলত, অহরহ, প্রায়শ, ইতস্তত, মুহুর্মুহু, প্রথমত, দ্বিতীয়ত প্রভৃতি।
- তবে পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। যেমন, অন্তঃকরণ, অতঃপর, মনঃপূত প্রভৃতি।
- বিসর্গ-জাত ও-কার যেমন সংস্কৃতে আছে তেমনই থাকবে—অকুতোভয়, ততোধিক, বয়োজ্যেষ্ঠ, মনোযোগ, মনোরঞ্জন, মনোমোহন, মনোরম প্রভৃতি।
- ছন্দ (> ছন্দঃ) শব্দটিকে বাংলা শব্দ ধরে নিয়ে বাংলায় ছন্দগুরু, ছন্দবিজ্ঞান, ছন্দলিপি, ছন্দশাস্ত্র ব্যবহৃত হবে।
- দুঃস্থ, নিঃস্তব্ধ, নিঃস্পৃহ, বয়ঃস্থ, মনঃস্থ শব্দগুলিতে বিসর্গ থাকবে না। তবে 'অন্তঃস্থ' শব্দটির বিসর্গ থাকবে।

৪. হস্ চিহ্ন বর্জন:

- আশিস, দিক, ধিক, পৃথক, পরিষদ, বণিক, বিপদ, বিরাট প্রভৃতি শব্দে 'হস্' চিহ্ন থাকবে না।
- মতুপ (মান), বতুপ (বান), শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'হস্' চিহ্ন থাকবে না। যেমন—শ্রীমান, শক্তিমান, রুচিমান, ধাবমান, জ্ঞানবান ধনবান, ভগবান ইত্যাদি।

৫. 'রেফ্'-এর সঙ্গে দ্বিত্ব হবে না। কৰ্ম্ম > কর্ম, গৰ্ব্ব > গর্ব, চর্চ্চা > চর্চা এই রকম—অর্চনা, অর্জন, আর্য, সূর্য, ঊর্ধ্ব, বর্জন প্রভৃতি।

৬. **'ঙ' এবং 'ং'-এর ব্যবহার:**

- নিম্নোক্ত শব্দে 'ং' ব্যবহার করা হবে:

  অলংকার, অহংকার, ভয়ংকর, সংগত, সংগীত, প্রিয়ংবদা, সংবাদ, সংবর্ধনা প্রভৃতি।

- নিম্নোক্ত শব্দে 'ঙ্ক' ব্যবহৃত হবে:

  অঙ্কুশ, আতঙ্ক, কঙ্কাল, পঙ্ক, বঙ্কিম, অঙ্ক প্রভৃতি।

৭. **ণত্ববিধি ও ষত্ববিধি ('ণ' ও 'ষ'-এর ব্যবহার):**

'ন' ও 'ণ' এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি 'ণত্ববিধি' এবং ষ, স, হ-এর ব্যবহার সংক্রান্তবিধি 'ষত্ববিধি'। এই দুটিই মূলত সংস্কৃতের। অ-তৎসম শব্দে এই বিধি প্রযোজ্য নয়। যেহেতু বাংলায় প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় তাই এই বিধি সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

❑ **ণত্ব-বিধি:**

- ঋ, র, ষ-এর পর সবসময়ই 'ণ' হয়। যেমন—উষ্ণ, কৃষ্ণ, ঘৃণা, কর্ণ, তৃণ, স্বর্ণ, বর্ণ, পূর্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি।
- কোনো শব্দে ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, খ-বর্গ, য, ব, হ, ং থাকলে তারপরে 'ন' হয় না, 'ণ' হয়। যেমন—গ্রহণ (র + হ), কৃপণ, দর্পণ, নির্বাণ, শ্রবণ, হরিণ, লক্ষণ (ক্ + ষ্ + অ্ + ণ), রাবণ, রোপণ, প্রয়াণ, অবতরণ, ব্রাহ্মণ, ভীষণ প্রভৃতি।

  কিন্তু ঋ, র, ষ-এর পর অন্য বর্ণ থাকলে, তার পরের 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না, 'ন'-ই থাকে। যেমন—'দর্শন' (এখানে দ + র্ + শ + ন অর্থাৎ 'র' এবং 'ন' এর মাঝে 'শ' আছে তাই 'ণ' হল না)। এইরকম—প্রার্থনা, মর্দন, নর্তন, রচনা, নর্তন, বর্তন প্রভৃতি।

- আবার, যখন দুটি পদ মিলে একটি পদ হয়, তখন পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকলে পরপদের 'ন', ন-ই থাকে।

  যেমন—হরিনাম, সর্বনাম, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, চারুনেত্রা প্রভৃতি। তবে ব্যতিক্রম—অগ্রহায়ণ ও সূর্পণখা—এখানে পরপদের 'ন' মূর্ধন্য হয়ে গেল।

- র-ফলা থাকলেও শ্রীমান্ এবং ব্রহ্মান্-এ 'ন'-ই হবে।
- ট-বর্গের সঙ্গে যুক্ত হলে 'ণ' হয়। যেমন—কণ্টক, বন্টন, অবগুণ্ঠন, লুণ্ঠন, কাণ্ড, খণ্ড, গণ্ড, চণ্ড, দণ্ড, ভণ্ড, মুণ্ড প্রভৃতি।

- প্র, পরা, পরি, নির এই চারটি উপসর্গ ও অন্তর শব্দের পর নম্, নশ্, নী, নু, অন্, হন্ প্রভৃতি ধাতুর 'ন' মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন—প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ, প্রণয়, পরিণয়, প্রাণ, প্রহণন প্রভৃতি।
- প্র, পরি প্রভৃতির পর 'নি' উপসর্গ থাকলেতা 'ণি' হয়। যেমন—প্রণিপাত, প্রণিধান প্রভৃতি।
- 'অহ্ন' শব্দে (হ্ + ন) দন্ত্য-'ন' হয় : মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক। কিন্তু তার আগে প্র, পরা, অপর যুক্ত হলে 'ন' মূর্ধন্য হয় (হ্ + ণ্ = হ্ণ) যেমন, প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ প্রভৃতি।
- **নিম্নোক্ত শব্দগুলিতে সবসময়েই 'ণ' হয়:**

  গণ, গুণ, শণ, বাণ, বিপণি, চিক্কণ।

  অণু, কণ, কোণ, শণ, বণিক, কঙ্কণ।।

  লাবণ্য, শোণিতবাণী, কল্যাণ, নিপুণ।

  বাণিজ্য, কণিকা, পুণ্য, ফণী, ফণা, ঘুণ।।

  পাণি, মণি, তৃণ, পণ, আপণ, লবণ।

  গণ, গৌণ, বেণী, বীণা, পণ্য, বেণু, কোণ।।

  নিক্কণ, গণিকা, কণ্ব, চণক, চাণক্য।

  স্থাণু, স্থূণা, মণ, কাণ, তূণীর, মাণিক্য।।
- **এই শব্দগুলিতে সর্বদাই 'ন' হয় ঃ** আপন (নিজ), গগন, কেন, ফাল্গুন প্রভৃতি।
- **অ-তৎসম শব্দে সর্বদা 'ন' হয়।**

  যেমন—অঘ্রান, কোনাকুনি, আন্‌ডা, সোনা, নাবিক, ইরান, কোরান, কার্নিশ, গভর্নর, ট্রেন, পরগনা, বায়রন, কন্ট্রোলার, লণ্ঠন, লন্ডন প্রভৃতি।

❑ **ষত্ব-বিধি:**

- **ঋ-কারের পর 'ষ' হয়:**

  যেমন—ঋষি, ঋষভ, বৃষভ, তৃষ্ণা, বৃষ্টি, ধৃষ্ট, পৃষ্ঠ প্রভৃতি।
- ক্, র্ এবং অ, আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পর 'ষ' হয়।

  যেমন— কল্যাণীয়েষু, মাননীয়েষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, স্নেহভাজনেষু, মুমূর্ষু, মুমুক্ষু প্রভৃতি।

  কিন্তু, কল্যাণীয়াসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু, মাননীয়াসু—এইগুলিতে 'স'-এর আগে 'আ' স্বরধ্বনি থাকার জন্য

'ষ' হল না।

- 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' সবসময়েই 'স' থাকে।

  যেমন— ভূমিসাৎ, ভস্মসাৎ, ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ প্রভৃতি

- উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পর কিছু ধাতুর 'স' 'ষ' হয়:

  যেমন --- অভি-সেক > অভিষেক, অধি-স্থান > অধিষ্ঠান, অনু-স্থান > অনুষ্ঠান, প্রতি-স্থিত > প্রতিষ্ঠিত, প্রতি-স্থান > প্রতিষ্ঠান, নি-সিদ্ধ > নিষিদ্ধ, নি-স্নাত > নিষ্ণাত প্রভৃতি।

  <u>কিন্তু,</u> অনুসন্ধান, অনুস্বার, অনুসর্গ, বিসর্গ এগুলিতে 'ষ' হয় না।

- পূর্বপদের শেষে 'ই', 'উ', 'ঋ' এবং 'ও' থাকলে এবং পরপদের প্রথমে 'স' থাকলে দুটি পদের একপদে পরিণত হওয়ার সময় 'স' মূর্ধণ্য-ষ হয়ে যায়।

  যেমন—যুধি + স্থির > যুধিষ্ঠির, সু + স্থ > সুষ্ঠ, গো + স্থ > গোষ্ঠ, বি-সম >বিষম, সু-সম > সুষম, পিতৃ + স্বসা > পিতৃষ্বসা, সু + সেন > সুষেণ প্রভৃতি।

- **ট-বর্গের সঙ্গে যুক্ত হলে 'স', 'ষ' হয়ে যায়:**

  যেমন—কষ্ঠ, রুষ্ট, গোষ্ঠ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি।

- **বাংলায় ব্যবহৃত কিছু শব্দে সর্বদাই 'ষ' হয়:**

  দূষণ, ঔষধ, ভূষা, বিষাণ, ভাষণ।

  আষাঢ়, মূষিক, বর্ষা, ওষধি, পোষণ।।

  প্রত্যুষ, ঈষৎ, শেষ, ভীষ্ম, ষড়ানন।

  মহিষ, বিশেষ, মেষ, পৌষ, বিশেষণ।।

  পাষাণ, কষায়, বাষ্প, সষ্প, প্রদোষ।

  প্রহর্ষ, নিকষ, শ্লেষ, বৃষ, তৃষ্ণা, রোষ।।

- **বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসির নিম্নোক্ত শব্দগুলিতে 'স' ব্যবহৃত হয়:**

  ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, তসবির, সুলতান প্রভৃতি।

  কিন্তু অন্য শব্দগুলিতে 'শ' হবে। যেমন—আপশোশ, আয়েশ, উশুল, তপশিল, তপশিলি, তহশিল, পোশাক, শং, বকশিশ, বালিশ প্রভৃতি।

- **নিম্নোক্ত ইংরাজি শব্দগুলিতে 'শ' হবে:**

  পুলিশ, নোটিশ, শয়তান, শ্যুটিং, মেশিন, রাবিশ প্রভৃতি।

- **'S' উচ্চারণযুক্ত শব্দে 'স' হবে:**

  যেমন—নার্স, মেস, বাস, জুস, সুটকেস প্রভৃতি।

- **'St' দিয়ে লেখা শব্দে 'স্ট' হবে:**

  যেমন—স্টেশন, স্টপ, মাস্টার, পোস্ট-অফিস, রেস্টুরেন্ট, ব্যারিস্টার প্রভৃতি।

- তৎসম শব্দে যেখানে শ ষ স বিকল্পে ব্যবহৃত সেখানে 'শ'-ই গ্রহণ করা হবে। যেমন, কিশলয়, শায়ক প্রভৃতি।

- অ-তৎসম শব্দে প্রচলন অনুযায়ী শ, ষ, স তিনটিই ব্যবহৃত হবে :

  যেমন—মাসি, পিসি, ষাঁড়, মোষ প্রভৃতি।

১৭.৪ বানান: অ-তৎসম শব্দ

❑ **ই-কার/ঈ-কার:**

অ-তৎসম শব্দে ঈ-কারকে বর্জন করার কথাই বলা হয়েছে। তাই বাংলায় যেখানে বিকল্পে ঈ-কার ছিল, তা বর্জিত হবে। যেমন—কুমির, চাঁদনি, পাখি, দিঘি, পশমি, নিচু, বাঁশি, বাড়ি, সুপারি, হিরে প্রভৃতি।

- **জীবিকা, ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় জাতি বোঝাতে ই-কার ব্যবহৃত হবে:**

  যেমন—ওকালতি, ডাক্তারি, মাস্টারি, পণ্ডিতি, হাকিমি, ফকিরি, আরবি, ফারসি, ইংরাজি, গুজরাতি, মৈথিলি, হিন্দি, কংগ্রেসি, আকালি, ঝাড়খণ্ডি, জাপানি, ইরাকি, ইরানি, কাবুলি, বাঙালি, পাকিস্তানি, বিদেশি, পশ্চিমি, দেশি, আসামি, খানদানি, গোলামি, চালাকি, জালিয়াতি।

- কিন্তু যে-সব অ-তৎসম শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, সেখানে সেই প্রত্যয় অনুসারী ই-কার থাকবে। যেমন—অস্ট্রেলীয়, ইউরোপীয় (ইউরোপ + ঈয়), এশীয়, সাইবেরীয় প্রভৃতি।

❑ **উ-কার/ঊ-কার:**

ই-কারের মত এখানেও উ-কার ব্যবহৃত হবে। তদ্ভব শব্দে মূলের ঊ-কারের পরিবর্তে উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন—ধুলো, পুজো, চুন, পুব, উনিশ প্রভৃতি।

- তবে তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হলে সেখানে মূলের ঊ-কার বজায় থাকবে। যেমন—ধূর্তামি, মূর্খামি, পূজারি প্রভৃতি।

- **শব্দান্তে ও-কার:**
  - নিম্নোক্ত শব্দগুলির অন্তে ও-কার থাকবে। যেমন—কালো, খাটো, ছোটো, বড়ো, এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো। কিন্তু এত, কত, তত, যত শব্দে ও-কার থাকবে না।
  - কোন্, কোন, কোনো শব্দগুলির প্রশ্নবাচক 'কোন' শব্দ থাকবে এবং অনিশ্চয়তাসূচক অব্যয় হিসাবে কোনো/কোনও ব্যবহৃত হবে।
  - আদি অক্ষরে 'অ' যুক্ত মূল শব্দে 'উয়া' প্রত্যয় যোগ করে যে রূপ পাওয়া যায়, সেই প্রত্যয়জাত শব্দে দুটি 'ও' হবে :

    যেমন— জল + উয়া > জলুআ > জোলো। তেমনই পোড়ো, পোটো খোড়ো প্রভৃতি
  - 'লো' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শেষে 'ও'-কার থাকবে :

    যেমন—ছুঁচালো, ধারালো, টিকালো, প্যাঁচালো, জোরালো।
  - হয়তো, নয়তো—'ও'-কার যুক্তই হবে।
- **ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ও-কার:**

  ক্রিয়ারূপে ও-কারের ব্যবহারে পার্থক্য আছে :

যেমন—নিত্য বর্তমানে অ-কার	— তুমি পড়, তুমি লেখ
বর্তমান অনুজ্ঞায়	— তুমি পড়ো, তুমি লেখো
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায়	— বইটা মনে করে পোড়ো

  - সাধিত ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের রূপ 'নো'—অন্তক :

    যেমন—খাওয়ানো, দেখানো, শোনানো, লেখানো, চালানো।
  - সাধিত ধাতুর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় হবে : করিয়ো, শুনিয়ো, দেখিয়ো আ-অন্তক সাধিত ধাতুর মধ্যম পুরুষে হবে: খেয়ো, দিয়ো, যেয়ো।
- **ঐ-কার/ঔ-কার:**

  ঐ-কারের পরিবর্তে 'অই' ও ঔ-কারের পরিবর্তে 'অউ' লেখা হবে যেমন—বৈ, কৈ, পৈতের পরিবর্তে হবে—বই, কই, পইতে।

  বৌ, মৌ, ফৌজ-এর পরিবর্তে হবে—বউ, মউ, ফউজ।
- **ঙ/ঙ্গ-এর ব্যবহার:**

  ঙ ও ঙ্গ-এর ক্ষেত্রে 'ঙ'-ই ব্যবহৃত :

  যেমন—কাঙাল, বাঙাল, ডাঙা, রঙিন, ভাঙা প্রভৃতি, কিন্তু যেখানে '**ঙ্গা**' উচ্চারিত হয় সেখানে 'ঙ্গ' বা '**ঙ্গা**'

যেমন—জঙ্গাল, বঙ্গা, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুঙ্গি প্রভৃতি।

● ণ, ন, শ, ষ, স-এর ব্যবহার নিয়ে তৎসম শব্দের ণত্ববিধি ও ষত্ববিধির সঙ্গে অতৎসম শব্দের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে।

● ক্ষেত, ক্ষুদ, ক্ষ্যাপা-এর পরিবর্তে খেত, খুদ, খ্যাপা লেখা হবে।

❑ **'কি' এবং 'কী'-এর ব্যবহার :**

'কি' প্রশ্নসূচক শব্দ, যার উত্তর হবে 'হ্যাঁ' বা 'না'।

তুমি **কি** খেয়েছ? উত্তর—হ্যাঁ অথবা 'না'।

'কী' প্রশ্নসূচক সর্বনাম, বিশেষণের বিশেষণ।

তুমি **কী** খেয়েছ? এর উত্তরে হতে পারে,—ভাত, রুটি, ফল।

আবার '**কী** সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে'।—এখানে সুন্দরের বিশেষণ।

তাই 'কি' ও 'কী' এর ব্যবহার সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। দুটি বানানই থাকবে।

১৭.৫ সারসংক্ষেপ

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বাংলা বানান সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া গেল। সমস্ত বানানের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, তবে বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা গেল। নির্ভুল বানান লিখতে গেলে শব্দের ব্যুৎপত্তি, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি ব্যাকরণের দিকগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এরই সঙ্গে হাতের কাছে অন্তত একটি অভিধান থাকাও কাঙ্ক্ষিত।

প্রশ্নাবলি:

(ক) বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। ব্যাকরণে 'লিঙ্গ' বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী—উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। 'বচন' বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় বচন কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেকটি বচনের পরিচয় দিন।

৩। ব্যাকরণে 'পুরুষ' বলতে কী বোঝায়? পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেকটি পুরুষের পরিচয় দিন।

৪। 'কারক' বলতে কী বোঝায়? বাংলায় কারক কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক কারকের একটি করে উদাহরণ দিন।

৫। 'বিভক্তি' কাকে বলে? বিভক্তির কাজ কী? শূন্য বিভক্তির উপযোগিতা কী? বাংলায় একবচনের কয়েকটি বিভক্তির উল্লেখ করুন।

৬। ‘অনুসর্গ’ কী? বিভক্তি ও অনুসর্গ-এর সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৭। সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিচয় দিন।

৮। বাক্য কাকে বলে? বাক্য নির্মাণের শর্তগুলি লিখুন। কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসালেই কি তাকে বাক্য বলা যাবে?

৯। গঠনগত দিক দিয়ে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১০। ণত্ববিধি ও ষত্ববিধি বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

১১। ‘উভলিঙ্গ’ বলতে কী বোঝায়? উভলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

১২। সচল প্রাণীবাচক শব্দ বহুবচনে রূপান্তর করতে গেলে কোন কোন প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় লিখুন।

১৩। গুলা, গুলি, গুলো প্রত্যয় কখন কোথায় ব্যবহার করা হয় তা উদাহরণসহ লিখুন।

১৪। বাংলায় পুরুষ কত প্রকার ও কী কী? প্রতিটির উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

১৫। পুরুষের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক বুঝিয়ে দিন।

১৬। ‘খা’ ধাতুর তিন পুরুষে রূপের পার্থক্য বাক্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

১৭। কর্তৃকারক কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

১৮। করণকারক ও অপাদান কারকে ব্যবহৃত অনুসর্গের পরিচয় দিন।

১৯। জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

২০। বানান ভুলের প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করুন।

২১। ই-কার ও ঈ-কারের মধ্যে কোনটিকে অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা লিখুন ও উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। উভলিঙ্গ বলতে কী বোঝায়?

২। দুটি নিত্য পুংলিঙ্গ ও দুটি নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ লিখুন।

৩। এক বচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরের দুটি নিয়ম লিখুন।

৪। ‘পুরুষ’-এর সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গের কোনো সম্পর্ক আছে কি?

৫। শব্দ ও পদের পার্থক্য দু-এক কথায় বুঝিয়ে দিন।

৬। নীচের পদগুলিতে কোন বিভক্তি হয়েছে, মূল শব্দের সঙ্গে যোগচিহ্ন (+) দিয়ে লিখুন : সকলের, বাসায়, পুকুরে, থানাতে।

৭। তলায় দাগ দেওয়া শব্দগুলিতে কোন কারকে, কোন বিভক্তি হয়েছে লিখুন :
দুধে ছানা হয়। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

৮। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান'। বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাগ করে দেখান।

৯। দ্বিতীয় বানান সংস্কার কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে হয়?

১০। 'ঙ' আর 'ং' এর ব্যবহার নতুন বানান বিধিতে কীভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে লিখুন।

১১। 'পুংলিঙ্গ' শব্দকে কোন কোন উপায়ে 'স্ত্রীলিঙ্গ'-এ পরিবর্তন করা যায় লিখুন।

১২। নীচের স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দগুলির অর্থ লিখুন।
আচার্যা/আচার্যানী, শূদ্রা/শূদ্রাণী, চণ্ডা/চণ্ডী, ক্ষত্রিয়া/ক্ষত্রিয়ানী/ক্ষত্রিয়ী

১৩। নীচের পদগুলির একবচনের রূপ লিখুন:
রচনাবলি, পুষ্পচয়, পুরনারীবৃন্দ, গাছ-গাছড়া, পাকা-পাকা আম, ছাত্রমহল, মেয়েদের, স্বরগ্রাম, নৌকারাজি, কলম্বকুল।

১৪। যেটি ভুল সেটিকে কেটে দিন:

টেবিলরা/টেবিলগুলি	মোষেরা/মোষগুলি
ছাত্রেরা/সকল ছাত্রেরা	অধ্যাপকগণ/অধ্যাপকগুলো
সকল সদস্যকে/সকল সদস্যদের	সমস্ত সৈন্যগণ/সৈন্যগণ
এত টাকাগুলি/এতগুলি টাকা	বহু মনুষ্যগণ/মনুষ্যগণ

১৫। নীচের বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদ ছাড়া বাকি পদগুলিতে কোন বিভক্তি বা অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে লিখুন:

ক) "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা।"

খ) "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,..."

১৬। বাক্যের সংজ্ঞা লিখুন। বাক্যের প্রধান দুটি অংশ কী কী?

১৭। 'ঘোড়া আকাশে উড়ছে'—একে কি যথার্থ বাক্য বলা যাবে? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি সাজান।

১৮। "আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম।"—গঠনগত বিচারে বাক্যটি কোন শ্রেণীর?

১৯। বাংলা বানানের জন্য নির্দিষ্ট বিধান সর্বপ্রথম কার অনুরোধে, কবে, কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়?

২০। স্বাভাবিকভাবে 'ণ' হয় এমন পাঁচটি শব্দ লিখুন।

২১। স্বাভাবিকভাবে 'ষ' হয় এমন পাঁচটি শব্দ লিখুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সহায়ক হবে—

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, বাক্ সাহিত্য, কলিকাতা।

২। সুকুমার সেন : *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা

৩। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লি

৪। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

৫। *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

৬। *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

৭। *কী লিখবেন কেন লিখবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা

মডিউল ৪

সম্পাদনা, সম্পাদনার নীতি, অঙ্গসজ্জা, সাংবাদিকতা, প্রতিবেদন, প্রতিবেদন রচনা

একক ১৮ ❑ সম্পাদনা

গঠন

১৮.১ উদ্দেশ্য

১৮.২ প্রস্তাবনা

১৮.৩ সংবাদপত্র সম্পাদনা

১৮.৪ সারসংক্ষেপ

১৮.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে:

- সম্পাদনা কাকে বলে?
- সম্পাদক ও সম্পাদকীয় কী?
- সম্পাদনা কত রকমের হতে পারে?
- সম্পাদনার পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা

  'দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকার মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাবে'
- সংবাদ রচনার ভাষা
- ত্রুটিহীন ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংবাদ পরিবেশন
- সংবাদ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রে সম্পাদকের ভূমিকা
- শিরোনাম প্রদানের গুরুত্ব
- সম্পাদনার নীতিসমূহ

১৮.২ প্রস্তাবনা

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বা গ্রন্থ যেকোনো প্রকাশনার জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন। যেকোনো লেখাকে সেই পত্র—পত্রিকা বা গ্রন্থের জন্য রচিত হলেও, তা ছাপার আগে ঘষে মেজে পরিষ্কার ঝকঝকে করে গড়ে

তোলা দরকার। সম্পাদনা যেকোনো লেখাকে ছাপার উপযোগী করে তোলে। সম্পাদনা সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় যথাসম্ভব সহজভাবে এখানে আলোচিত হবে। পড়লেই বুঝতে পারবেন সম্পাদনার যাবতীয় কৌশল, নীতি ও প্রক্রিয়া। বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে যেতে হয় সম্পাদনার কাজের জন্য। প্রতিটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আলোচনার প্রেক্ষিত সামগ্রিকভাবে সমস্ত স্তরকেই ছুঁয়ে যাবে। বানান সংশোধন থেকে বাক্যবিন্যাস ও শিরোনাম তৈরি, অনুচ্ছেদ গঠন থেকে পুনর্লিখন, অঙ্গসজ্জা যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপরই আলোকপাত করা হবে।

সম্পাদনা কী ও কেন?

যেকোনো রচনা ছাপার আগে দেখতে হয় রচনাটি ছাপার উপযুক্ত হয়েছে কিনা। যেকোনো মুদ্রিত রচনা আমরা যখন হাতে তুলে নিই, তখন কখনই আশা করি না ঐ রচনায় কোন ভুল থাকবে। হাতে লেখার ভুল কলম চালিয়ে সংশোধন করা যায়, ছাপার ভুল কিন্তু এত সহজে ঠিক করা যায় না। একবার ছাপা হয়ে গেলে কোনো পরিবর্তনই করা যায় না। যা কিছু পরিবর্তন সংশোধন করতে হবে ছাপার আগে। যে রচনা ছাপা হবে, তা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করে একেবারে নিখুঁত করে গড়ে তুলে রচনা পাঠকের কাছে উপস্থিত করা দরকার।

ত্রুটি নানান ধরনের হতে পারে। তথ্যগত ভুল, বানানের ত্রুটি, বাক্যবিন্যাসের অসঙ্গতি, অক্ষরের ওলট-পালট প্রভৃতি বিভিন্ন ত্রুটি একটি রচনায় থাকতে পারে। ত্রুটিগুলো সংশোধন না হলে ছাপার মধ্যেও এগুলো থেকে যাবে এবং তা হবে পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ত্রুটি সংশোধনের এই প্রক্রিয়ার নামই হল সম্পাদনা। সম্পাদনা যিনি করবেন তাকে বলা হয় সম্পাদক। যেকোনো রচনায় চোখ রেখে ভুল ধরাই তার কাজ। খুব মনোযোগ দিয়ে রচনা পাঠ করবেন। খুঁতখুঁতে মন নিয়ে একে একে ভুল বার করে সেগুলিকে ঠিক করবেন। অন্যের লেখার ওপর কলম চালিয়ে লেখার মান বাড়ানোই তার কাজ।

শুধুমাত্র ত্রুটি সংশোধন করার মধ্যেই কিন্তু সম্পাদনার কাজ সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি রচনাকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত করাও সম্পাদনার কাজ। ভুল বানান, ভুল নাম কেটে ঠিক করলেই চলবে না। লেখাটি প্রয়োজন হলে পরিমার্জনা করে আরও সুন্দর করে তুলতে হবে। বাক্যবিন্যাসে যদি কোনো অস্পষ্টতা থাকে, তাহলে তা পাল্টে দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা দরকার। একটি ভাবনা ফুটে ওঠে বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে। ভাবনাটি সার্থকভাবে মেলে ধরার মধ্যেই বিন্যাসের সার্থকতা। যদি কোনো অস্পষ্টতা থাকে, তাহলে ভাবনা সার্থকভাবে ফুটে উঠবে না। লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সম্পাদকের কাজ হ'ল লেখকের ভাবনাটিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা। পাঠক পড়তে গিয়ে যাতে হোঁচট না খায়, উপস্থাপিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে তার যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সেটা দেখতে হবে সম্পাদককে। এক কথায় বলা যেতে পারে, রচনার পাঠযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একের পর এক বাক্য পেরিয়ে অনায়াসে পাঠক যেন বিষয়ের তাৎপর্য বুঝতে পারে।

অল্প কথায় কোনো বিষয়কে সহজভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরার মধ্যেই যে কোনো রচনার সার্থকতা। লক্ষ করার বিষয় লিখতে গেলে পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা বেশি। লেখকের মাথায় যে বিষয়টি রয়েছে তা ফিরে ফিরে আসে। এভাবেই ঘটে পুনরাবৃত্তি। উপস্থাপনের পক্ষে যা কখনওই ভালো নয়। একই কথা বার বার ফিরে আসলে রচনার উৎকর্ষ হ্রাস পায়। সম্পাদক যদি পুনরাবৃত্তি আটকাতে পারেন, তাহলে রচনা সংক্ষিপ্ত হবে, একেবারে যথার্থ হয়ে উঠবে।

বাক্যবিন্যাসেও সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখতে হবে। যে কথা অল্প কথায় বলা যায়, তা বিস্তৃত করার কোনো অর্থ হয় না। সম্পাদককে দেখতে হবে যাতে অযথা বড়ো বাক্য নির্মাণ করা না হয়। ঠিক যেমনটি প্রয়োজন তাই লিখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিতে হবে। দরকার হলে বাক্যবন্ধ পুরোটাই বদলে ফেলতে হবে। বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তন করে নতুন করে লিখতে হবে। কেটে-ছেঁটে পালটে ফেলে একেবারে ঠিক যেমনটি প্রয়োজন, তেমনটি গড়ে তোলাই হল প্রকৃত সম্পাদনা। প্রচ্ছদ নির্মাণ, বাঁধাই, প্রভৃতি বিষয়েও সম্পাদককে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। একটি প্রকাশনাকে উন্নতমানের করতে অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকটিও জরুরি।

সম্পাদক: আধুনিক সংবাদপত্রে সব সময় সম্পাদককে নিজহাতে সম্পাদকীয় লিখতে হয় না। তবে তিনি সময় করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপর চিন্তাশীল কোনো সম্পাদকীয় লিখলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। সম্পাদকের দেশকাল, সমাজ-রাজনীতি-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ, পাঠক-রুচি ও জনচিত্ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং পত্রিকা পরিচালনা সম্পর্কে প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়। সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও অঙ্গবিন্যাস সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান, সংবাদপত্রের ভাষা-পরিভাষা, উপস্থাপনার কলা-কৌশল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানতে হয়। সাম্প্রতিক কালের পেশাদার সম্পাদক, জনপ্রিয় সাংবাদিক থেকে অনেকে সম্পাদক পদে বৃত হওয়ায় লেখার অভিনবত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং অবহিত। তিনি দিনে এক বা একাধিকবার বিভাগীয় সম্পাদক, সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে প্রকাশিত সংবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্য কাগজের সঙ্গে তুলনায় আলোচনা করেন। বিগত দিনের সংবাদের প্রয়োজনীয় ফলো-আপ' ও কাগজের নীতি পুনরালোচনা করে, পরিশেষে সেদিনের সম্পাদকীয়তে কোন্ বিষয় গুরুত্ব পাবে এবং সেটি কে লিখবেন তা বলে দেন। সংবাদপত্রের পরিভাষায় এই সম্পাদকীয় লেখককে বলা হয় "লিডার রাইটার"। তিনি পত্রিকার গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র ও পুরনো সংবাদের প্রাসঙ্গিক ক্লিপিংস আনিয়ে রীতিমতো পড়াশুনা করে তার সম্পাদকীয় তৈরি করেন। সম্পাদক সবসময় সম্পাদকীয় লেখেন না বলে 'লিডার রাইটার'-এর দায়িত্ব অনেক।

সম্পাদকীয় : খবরের কাগজে শুধু সংবাদ থাকে না। কাগজের নিজস্ব মতামত ও মূল্যায়নও থাকে। একটি আলাদা পৃষ্ঠায় নিবন্ধ আকারে এই মতামত ও মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়। পাঁচ, ছ'শো শব্দের এই নিবন্ধকে বলা হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এর গুরুত্ব অপরিসীম। কাগজের নিজস্ব নীতি, স্বাতন্ত্র্য বিচারবোধ প্রতিফলিত হয় এই প্রবন্ধে। সম্পাদকীয়কে বলা হয় সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর। সংবাদের মধ্যে কাগজের নিজস্বতা সেভাবে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু সম্পাদকীয় নিবন্ধে কাগজ নিজের স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

সম্পাদকীয় লেখা হয় সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বিষয়ের ওপর। বাজেট পেশ হলে, মন্ত্রীসভার কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, বড় কোনো আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দিলে অথবা কোনো বড় ঘটনা ঘটলে, তার ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করা হয়। এইসব বিষয় ও ঘটনার ওপরে কাগজের নিজস্ব মূল্যায়ন ও বিচারবোধ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় এই নিবন্ধে।

সহ-সম্পাদকেরা সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্বে থাকেন। সাংবাদিকতার পরিভাষায় বলা হয় 'লিডার রাইটার'। প্রতিদিন সম্পাদক সহ-সম্পাদকদের নিয়ে সভা করে ঠিক করেন কী বিষয়ের ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হবে এবং ঐ লেখার দায়িত্বে কে থাকবেন। মতামতের ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপরেখাও মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় এই সভায়। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদকীয় লেখক নিবন্ধ রচনার কাজ শুরু করেন।

১৮.৩ সংবাদপত্র সম্পাদনা

সম্পাদনার প্রয়োগ: সম্পাদনার প্রয়োগ মুদ্রণ মাধ্যমে নানা ক্ষেত্রে হতে পারে। খবরের কাগজ, সাময়িকপত্র, পুস্তক প্রকাশনায় ব্যাপকভাবে সম্পাদনার প্রয়োগ ঘটে। যে কোনো প্রকাশনাকে পাঠযোগ্য ও নিখুঁত করে গড়ে তোলার কাজে সম্পাদনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কী ধরনের প্রকাশনা, তার ওপর নির্ভর করে সম্পাদনার রীতি ও নীতি। সংবাদপত্রের সম্পাদনা যেমন হবে, পুস্তক প্রকাশনার সম্পাদনা সেরকম কখনওই হবে না। এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক রকম সম্পাদনা পদ্ধতি ব্যবহার হবে।

সংবাদপত্র সম্পাদনা: প্রতিদিন সকালবেলা যে-সংবাদপত্র আমাদের হাতে পৌঁছয়ো, তা তৈরি হয় এক দীর্ঘ কর্মবহুল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। খবরের কাগজ পড়ার সময় সংবাদপত্র তৈরির এই বিপুল কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের মনে থাকে না। চা খেতে খেতে আমরা চোখ বোলাই কাগজের পাতায়, এক ঝলকে দেখে নিই কাছের, দূরের, বিশ্বের নানা প্রান্তের একেবারে সাম্প্রতিক খবর। যে-খবর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা দ্রুত পড়ে নিই। সময় কম, অনেক কাজ বাকি আছে। তাই চটপট পড়ে ফেলতে হয়। এটা সম্ভব হয় সংবাদপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে বলেই। যে-কাগজ পড়তে পাঠক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, অনায়াসে পছন্দ মাফিক খবর খুঁজে পান এবং খুব সহজে পড়ে যেতে পারেন, ধরে নিতে হবে সেই কাগজের সম্পাদনা ভালো। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনাই কাগজের উৎকর্ষ নিয়ে আসে। আলাদা চরিত্র প্রতিষ্ঠা করে।

সংবাদপত্র উৎপাদনের সমস্ত স্তরের মধ্যে সম্পাদনা হল একটি উল্লেখযোগ্য স্তর। প্রথমে খবর সংগ্রহ তারপর সম্পাদনা—এই দুটি কাজ হলেই একটি সংবাদ ছাপার যোগ্য হয়ে ওঠে।

কারা সম্পাদনা করেন: সংবাদপত্রে সম্পাদনা যারা করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন অবর সম্পাদক বা সাব-এডিটর। একটি বড়ো কাগজে বহু অবর সম্পাদক থাকেন। নিউজ রুমে বসে সংবাদের কপি সংশোধন, পুনর্নির্মাণ, প্রয়োজনে কাটছাঁট করে সংক্ষিপ্ত করার কাজে তারা নিয়োজিত

থাকেন। এঁদের ওপরে থাকেন মুখ্য-অবর সম্পাদক, এবং তার ওপরে থাকেন বার্তা সম্পাদক। নিউজরুমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তায় বার্তা সম্পাদকের ওপর। বার্তা সম্পাদক শুধুমাত্র সম্পাদনা নয়, সংবাদ সংগ্রহ করার বিষয়টির ওপরও তদারকি ও নজরদারি করেন।

সংবাদ সংগ্রহ: নিউজ রুমে খবর আসে নানান সূত্র থেকে। খবর সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন রিপোর্টার বা প্রতিবেদকরা। এঁদের মধ্যেও শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। সংবাদপত্রের অফিসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় থাকেন স্টাফ রিপোর্টাররা। নিউজরুমে মুখ্য-প্রতিবেদকের অধীনে স্টাফ রিপোর্টাররা কাজ করেন। প্রধানত স্থানীয় খবর যোগাড় করার দায়িত্ব থাকে তাদের ওপর। তারা সাধারণত বীটে গিয়ে খবর যোগাড় করেন। বীট বলতে বোঝায় সেই সমস্ত জায়গা, যেখানে গেলে নিয়মিত খবর পাওয়া যায়। যেমন— মহাকরণ, লালবাজার, পৌরসভার সদর দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, আইনসভা প্রভৃতি হল স্টাফ রিপোর্টারদের বীট। মুখ্য প্রতিবেদকের নির্দেশে প্রতিবেদকরা বিভিন্ন বীটে গিয়ে খবর জোগাড় করে নিয়ে আসবেন। অফিসে এসে কপি লিখে জমা দেবেন এবং তারপর সেই সমস্ত কপি যাবে অবর সম্পাদকদের কাছে সম্পাদনার জন্য। স্টাফ রিপোর্টারদের ওপরে থাকেন প্রিন্সিপাল করেসপনডেন্ট এবং তার ওপরে থাকেন স্পেশাল করেসপনডেন্ট। সবচেয়ে অভিজ্ঞ প্রতিবেদক হলেন স্পেশাল করেসপনডেন্ট। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খবর কভার করার দায়িত্বে থাকেন তারাই।

দেশের রাজধানী, বিভিন্ন বড় শহর থেকেও খবর পাঠান স্পেশাল করেসপনডেন্টরা। ব্যুরো চীফ মারফৎ এই সমস্ত খবর এসে পৌঁছয় নিউজরুমে। তারপর ঐ সমস্ত কপি সম্পাদনার টেবিলে এসে পৌঁছয়। জেলা শহর থেকেও সংবাদদাতারা খবর পাঠান এবং সেই সমস্ত কপিও অবর-সম্পাদকের বা সাব-এডিটরের কাছে যায় সম্পাদিত হওয়ার জন্য। সম্পাদনার পর এই সমস্ত কপি মুদ্রণযোগ্য হয়ে ওঠে।

বিদেশ সংবাদদাতা এবং সংবাদসংস্থার পাঠানো কপিও প্রচুর পরিমাণে এসে জমা হয় নিউজরুমে। লণ্ডন, ওয়াশিংটন, প্যারিস, মস্কো থেকে খবর পাঠান বিদেশ সংবাদদাতারা। প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, চীন থেকেও সংবাদদাতারা ঐ সমস্ত দেশের খবর পাঠান। যত দিন যাচ্ছে, বিদেশি খবরের গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের দেশের কাগজে। প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কারণে পৃথিবীর সীমানা যত ছোটো হয়ে আসছে, খবরাখবরের আদান-প্রদানও তত বাড়ছে। প্রতিটি কাগজের নিউজরুমে তাই প্রচুর পরিমাণে বিদেশি খবর আসছে। এইসব বিদেশি খবরও সম্পাদনা হওয়ার পর ছাপতে যায়। সম্পাদনা ছাড়া কোনো খবরেই গতি নেই।

সংবাদপত্রের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খবর আসে সংবাদসংস্থার কাছ থেকে। পয়সা দিয়ে সংবাদসংস্থার কাছ থেকে খবর কিনতে হয়। সংবাদসংস্থার গ্রাহক হলে খবর পাবার ব্যাপারটা অনেক নিশ্চিত হয়ে যায়। সংবাদদাতারা পাঠাক বা না পাঠাক, খবর আসবেই কাগজে। খবর মিস করার সম্ভাবনা অনেক কম। যেখানে যে খবরই ঘটুক না কেন, সংবাদ-সংস্থা সেই খবর পাঠাবেই। বিদেশের খবর পাঠাবে বিদেশি সংস্থা রয়টার, এপি, এ-এফ পি, আর দেশের খবর পাঠাবে পি.টি.আই, ইউ এন আই-এর মতো জাতীয় সংবাদ-সংস্থা।

সংবাদ সংস্থার পাঠানো বিপুল সংবাদ প্রবাহ থেকে সামান্য অংশই ছাপা হয়। সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুসারে কপি নির্বাচন করে, যথাযোগ্য সম্পাদনা করার পর মুদ্রণযোগ্য কপি তৈরি হয়। পাঠানো হয় কম্পোজ করার জন্য।

কপি সম্পাদনা: অবর-সম্পাদকরা যে সমস্ত কপি সম্পাদনা করেন তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল সংবাদসংস্থার কপি। হিন্দি, বাংলা এবং উর্দু কাগজে এই সমস্ত কপি অনুবাদ করে নিতে হয়। কারণ সংবাদ সংস্থার কপি আসে ইংরেজিতে। ঘষে-মেজে ভুল ত্রুটি শুধরে প্রয়োজনে অনুবাদ করে ছাপার যোগ্য করে তুলতে হয় এই সমস্ত কপিকে। রিপোর্টারদের কপিও অবর-সম্পাদকরা ঘষে মেজে ছাপার যোগ্য করে তোলেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিদিন অসংখ্য প্রেসরিলিজ এসে পৌঁছয় নিউজরুমে। এই রিলিজের মধ্যে যে বিষয় থাকে, তার মূল উদ্দেশ্য হল খবর হওয়া। রিলিজের মধ্যে অনেক তথ্য থাকে। প্রতিষ্ঠান জানে সব তথ্য সংবাদে যাবে না। দু-এক লাইনও যদি যায় তাহলেও অনেক। বড়ো বিজ্ঞাপনের চেয়ে দু-এক লাইনের খবর প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। চেম্বার অফ কমার্স, ভারতীয় রেল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিত প্রেসরিলিজ সংবাদপত্রের অফিসে পাঠিয়ে থাকে। অবর-সম্পাদককে এই সমস্ত প্রেস রিলিজ থেকে সংবাদের কপি তৈরি করতে হয়।

শিরোনাম: যেকোনো সংবাদের একটা শিরোনাম থাকে। সংবাদ পড়তে গেলে সবার আগে চোখে পড়ে শিরোনাম। ব্যস্ত পাঠক শিরোনাম দেখেই পেয়ে যান সংবাদের নির্যাস। ইচ্ছে না হলে সংবাদের ভিতরে ঢোকার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র শিরোনাম দেখেই মূল সংবাদের আন্দাজ পাওয়া যাবে। পাঠকের কাছে সংবাদের বিষয় পৌঁছে দিতে শিরোনামের জুড়ি নেই। রিপোর্টারের কপি, সংবাদ-সংস্থার কপি সম্পাদনার পর শিরোনাম বসানো হয়। সম্পাদনা করেন যে অবর-সম্পাদক, তিনিই শিরোনাম দেন।

শিরোনাম লেখা সম্পাদনার শেষ কাজ। একেবারে অল্পকথায় অবর-সম্পাদক শিরোনাম লিখবেন। ঠিক শব্দ নির্বাচন করে সংবাদের মূল ভাবনাটিকে প্রকাশ করতে হবে। কপিতে ব্যবহৃত হয়েছে যে শব্দ, তাই ফিরে আসবে শিরোনামে। এতে সংবাদের বিষয়কে সহজে চিহ্নিত করা যায়। একটি শিরোনাম সার্থক হয়ে ওঠে ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহারে। বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ কোনো ঘটনার সাম্প্রতিক চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করে। খবরের টাটকা ভাবটা বজায় থাকে। মানুষ যতক্ষণ না জানছে, ততক্ষণই একটা বিষয় খবর থাকে। জানার সঙ্গে সঙ্গে খবরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ক্রিয়াপদ জানায়। এমনভাবে জানায় যাতে পাঠক প্রথম জানার আকস্মিকতা অনুভব করতে পারে। মানুষ কুকুরকে কামড়েছে, এটা একটা ভালো খবর। আবার একই সঙ্গে ভালো শিরোনামও। কামড়েছে ক্রিয়াপদটি বর্তমান কালের এবং তা ঘটনার আকস্মিকতা ও টাটকাভাব ধরে রাখে। খবর জীবনের কথা বলে, আর ক্রিয়াপদ খবরকে জীবন্ত করে গড়ে তোলে।

শিরোনাম একেবারে শেষে দেওয়ার অন্যতম যুক্তি হল—একটা সংবাদ কতটা জায়গা পাবে তা

একেবারে শেষে ঠিক হয়। সম্পাদনার সময় ক'কলাম কত সেন্টিমিটার জায়গা নেবে, একটি সংবাদ থেকে তা জানা যায়। দু'কলাম জায়গা গেলে শিরোনামকে দু'কলাম জায়গার মধ্যে ধরাতে হবে। আর তিন কলাম জায়গা থাকলে শিরোনাম আরও বিস্তৃত হবে। শিরোনামের বিন্যাসও সম্পাদনার সময় তৈরি হয়। দু'লাইনে, তিন লাইনে অথবা এক লাইনে শিরোনাম রচনা হতে পারে। কী ধরনের বিন্যাস হবে তা নির্ভর করছে, কতটা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে তার ওপর।

সংকলন: সম্পাদনার সময় অনেক সময়ই অবর সম্পাদকদের সঙ্কলনের কাজ করতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপর বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসতে পারে। স্টাফ করেসপনডেন্ট, সংবাদ-সংস্থা একই বিষয়ের ওপর প্রচুর খবর পাঠাতে পারে। গুজরাটের দাঙ্গা, লাটুরের ভূমিকম্পের সময় বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর এসেছে। অভিজ্ঞ অবর সম্পাদককে এই সমস্ত খবরকে সংকলিত করে একটি, দুটি সংবাদের কপি বানাতে হয়। যেমন ভূমিকম্পের খবরের নানা দিক রয়েছে। ধ্বংসের খবর, মৃত্যুর খবর, আহতদের খবর, ক্ষতিপূরণের খবর, পুনর্বাসনের খবর প্রভৃতি অনেক খবর আসতে পারে। রিপোর্টারের পাঠানো কপির সঙ্গে সংবাদ সংস্থার কপির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই থাকতে পারে। সংকলনের সময় এই সমস্ত কিছুই বিবেচনার মধ্যে রাখার দরকার হয়। দুটি সূত্র থেকে আসা খবর নিয়ে যদি কোনো বিভ্রান্তি দেখা যায়, তাহলে অবর-সম্পাদককে খতিয়ে দেখতে হয় তার সত্যতা। দক্ষ সঙ্কলন সম্পাদনার গুণগত মান বাড়িয়ে দেয়।

কপি পরীক্ষা: যে-সংবাদের কপি সম্পাদিত হবে সেটি আগে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, তা সম্পাদনার তথা ছাপবার যোগ্য কি না। নিউজরুমে যে বিপুল কপি এসে জমা হয়, তার মধ্যে থেকে সামান্য অংশই ছাপা হয়। যা ছাপা হবে তা নির্বাচিত হয় কপি পরীক্ষার মাধ্যমে। অভিজ্ঞ সিনিয়র অবর-সম্পাদকরা কপি পরীক্ষা করে থাকেন। সাধারণত মুখ্য অবর-সম্পাদকের ওপরই বর্তায় এই দায়িত্ব। কপি পরীক্ষার সময় অবর-সম্পাদক দেখেন কপিটি পাঠকের চাহিদা, রুচি, পছন্দ পূরণ করবে কিনা। বাংলা কাগজের চাহিদা একরকম, আবার ইংরেজি কাগজের চাহিদা একটু অন্যরকম। বাংলা কাগজে আঞ্চলিক খবরের ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। অন্যদিকে ইংরেজি কাগজে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর বেশি প্রাধান্য পায়। সংবাদপত্রের নিজস্ব নীতিও কপি পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে। এক-এক কাগজের নীতি এক-এক রকম। কেউ রক্ষণশীল, কেউ উদারপন্থী। অবর-সম্পাদকরা জানেন কাগজের নীতি কী। নীতির কথা মাথায় রেখেই তারা কপি পরীক্ষা করবেন।

১৮.৪ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্পাদনার স্বরূপ, সম্পাদনার বিভিন্ন মাত্রা, সম্পাদকের কর্তব্য, সংবাদপত্র সম্পাদনার বহুবিধ মাত্রা সম্পর্কে জানতে পারবে। সম্পাদনার বহুমাত্রিক আঙ্গিক এবং সম্পাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পাবে শিক্ষার্থী।

একক ১৯ ❑ সম্পাদনার নীতি

গঠন

১৯.১ উদ্দেশ্য

১৯.২ সংবাদ সম্পাদনার কিছু নির্দিষ্ট নীতি

১৯.৩ সংবাদ সূচনা

১৯.৪ সম্পাদনা চিহ্ন

১৯.৫ মার্জিন

১৯.৬ শিরোনাম রচনা

১৩.৭ সারসংক্ষেপ

১৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আলোচ্য বিষয়:

- সংবাদ সম্পাদনার নির্দিষ্ট নীতি
- সম্পাদকের কার্যধারা
- সংবাদ রচনা ও সংবাদ পরিবেশনের বিবিধ আঙ্গিক
- সম্পাদনার বিভিন্ন চিহ্ন এবং চিহ্নগুলির গুরুত্ব সম্পর্কিত বিষয়চর্চা
- শিরোনাম রচনার বিভিন্ন মাত্রা, শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে তা আলোচিত হয়েছে এই এককে।

১৯.২ সংবাদ সম্পাদনার কিছু নির্দিষ্ট নীতি

সংবাদ সম্পাদনার কিছু নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। এই নীতিগুলি সম্পাদনার কাজকে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। সম্পাদনার কাজে দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা এই নীতিগুলি যথাসম্ভব মেনে চলেন। উৎকৃষ্ট সম্পাদনায় এই নীতিগুলির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীতিগুলি সংক্ষেপে এইরকম:

১) যথাসম্ভব সহজ ভাষায় সংবাদ রচনা করতে হবে। অল্পশিক্ষিত লোকেরাও কাগজ পড়ে। মোটামুটি ক্লাস এইট অবধি পড়া যেকোনো ব্যক্তি সংবাদপত্র পড়ে সবই বুঝতে পারে। এটা

সম্ভব হয় কারণ সংবাদ লেখা হয় অত্যন্ত সহজ ভাষায়। যতটা সম্ভব সহজভাবে উপস্থিত করা হয় সংবাদের বিষয়কে। সংবাদের কপিতে যদি কোনো জটিলতা থাকে, সম্পাদনার সময় তা দূর করা দরকার। অত্যন্ত অল্পশিক্ষিত পাঠকও গড় গড় করে সংবাদ পড়ে যাবে, কোথাও হোঁচট খাবে না। এটা সম্ভব যদি সম্পাদনার সময় প্রাঞ্জলতা প্রতিষ্ঠা করার দিকে লক্ষ করা হয়।

২) যেকোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি দূর করতে হবে। ভুল নানা ধরনের হতে পারে। বানান ভুল, তথ্যগত কোনো ভুল পাঠককে বিভ্রান্ত করবে। রিপোর্টার তাড়াহুড়ো করে কপি লেখে। ডেডলাইনের মধ্যে অফিসকে খবর ধরাতে হয় তাকে। সামান্য ভুলভ্রান্তি ঘটতেই পারে। সম্পাদনার সময় এই ভুলভ্রান্তি দূর করা হয়। অবর-সম্পাদকের খুঁতখুতে দৃষ্টির সামনে ভুল ধরা পড়বেই। সম্পাদনার টেবিল হল চেকপয়েন্ট। সমস্ত ত্রুটি এখানে সংশোধিত হবে।

৩) সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখা সম্পাদনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কাগজের জায়গা খুবই মূল্যবান। সীমিত জায়গার মধ্যে যত বেশি সংবাদ ধরানো যায় ততই ভাল। এ অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে-ছেঁটে ছোটো করতে হয়। ঠিক যতটা দরকার ততটাই থাকবে। কোনো বাড়তি কথা নয়। একেবারে যথাযথ বক্তব্য উপস্থিত করার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় সম্পাদনায়। বক্তব্য একেবারে সরাসরি পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে হবে সংক্ষেপে, সংবাদের আসল কথাটি দ্রুত জানাতে হবে।

৪) সংবাদ লেখার রীতি সাধারণ রচনা রীতির থেকে আলাদা। সাধারণ রচনার ক্ষেত্রে পিরামিড নীতি অনুসরণ করা হয়। পিরামিডের ওপরটা সরু হয়। নিচের দিকটা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে থাকে। লেখক সাসপেন্স ধরে রেখে আস্তে আস্তে মূল বক্তব্য উপস্থিত করেন। রচনা যত এগোয়, মূল বিষয়বস্তু তত উদ্‌ঘাটিত হয় পাঠকের কাছে। সংবাদ রচনায় ঠিক এর উল্টো নীতি অনুসরণ করা হয়। পিরামিডের বিপরীত উল্টো পিরামিড। ওপরটা চওড়া নিচের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে মিলিয়ে গেছে। এর অর্থ হল মূল বক্তব্য একেবারে আগে। তারপর ধীরে ধীরে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সংবাদের সবচেয়ে আসল বক্তব্য থাকবে একেবারে প্রথমে, তারপর ধীরে ধীরে সংবাদের প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য দিতে হবে। সম্পাদনার সময় সংবাদ রচনার এই আঙ্গিকটি বজায় রাখা দরকার। এতে সংবাদ জানতে পাঠকের সুবিধা বেশি। একেবারে প্রথমেই জানা হয়ে যাবে আসল সংবাদটি কী, তারপর ধীরে ধীরে জানা যাবে বিস্তৃত তথ্য। যার সময় কম তিনি অল্প একটু পড়েই সংবাদটির মূল বিষয়টি জেনে যাবেন, যার সময় ও আগ্রহ দুই-ই আছে, তিনি সংবাদটি পুরো পাঠ করবেন, যেখানে পিরামিডের সরু অংশ একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই পর্যন্ত। উল্টো পিরামিডের একেবারে

শুরুতে যে প্রশস্ত জায়গা থাকে সেখানে থাকে সূচনা, ইংরেজিতে যাকে বলে ইনট্রো। মূল সংবাদটি এই সূচনার মধ্যেই ধরা থাকে।

১৯.৩ সংবাদ সূচনা

উল্টো পিরামিডের আঙ্গিকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সূচনা। ইংরেজিতে বলে ইনট্রো। সংবাদের মোদ্দা কথা ধরা থাকে ইনট্রোতে। তিরিশ থেকে চল্লিশ শব্দের মধ্যে লেখা হয় ইনট্রো বা সূচনা। এটুকু পড়লেই পাঠক জেনে যাবেন সংবাদের মূল বিষয়বস্তু। সংবাদ সম্পর্কে পাঠকের সাধারণ কৌতুহলকে পাঁচ W এবং এক H এ ভাগ করে দেখা হয়। পাঁচ W হল, What, When, Where, Who এবং Why, এখানেই শেষ নয়। পাঠক আরও জানতে চায়। তাই আসে H, অর্থাৎ How; যেমন একটি দুর্ঘটনার খবর জানার জন্য পাঠকের মনে প্রশ্ন আগে কী ঘটল, কখন ঘটল, কোথায় ঘটল, কারা যুক্ত এই ঘটনায়, কেন ঘটল এবং একেবারে শেষে কীভাবে ঘটল। সূচনার মধ্যে এই প্রশ্নগুলির জবাব যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করতে হবে। সূচনাটুকু পড়লে পাঠক এই প্রশ্নগুলির জবাব পাবেন এবং জেনে যাবেন সংবাদের আসল বিষয়।

সম্পাদনা করার সময় ভালো সূচনা লেখার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। একেবারে সংবাদের নির্যাসটুকুকে সংক্ষেপে পরিবেশন করতে হবে সূচনায়। সূচনাটি পড়লেই পাঠক মূল সংবাদের হদিশ পাবেন। জেনে যাবেন সংবাদের প্রধান বিষয়গুলি কী। অন্ধ্রে নকশালপন্থীদের আত্মসমর্পণের ওপর একটি সংবাদের সূচনা ছিল এই রকম: "জনশক্তি গোষ্ঠীর করিমনগর জেলার ৪৬ জন নকশালপন্থী আজ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সামনে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে" (আনন্দবাজার পত্রিকা)। একজন রুশ জেনারেলের বিমান দুর্ঘটনায় খববের সূচনা লেখা হয়েছে এইভাবে: "রাশিয়ার প্রাক্তন জেনারেল এবং রাজনীতিবিদ আলেকজান্ডার লেবেদ আজ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন," (আনন্দবাজার পত্রিকা)। দুটি সূচনাতেই কী, কোথায়, কে, কখন, কেন? উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

পুনর্লিখন : সম্পাদনার অন্যতম অঙ্গ হল পুনর্লিখন। লেখার মধ্যে যদি কোনো জটিলতা, অস্পষ্টতা থাকে তাহলে পুনরায় আবার নতুন করে লিখতে হয়। বাক্যবিন্যাসের সামান্য অদল-বদল করলেই জটিলতা দূর হয়ে যেতে পারে। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা অবর-সম্পাদক অনেক সময়ই রিপোর্টারদের লেখার ওপর কলম চালিয়ে নতুন করে লেখাকে ঢেলে সাজান। বড়ো বাক্যকে কেটে ছোটো করেন, প্রয়োজন হলে বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিষয়-ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলেন।

সম্পাদনার মূল কারবার শব্দ ও বাক্য নিয়ে। শব্দ ও বাক্যকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা দরকার। অবর-সম্পাদক দেখেন কথার ভারে, অস্বচ্ছতায় খবর যেন হারিয়ে না যায়। ছোটো ছোটো কথায় সহজ সরল শব্দ দিয়ে সংবাদ লিখতে হবে। উদ্দেশ্য একটাই, পাঠক পড়া মাত্র বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

রিপোর্টারের লেখা, সংবাদ সংস্থার পাঠানো কপিতে যদি অস্বচ্ছতা থাকে, তাহলে অবর-সম্পাদক লেখার ওপর কলম চালাবেন, নতুন করে আবার লিখবেন। একটা নমুনা দেখলেই বিষয়টি আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন। গুলি করে টাকা ছিনতাইয়ের একটি খবরের পুনর্লিখন কীভাবে হয়েছে তা নিচে দেওয়া হল। পুনর্লিখনের আগের রূপটি এরকম:

> "সোমবার রাতে হাওড়া-তারকেশ্বর শাখার নালিকুল স্টেশনে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ছিনতাই করেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিস সূত্রে জানা গেছে হারাধন দে নামে এক ব্যবসায়ী কাজ সেরে রাত বারোটা নাগাদ নালিকুল স্টেশনে পৌঁছন। শেষ তারকেশ্বর লোকাল থেকে তিনি স্টেশনে নামেন। তার সঙ্গে একটি ব্যাগে প্রচুর টাকা ছিল। এই সময় চার দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে ব্যাগটি ছিতাইয়ের চেষ্টা করে। হারাধনবাবু বাধা দিলে তার মাথায় গুলি করা হয়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দুষ্কৃতীরা ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ হারাধনবাবুকে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু পরে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজ করছে। এখনও পর্যন্ত কেউ ফাঁদে পড়ে নি।"

সংবাদের বিষয়গুলিকে ঠিকঠাক সাজিয়ে পুনর্লিখনের পর লেখাটি এরকম হবে:

> " এক ব্যবসায়ীকে মাথায় গুলি করে এক লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে তারকেশ্বর শাখার নালিকুল স্টেশনে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।পুলিশ জানায় ওই দিন রাতে হারাধন দে নামে এক ব্যবসায়ী কাজ সেরে রাত বারোটা নাগাদ শেষ তারকেশ্বর লোকালে নালিকুল স্টেশনে নামেন। তার কাছে এক লক্ষ টাকা ছিল। এই সময় চার দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে টাকার ব্যাগটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। হারাধন বাধা দিলে দুষ্কৃতীরা তার মাথায় গুলি করে টাকার ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ আহত হারাধনবাবুকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।"

পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি। এক, সংবাদের বিষয়গুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো, যাতে পাঠক যেটা আগে জানা দরকার তা জানতে পারে। দুই, কতটা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে সেটা বিবেচনা করে লেখা। ধরা যাক লেখাটি আছে চারশো শব্দের, কিন্তু জায়গা আছে আড়াইশো শব্দের মতো, তখন ছোটো করতে হবে। যদি তলা থেকে কেটে ছোটো না করা যায় তাহলে পুনর্লিখন করা ছাড়া উপায় নেই। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, পুনর্লিখনের সময় দেখতে হয় যাতে পুনরাবৃত্তি যতখানি সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া যায়। পুনরাবৃত্তি লেখার আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

১৯.৪ সম্পাদনা চিহ্ন

অবর-সম্পাদকরা যখন কপি সম্পাদনা করেন তারা নিজেদের বক্তব্য বোঝার জন্য কপির ওপর বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করেন। কম্পোজিটর এই চিহ্ন দেখে বুঝে যান সম্পাদকের বক্তব্য কী। চিহ্ন দেখে তারপর তাঁরা কপি থেকে কম্পোজ করেন।

কপিতে প্রথমেই যে চিহ্নটি ব্যবহার করার দরকার হয় তাহল অনুচ্ছেদ চিহ্ন। একটি নতুন অনুচ্ছেদ শুরুর সময় বাঁদিকে কিছুটা সাদা জায়গা থাকে। সাদা জায়গার এই ব্যবহার অনুচ্ছেদ তৈরিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পাদক যদি মনে করেন কোনো জায়গায় এসে নতুন অনুচ্ছেদ শুরু করা দরকার তাহলে তিনি একটি চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন এই জায়গা থেকে নতুন অনুচ্ছেদ হবে। চিহ্নটি হল '[', একেবারে তৃতীয় বন্ধনীর মতো দেখতে। কম্পোজিটর এই চিহ্নটি অনুযায়ী নতুন অনুচ্ছেদ তৈরি করবেন। ঠিক একইভাবে দুটি অনুচ্ছেদ যোগ করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবার দরকার পড়ে তাহলে সম্পাদক প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মধ্যবর্তী জায়গায় এই চিহ্ন ব্যবহার করবেন। প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ অংশ থেকে চিহ্নটি শুরু হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমে। যিনি কম্পোজ করবেন, তিনি বুঝে যাবেন, যেখান থেকে চিহ্নটি শুরু হচ্ছে সেই লাইনের সঙ্গে চিহ্নটি যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানকার লাইনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সম্পাদনার সময় হামেশাই এই চিহ্নের ব্যবহার করতে হয় সম্পাদককে।

অনেক সময় দুটি শব্দ জুড়ে যায়। দুটি শব্দকে আলাদা করার জন্য একটি সোজা বড় দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে শব্দ দুটির আলাদা স্বাতন্ত্র বোঝানো হয়। যেমন ভারত | সরকার, দাঁড়ি চিহ্নটি দিলে কম্পোজিটর বুঝে যাবেন শব্দ দুটিকে আলাদা করতে হবে। একটি শব্দ যদি আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এরকম ⌒ চিহ্ন দিয়ে ছাড়া দুটি শব্দকে এক করতে হবে। যেমন বিশ্ব ⌒ বিদ্যালয়, চিহ্নটি বুঝিয়ে দেবে বিশ্ববিদ্যালয় হল একটি শব্দ।

বাক্যবিন্যাসে অনেক সময় অক্ষর অথবা শব্দ বাদ যায়। এই বাদ যাওয়া অক্ষর অথবা শব্দকে বিন্যাসের মধ্যে ঢোকাবার জন্য ⋀ ক্যারেট চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেখানে অক্ষর বা শব্দ ঢোকবার দরকার সেখানে এই ক্যারেট ⋀ চিহ্ন দিয়ে ওপরে অক্ষর বা শব্দটি লিখে দিতে হবে। যেমন 'নি দিতা' হবে 'নি⋀বে দিতা আবার শব্দও বাদ যেতে পারে। যেমন সূর্য ⋀ওঠে পূর্ব দিকে।

সম্পাদনার সময় ধরা পড়তে পারে যে কয়েকটি অক্ষর হয়তো উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। যে অক্ষরের আগে থাকার কথা সে চলে গেছে পরে, আর যার পরে থাকার কথা সে চলে এসেছে আগে। অক্ষরগুলিকে তখন ঠিক জায়গায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিতে হয়। এর চিহ্নটি হল ┌┐└┘ বা └┘┌┐, কম্পোজিটর এই চিহ্নের সূত্র ধরে সঠিকভাবে বা অক্ষর সাজাতে পারবে। যেমন 'গাছপালা' শব্দটি ভুল করে 'গাপাছলা' হয়ে যেতে পারে। তখন চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে হবে 'গা ┌পা┐└ছ┘লা'। এতেই কাজ হবে, কম্পোজিটর শুধরে

লিখবেন 'গাছপালা'। আবার বাজপেয়ী আসছেন কলকাতায় এই বাক্যটিকে পাল্টে বাজপেয়ী কলকাতায় আসছেন লেখা যায়।

অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করতে হলে অবর-সম্পাদক কপির মার্জিনে সংযোজিত অংশ লিখে একটি বৃত্তের চিহ্ন দিয়ে সোজা তীর টেনে ক্যারেট চিহ্নের ওপর নিয়ে আসবেন। যেমন 'সেলিমের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করল পুলিশ। এখানে 'সমস্ত অস্থাবর' কথাটা তীর চিহ্ন দিয়ে ঢোকানো হল।

এরকম আরও অনেক চিহ্ন আছে যা কপি সংশোধনের সময় অবর-সম্পাদক ব্যবহার করে থাকেন। অল্পকাল হল অবশ্য কমপিউটারে সম্পাদনা হচ্ছে। তাই চিহ্ন দিয়ে সম্পাদনার প্রয়োজন হচ্ছে না। শুধুমাত্র কমপিউটারের বোতাম টিপে আর মাউস ক্লিক করেই ইচ্ছে মতন শব্দের ও বাক্যের ওলোট—পালোট করা যায়।

টাইপসজ্জা: ছাপা লেখা তৈরি হয় টাইপ দিয়ে। বিভিন্ন মাপের এবং ধরনের টাইপ ব্যবহার করে মুদ্রণকে অভিনব ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়। ছাপতে গেলেও সাজাতে হয়। যা ছাপা হবে তা যাতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার জন্য পরিকল্পিত প্রয়াসের প্রয়োজন। এই প্রয়াসের অন্যতম অঙ্গ হল টাইপসজ্জা। কোন্ রচনায় কী টাইপ ব্যবহার হবে, তার সাইজ ও ধরন কেমন হবে, তা নির্ধারণ করেই টাইপসজ্জার রূপরেখা তৈরি করা হয়।

একজন দক্ষ অবর-সম্পাদককে টাইপসজ্জা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। শিরোনাম ও সংবাদ একই মাপের অক্ষরে হয় না। শিরোনামের মাপ হয় অনেক বড়। সংবাদের অক্ষর হয় অনেক ছোট। আবার অনেকসময় সংবাদের সূচনা তৈরি হয় বোল্ড ফেসে। অক্ষরগুলো বেশ ঘন কালো থাকে। কোথায় কী হবে সেটা নির্দেশ করে দেওয়া দরকার। সম্পাদনার সময় অবর-সম্পাদকই এগুলো ঠিক করেন। প্রয়োজন হলে প্রেসে গিয়ে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে হয়।

ইংরেজিতে টাইপ ফেস দুরকম সেরিফ ও সান্স। সেরিফ একটু সূক্ষ্ম রেখা বিশিষ্ট, সান্সে কোন সূক্ষ্মতা নেই। 'সান্স' টাইপ একটু মোটা, ভোঁতা ধরনের। 'স্টেটসম্যানের টাইপ 'সেরিফ', নাম সেঞ্চুরি। 'হিন্দুর' টাইপ সান্স', নাম হেলভেটিকা।

টাইপের মাপকে পয়েন্ট বলে। সাধারণত ১ ইঞ্চির, $\frac{১}{৭২}$ অংশ হল ১ পয়েন্ট। এই মাপ অনুসারে টাইপ ৫$\frac{১}{২}$, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৬০, ৭২ পয়েন্ট পর্যন্ত হতে পারে। ৭২ পয়েন্ট হল ১ ইঞ্চি। এর চেয়ে বড়ো হরফের দরকার পড়লে ক্যামেরার সাহায্যে বড়ো করে নেওয়া যায়।

টাইপের আয়তনও গুরুত্বপূর্ণ। সব টাইপের আয়তন একই রকম হয় না। আয়তনের হিসেব হল ১ ইউনিট। AB হল ১ ইউনিট। বাংলায় ক, খ হল ১ ইউনিট। MW, ঝঞ হল ১$\frac{১}{২}$ ইউনিট। ইংরেজি I, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি হল $\frac{১}{২}$ ইউনিট।

টাইপের তিনটি পরিবার আছে। এগুলি হল আদল (face), শ্রেণি (font) এবং পরিবার (family)। আদল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নক্সা। শ্রেণি হচ্ছে অক্ষরের একটি বিশেষ ধরনের নক্সার সামগ্রিক রূপ। আর পরিবার হল একই শ্রেণির বিচিত্র অক্ষরের সমষ্টি। যেমন হাল্কা (light), ছড়ানো (expanded) মধ্যম (medium), স্থূল (bold), ঘনসন্নিবিষ্ট (condensed), বাঁকা (italic) ইত্যাদি বিচিত্র রকমের টাইপ হতে পারে।

টাইপের প্রস্থ মাপা হয় পয়েন্ট দিয়ে। তবে বলার সময় বলা হয় 'এম'। একটি ইংরেজি 'এম' অক্ষর বারো পয়েন্টের। এর অপর নাম হল 'পাইকা এম'। 'এম' দেখতে চৌকো। তাই এর মাপ হল ১২×১২ = ১৪৪ বর্গ বিন্দু। অক্ষর দিয়ে লেখা সাজানোর সময় এইসব হিসেব বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। একটি রচনাকে দৃষ্টিনন্দন করে উপস্থাপনার ব্যাপারে টাইপসজ্জার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯.৫ মার্জিন

লক্ষ করলে দেখা যাবে, যেকোনো মুদ্রিত রচনার দুই প্রান্তে সাদা অংশ থাকে। এই সাদা অংশকেই বলে মার্জিন। কম্পোজ করার সময় উভয় দিকের মার্জিন সমান রাখা হয়। মার্জিনের সাদা অংশ পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। পাঠক তরতর করে পড়ে যেতে পারে। এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে অনেক সহজে এগোন যায়। খবরের কাগজে সাধারণত কলামের মধ্যে সমান মাপের লাইন সাজানো থাকে। মার্জিন থেকে মার্জিন মেপে লাইনের মাপ করতে হয়। কলামেরও একটি নির্দিষ্ট মাপ থাকে। কলামের দুদিকে সামান্য সাদা অংশের মার্জিন রেখে লাইনগুলি বসাতে হয়। কলামের প্রস্থ যদি ১২ এম হয় তাহলে লাইনের মাপ হবে ১১$\frac{১}{২}$ এম। হাফ এম জায়গা বন্টিত হবে দুদিকে। যেকোনো রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়াতে ও উপস্থাপনাকে দৃষ্টিনন্দন করতে মার্জিনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কম্পোজ হবার পর অবর-সম্পাদককে এই মার্জিনের ব্যবহার যথাযথ হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হয়।

১৯.৬ শিরোনাম রচনা

সংবাদ পরিবেশনে শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদের নির্যাসটুকু ধরা থাকে শিরোনামে। পাঠক কাগজে চোখ রেখে প্রথমেই দেখেন শিরোনাম। যার পুরো সংবাদ পড়ার সময় নেই, তিনি শিরোনাম দেখেই জানতে পারেন দিনের খবর কী। শিরেনামের মধ্যেই সংবাদের মূল বিষয়টি ধরা থাকে। দেখলেই বোঝা যায় কী ঘটেছে।

সংবাদপত্র প্রকাশনার প্রথম যুগে শিরোনামের ব্যবহার ছিল না। সে সময় কাগজে পরপর সাজানো থাকত কিছু লেখা। সংবাদের ওপরে থাকত কেবলমাত্র লেবেল। ওষুধের শিশির পরিচিতির মতো। লেবেল দেখে আভাস পাওয়া যেত সংবাদ কাহিনির বিষয়বস্তুর। এ ছাড়া একটা লেখার সঙ্গে আরেকটি লেখার

কোনো পার্থক্যও করা যেত না। পর পর সংবাদ পড়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না পাঠকের কাছে।

শিরোনামের চল শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। গৃহযুদ্ধের খবরকে, মেক্সিকো যুদ্ধের সংবাদকে তাড়াতাড়ি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য শিরোনাম ব্যবহৃত হতে থাকে সংবাদপত্রে। এরপর আসে হলুদ সাংবাদিকতার যুগ। হলুদ সাংবাদিকতা বলতে বোঝায় চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতা। নাটকীয়ভাবে, চমকসৃষ্টি করে সংবাদ পরিবেশন করা শুরু হয় এই সময়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বড়ো শিরোনামের প্রচলন হয় দ্রুত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শিরোনামকে আরও জনপ্রিয় করে এবং শিরোনাম প্রতিদিনের সাংবাদিকতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে শিরোনামই সংবাদপত্রের প্রাথমিক পরিচয়। পাঠক কাগজ হাতে নিয়ে প্রথমেই চোখ বোলান শিরোনামে, যা নাটকীয়ভাবে চমক দিয়ে ঘোষণা করে দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী শিরোনাম তৈরি হয়। প্রথম পাতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের শিরোনাম সবচেয়ে বড়ো আকারে থাকে। আট, সাত অথবা ছ কলাম জায়গা নিয়ে খুব বড় হরফে ছাপা হয় দিনের সবচেয়ে বড়ো খবর। তারপর সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী শিরোনামের আয়তন ছোটো হতে থাকে। বিভিন্ন মাপের শিরোনাম পাঠককে বলে দেয় কোনটি আগে পড়তে হবে। কেবল শিরোনামে চোখ বুলিয়েই পাঠক বেছে নিতে পারেন তার পছন্দের সংবাদটি। শিরোনামের এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে বলে সূচী (indexing) তৈরি করে দেওয়ার কাজ। সংবাদপাঠে শিরোনাম পাঠকের সহায়ক হয়ে ওঠে।

একটা পাতায় অনেকগুলি সংবাদ থাকে। প্রতিটি সংবাদের থাকে একটি করে শিরোনাম যা বিভিন্ন সংবাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। খুব সহজে পাঠক একটি সংবাদকে আলাদাভাবে চিনতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে পৃষ্ঠা সজ্জায় আসে বৈচিত্র্য—অঙ্গসজ্জাকে মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলে। সব শিরোনামের চেহারা একরকম হয় না। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম একটি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত হতে পারে। কী ধরনের শিরোনাম ব্যবহার হবে, তা নির্ধারিত হবে সম্পাদনার সময়।

শিরোনাম রচনা: শিরোনাম লেখা হয় সম্পাদনার সময়। জায়গা বুঝে অবর-সম্পাদক সংবাদের মূল বিষয়টি আশ্রয় করে শিরোনাম রচনা করবেন। রিপোর্টার অথবা প্রতিবেদক সংবাদ প্রতিবেদন লেখেন, কিন্তু এ প্রতিবেদনের শিরোনাম দেন অবর-সম্পাদক। অবর সম্পাদক সংবাদ প্রতিবেদনটি ঘষামাজা করে ছাপার উপযুক্ত করে যখন গড়ে তোলেন, তখনই জুড়ে দেন একটি উপযুক্ত শিরোনাম।

শিরোনাম রচনায় শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত দক্ষতা ও বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার। অল্পকথায় ঠিক শব্দচয়ন শিরোনামকে সার্থক করে তোলে। এমন শব্দ নির্বাচন করতে হবে যা সংবাদের বিষয়কে যথাযথভাবে তার রূপ ও ভাব বজায় রেখে প্রকাশ করতে পারে। ঠিক যা ঘটেছে, তা ঘটনার মেজাজটুকুসহ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সহজ ছোট শব্দ দিয়ে কাজ সারতে হবে। সোজাসুজি বিষয়টি পৌঁছে দেওয়া

দরকার পাঠককে। উপমা, রূপক, অলংকারের ব্যবহার একেবারেই চলবে না। তাহলে কথার ভাবে আসল বক্তব্য তলিয়ে যাবে। একটি ঘটনার মধ্যে থাকে নাটকীয়তা, অভিনবত্ব ও চমক। শিরোনামে এই মেজাজটা ধরে রাখা দরকার।

খবর হল প্রধানত ঘটনা। একটা ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনার ক্রিয়াশীলতা উপস্থিত থাকবে শিরোনামে। 'মানুষ কুকুরকে কামড়েছে' হল একটি দারুণ খবর। এই খবরে 'কামড়েছে' ক্রিয়াপদটি আছে বলে শিরোনামটি হয়েছে জোরালো। কোনো ঘটনার কথা বলতে গেলে ঘটনাটি ঘটার কথা অনিবার্যভাবে আসবে। সে দুর্ঘটনা হোক অথবা সামরিক অভ্যুত্থান হোক, যাই ঘটুক না কেন তা সঠিকভাবে বলতে গেলে ক্রিয়াপদের ঠিক ব্যবহার করতেই হবে। একটি ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য-ক্রিয়াপদের মাধ্যমেই তুলে ধরা যায়।

শিরোনামে যে-ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, তার রূপ হয় বর্তমান কালের। আজকে যা ছাপা হচ্ছে, তা কালকের ঘটনা। স্বভাবতই অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? একটু ভেবে দেখুন, একটা খবর পাঠক যখন পাচ্ছে, তখনও সেটা টাটকা ও তাজা। এইমাত্র পাঠক জানল কী ঘটেছে। এই তরতাজা টাটকা ভাবটি ধরে রাখার জন্যই বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়। পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, ঘটনাটি এইমাত্র ঘটেছে। অনেক সময় ক্রিয়াপদ উহ্য রাখা হয়। যেমন 'শুরুতেই অঘটন', এই শিরোনামে ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়েছে। 'ঘটল' এই ক্রিয়াপদটি পাঠক বুঝে নেবে। এমনটা ধরে নিয়েই শিরোনামটি তৈরি করা হয়েছে।

মন্তব্য থাকবে না শিরোনামে, থাকবে শুধু খবর। যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে শিরোনাম লিখতে হবে। মন্তব্য পক্ষপাতের অবতারণা করে। পাঠকরা খবর চায়, মতামত চায় না। শিরোনামে যদি মন্তব্য থাকে, তাহলে পাঠকরা বুঝবে জোর করে পাঠকের মতামতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা কমবে, নিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবে।

অনেক সময় শিরোনামে কোটেশন ব্যবহার করা হয়। যদি কারোর উক্তি ঢোকানো হয়, তাহলে কোটেশন ব্যবহার করা উচিত। সন্দেহ থাকলেও কোটেশন ব্যবহার হতে পারে। যেমন কোনো মন্ত্রীর মেয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন খবর এসেছে। পুলিশ কিন্তু আত্মহত্যার কথা বলছে না। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে এটা আত্মহত্যার ঘটনা। সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। তাই কোটেশন দিয়ে "মন্ত্রীর মেয়ের আত্মহত্যা" শিরোনাম তৈরি করা যেতে পারে।

উপ-শিরোনাম: সংবাদের দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে বসে এই শিরোনাম। একটি নতুন প্রসঙ্গ অথবা বিষয়ের অবতারণা করার সময় এই উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। পাঠককে সংবাদের বিষয়বস্তু ভালোভাবে বোঝানোর জন্যই এই শিরোনাম দেওয়া হয়। একটি নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও এইরকম শিরোনাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একটি বিষয়ের সঙ্গে নানান প্রসঙ্গ জড়িয়ে থাকে। কোনো নতুন প্রসঙ্গে যাওয়ার সময় উপ-শিরোনাম দিয়ে শুরু করা ভাল।

উপ-শিরোনাম পাঠকের চোখকে বিশ্রামও দেয়। লম্বা লেখার মধ্যে উপ-শিরোনাম মরূদ্যান হয়ে ওঠে। ঘন অক্ষরের ধূসরতা ভেঙে স্বস্তি দেয় পাঠককে। লাইনের মাঝখানে এমনভাবে সেট করা হয় যাতে লাইনের দু'পাশে সমান বেশি সাদা জায়গা থাকে। খুব অল্প শব্দে লিখতে হয় এই শিরোনাম। কারণ জায়গা থাকে খুব কম। উপ-শিরোনাম দু'ধরনের হয়। সেন্টারড হেড এবং সাইড হেড। কলামের মাঝখানে বসলে সেন্টারড এবং বাঁদিক বা ডানদিক চেপে বসলে সাইড হেড। ঘন ঘন উপ-শিরোনাম দেওয়া ঠিক নয়। চার-পাঁচ অনুচ্ছেদ অন্তর একটি করে উপ-শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে।

১৯.৭ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে সংবাদ রচনা, সংবাদপত্র পরিচালনা, সম্পাদনা সংক্রান্ত বহুবিধ দিক সম্পর্কে প২াথমিক দারণা তৈরি হবে। সম্পাদনার চিহ্ন থেকে মার্জিন, শিরোনাম প্রভৃতি প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন শিক্ষার্থী, যা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের সম্পাদনার কাজ, সংবাদপত্র পরিচালনার কাজে উৎসাহ জোগাবে।

একক ২০ ❑ অঙ্গসজ্জা

গঠন

২০.১ উদ্দেশ্য

২০.২ অঙ্গসজ্জা

২০.৩ গ্রন্থ সম্পাদনা

২০.৪ সাময়িকপত্রিকা সম্পাদনা

২০.৫ সারসংক্ষেপ

২০.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমাদের আলোচ্য বিষয়—

- সংবাদপত্রের পাতার অঙ্গসজ্জা সংক্রান্ত বিষয়
- অঙ্গসজ্জার নীতি-নিয়ম থেকে অঙ্গসজ্জার বহুমাত্রিক রূপ
- প্রুফ রিডিং-এর খুঁটি-নাটি বিষয় থেকে প্রুফ রিডারের কাজ
- গ্রন্থ সম্পাদনা ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা সংক্রান্ত বিষয় ও সম্পাদকের কর্তব্য

২০.২ অঙ্গসজ্জা

সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হল অঙ্গসজ্জা। একটি পাতায় যে লেখাগুলো ছাপা হবে সেগুলোকে সাজাতে হয়। এলোমেলো করে খুশিমতো সাজালে হবে না, পাঠোপযোগী ও দৃষ্টিনন্দন করে সংবাদগুলিকে পরিবেশন করতে হয়। ছবি, শিরোনামের বৈচিত্র্য, কার্টুন, রুল প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা করা হয়। একটি কাগজের যদি ১২ টি পৃষ্ঠা থাকে তাহলে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে আলাদাভাবে সাজাতে হবে। যেমন, প্রথম পৃষ্ঠায় সাধারণত ৭ থেকে ৮ টি সংবাদ কাহিনি থাকে। বড়ো ছবি থাকলে সংবাদ কাহিনি ৬-য়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে যে জায়গা থাকে সেখানেই অঙ্গসজ্জা করতে হয়। প্রথম পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পৃষ্ঠাই হল সংবাদপত্রের প্রাথমিক পরিচয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ছবি এই পাতাতেই থাকে।

প্রথম পাতায় সব সংবাদের জায়গা হয় না। সবচেয়ে বড় খবরকে প্রথম পাতায় এনে বাকি খবরকে নিয়ে যাওয়া হয় ভিতরের পাতায়। তবে সবসময় চেষ্টা করা হয়, যাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম

পাতায় জায়গা পায়। খেলাধুলা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের জনা আলাদা পাতা থাকে। ঐ সব পাতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্পাদকীয় মতামতের জন্য আলাদা একটি পাতা থাকে। সেখানে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও উত্তর সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র প্রভৃতি বিষয় ছাপা হয়। উত্তর সম্পাদকীয় হল সম্পাদকীয় নিবন্ধের পরে মধ্যবর্তী জায়গায় যে রচনা প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠাসজ্জার কাজ শুরু হয় ডামি সীটের ওপর। ডামি সীট হল কাগজের পাতার একটি নকল রূপ। কাগজের মাপ, কলামের মাপ সবই উল্লিখিত থাকে এই সীটে। বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে এই ডামি সীট এসে পৌঁছায় সম্পাদকীয় বিভাগে। যে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন ছাপা হবে, সেইসব জায়গায় চিহ্ন দিয়ে বিজ্ঞাপনের জায়গা বুক করা থাকে। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর-সম্পাদক বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট জায়গা বাদ দিয়ে যে জায়গা থাকে, সেখানে বিভিন্ন সংবাদকে সাজান। কলাম, সেন্টিমিটার নির্দেশ করে এক একটি সংবাদকে উপযুক্ত জায়গায় বসিয়ে, ছবির জায়গা নির্দিষ্ট করে, রুল, বক্স কোথায় কী বসবে তা নির্ধারণ করলেই অঙ্গসজ্জার প্রাথমিক কাজটুকু সারা হয়ে যায়। বিভিন্ন সংবাদ এক এক রকম আয়তন নিয়ে পরিবেশিত হয়। কোনো সংবাদ তিন কলম জায়গা নিতে পারে, আবার কোনো সংবাদ এক কলাম জায়গা নিতে পারে। ছ, সাত কলাম জায়গা নিয়েও সংবাদ পরিবেশিত হয়। অনেক সময় কোন সংবাদ কতটা জায়গা পাবে সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাই ঠিক করেন।

অঙ্গসজ্জার সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে সংবাদের মূল্য ঠিকভাবে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে সবচেয়ে ভালো জায়গায় দিতে হবে। পাঠক চোখ রাখলেই যেন দিনের প্রধান খবরকে খুঁজে পায়। বড়ো হরফে, বেশি জায়গা নিয়ে এই সংবাদটি পরিবেশিত হবে। এরপর গুরুত্ব ক্রমানুসারে অন্যান্য সংবাদকে সাজাতে হবে। সংবাদ কাহিনিগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হবে যাতে গুরুত্ব অনুধাবন করে খুশিমতো পাঠক সহজে একটি বিষয় থেকে আরেকটি বিষয়ে চলে যেতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা অঙ্গসজ্জাকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে হবে। পাঠক যেন পাতায় চোখ রেখে উপলব্ধি করতে পারে সজ্জাটি সুন্দর ও স্মার্ট।

নীতি: অঙ্গসজ্জার মূল নীতি হল পাঁচটি — ভারসাম্য (balance), কেন্দ্রবিন্দু (focus), বৈপরীত্য (contrast), গতি (movement) এবং একতা (unity)। ভারসাম্য দু'ধরনের হতে পারে — বিধিসম্মত ও বিধি-বহির্ভূত ভারসাম্য। অঙ্গসজ্জায় বিধিসম্মত ভারসাম্য নিয়ে আসা খুবই সহজ। এই সজ্জার মূল কথাই হল পৃষ্ঠার ডানদিক ও বাঁদিক একইভাবে সাজাতে হবে। অর্থাৎ ডানদিকে তিন কলাম সংবাদ থাকলে বাঁদিকেও তিন কলাম সংবাদ রাখতে হবে। একইভাবে ডান ও বাঁদিকে এক কলাম সংবাদ বসবে। ওপর নীচেও সাদৃশ্য থাকা দরকার। তাই ওপর নীচে সমান ওজনের গুরুত্ব দিতে হবে। বিধিবহির্ভূত ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এত বাধ্যবাধকতার চাপ নেই। সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য নিয়ে আসাটাই বড়ো কথা। শিরোনাম, কলাম, রুল, ছবি ব্যবহার করে ভারসাম্যের চাহিদা মেটানো যায়। এই ধরনের অঙ্গসজ্জার প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে ভারসাম্যের সম্পর্ক রয়েছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু স্থির করতে হয়। কেন্দ্রবিন্দু স্থলই হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানেই থাকবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি। পাঠকের দৃষ্টিকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রবিন্দুর স্থান এক-এক কাগজে এক-এক রকম হয়। কোনো কাগজে ডানদিকে থাকে, আবার কোনো কাগজে বাঁদিকে থাকে। কেন্দ্রবিন্দু থেকে চোখ ক্রমশ সরে যাবে বিভিন্ন দিকে। চোখের গতি বাঁদিকে ডানদিকে তারপর আস্তে আস্তে নীচের দিকে সরে যায়।

অঙ্গসজ্জায় বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন আছে। নান্দনিক ও কার্যকরী উভয়দিক থেকে বৈপরীত্য অঙ্গসজ্জাকে সফল করে তোলে। দু'রকমের হরফসজ্জা দিয়ে বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এতে সৌন্দর্যও যেমন বোঝানো যায়, তেমনি সংবাদের গুরুত্বের প্রতিও পাঠকের আকর্ষণ ধরে রাখা যায়। ডিসপ্লে ও বডি টাইপ দিয়ে তারতম্য নিয়ে আসা যায়। আবার বোল্ড ফেস ও লাইট ফেস টাইপ দিয়েও বৈপরীত্য আনা যায়। বিভিন্ন মাপের শিরোনাম সহজেই বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

যেকোনো শিল্পকর্মের সঙ্গে গতির যোগ থাকে। অঙ্গসজ্জাও এক ধরনের শিল্পকর্ম বলা যেতে পারে। তাই অঙ্গসজ্জাতেও গতি আনা প্রয়োজন। পাঠকের দৃষ্টি একটি পাতায় ঘুরে ফিরে সংবাদ খোঁজে। একটি সংবাদের কিছুটা পড়ে অন্য শিরোনামে চোখ চলে যায়। তারপর আবার অন্য সংবাদে। এটা যত সহজে হয়, ততই অঙ্গসজ্জা সফল।

অপর এক অপরিহার্য দিক হল একতা। একই পরিবারের হরফ ব্যবহার করে সহজে একতা নিয়ে আসা যায়। যেমন সেঞ্চুরি বোল্ড টাইপ ব্যবহার করলে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে কাগজের মৌলিকত্ব বজায় থাকে। এক-একটি কাগজে এক-এক ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হয়। পাঠক ঐ হরফের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। স্টেটসম্যান ও টেলিগ্রাফ কাগজ বিশেষ একধরনের হরফ ব্যবহার করে। শুধু হরফ দিয়ে নয়। ছবি, কলা ও সংবাদ-কাহিনি বিন্যাস দিয়েও এই একতা ধরে রাখা যায়।

অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন রূপ: অঙ্গসজ্জারও রকমফের আছে। প্রাথমিকভাবে অঙ্গসজ্জা সমান্তরাল (Horizontal) হতে পারে আবার উলম্ব (Vertical) হতে পারে। সমান্তরাল অঙ্গসজ্জায় মূল ঝোঁক থাকে সংবাদগুলিকে সমান্তরালভাবে পরিবেশন করার দিকে। সংবাদগুলিকে দু-তিন কলামে পরিবেশন করলেই এটা সম্ভব। উলম্ব অঙ্গসজ্জায় মূল ঝোঁকটা থাকে ওপর থেকে নীচে। এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যাতে পাঠকের চোখ উলম্বগতিতে অনুসরণ করে।

অঙ্গসজ্জার রূপ অনুযায়ী বেশ কয়েক ধরনের অঙ্গসজ্জা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এগুলি হল ব্রেস মেকআপ (Brace make-up), ম্যাগাজিন মেক-আপ (Magazine make-up), সার্কাস লে-আউট (Circus lay-out), মডুলার লে-আউট (Modular lay-out), ট্যাবলয়েড মেক-আপ (Tabloid make-up)।

ব্রেস মেকআপে গুরুত্ব দেওয়া হয় পৃষ্ঠার ওপরের ডানদিকের কোণে। অনেকটা ছকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। ম্যাগাজিন মেক-আপ নান্দনিক বোধ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। সাধারণত সাময়িকপত্রের আদলে

এই মেক-আপ তৈরি হয়। সাম্প্রতিককালে এই মেক-আপের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্কাস লে-আউটে বড়ো শিরোনাম, রঙিন হরফ ও আলোকচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। বিন্যাসে তিনটি চক্রের একটা লে-আউট উঠে আসে। তিন রিং বিশিষ্ট সার্কাস থেকে এই লে-আউটের উদ্ভব হয়েছে। ওপরের দিকের সজ্জা এমন করা হয় যাতে মনে হয় বড়ো কিছু ঘটেছে। মডুলার লে-আউটে আয়তক্ষেত্রের মাপে সংবাদ কাহিনিগুলিকে পরিবেশন করা হয়। ধরা যাক, চারটি সংবাদ-কাহিনি পৃষ্ঠার চার কোণে দেওয়া হল। আটটি কাহিনিও হতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রই নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে থাকে। তবেই সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠার একতাকে কখনই নষ্ট করবে না। ট্যাবলয়েড মেক-আপ নাটকীয় পরিবেশনার ওপর বেশি জোর দেয়। ট্যাবলয়েড হল ছোটো কাগজ। প্রতি সংবাদপত্রের যে-মাপ, তার অর্ধেক হল ট্যাবলয়েডের মাপ। একদম প্রথম পাতায় ছবি ও সংক্ষিপ্ত বড়ো শিরোনাম হবে অত্যন্ত আকর্ষক—দেখামাত্রই যেন পাঠকের চোখ আটকে যায়। সাধারণত সান্ধ্য কাগজের মেক-আপ এমন হয়।

অঙ্গসজার সময় কতকগুলি সাধারণ সূত্র মনে রাখতে হবে। এগুলো মনে রাখলে কাজের সুবিধা বেশি। এগুলো হল—(১) কাগজের নাম থাকবে সবচেয়ে উঁচুতে। (২) ওপরের বাঁদিক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বড়ো খবর ঐ জায়গাতে রাখাই শ্রেয়। (৩) সংবাদ-কাহিনিগুলি গুরুত্ব অনুযায়ী নিচে নেমে যাবে। (৪) শিরোনামের মাপ ক্রমশ নীচের দিকে ছোটো হবে। (৫) একটি শিরোনাম যেন আরেকটি শিরোনামের সঙ্গে মিশে না যায়। সামান্য হলেও বৈপরীত্য রাখতে হবে। (৬) শিরোনাম বিন্যাসে একটু বৈচিত্র্য আনা দরকার। (৭) ছবির ব্যবহার হলে ভালো, কারণ তাতে বডি টাইপের ধূসরতা ভেঙে যায়। (৮) দু-কলামের মধ্যে বেশি সাদা জায়গা রাখা উচিত নয়। সাদা জায়গা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (৯) উৎকর্ষের প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙতে হবে, এতে অঙ্গসজ্জার সৃজনশীল দিকটি অটুট থাকে।

প্রুফরিডিং: যেকোনো রচনাকে নিখুঁত করে গড়ে তুলতে প্রুফরিডিং দারুণভাবে সাহায্য করে। কোনো রচনা কম্পোজ হওয়ার পরে প্রথম ছাপা তোলা হয় কাগজে। একে বলে গ্যালি প্রুফ। এক কলামে ছাপা এই প্রুফ মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন প্রক্রিয়ার নাম প্রুফ রিডিং। মূল রচনায় যা আছে, কম্পোজ করার পর প্রথম ছাপায় তা হুবহু থাকে না। প্রচুর ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। এগুলো প্রুফরিডিং-এর সময় সংশোধন করা হয়। যিনি প্রুফরিডিং করেন, তাকে বলা হয় প্রুফরিডার। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশনায় প্রুফরিডারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মূল রচনার সঙ্গে গ্যালি প্রুফ মিলিয়ে যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করে দেন। এই সংশোধন মুদ্রিত রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

ব্যুরো অফ ইণ্ডিয়ান স্টান্ডার্ড প্রুফ রিডিংয়ের কতকগুলি সাধারণ সূত্র ও বিধি দিয়েছেন যা মেনে চললে দেশের সমস্ত প্রকাশনার ত্রুটি সংশোধনে এক ধরনের সমতা আসবে। বি. আই. এস-এর নির্দেশ মতো পাঁচটি বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলি হল (১) বিষয়গত ত্রুটি (text), (২) যতিচিহ্ন

(punctuation), (৩) স্থানের নির্দেশ (spacing), (৪) সমতা (alignment) এবং (৫) হরফ (type)।

প্রুফরিডারের কাজ: খুব সতর্কভাবে মূল পাঠের সঙ্গে গ্যালি প্রুফকে মিলিয়ে দেখতে হবে। মূল পাঠে যা আছে, তা অনুসরণ করে প্রুফে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে তা সংশোধন করবেন প্রুফরিডার।

প্রথমেই তিনি বানান ভুল সংশোধন করবেন। কম্পোজ করা ম্যাটারে প্রচুর বানান ভুল থাকে। সেগুলি সংশোধন করতে হয়। একই বইতে অথবা সংবাদপত্রে এক বানান রীতি মেনে চলা দরকার। 'সরকারি' বানান সর্বত্রই একই রকম হওয়া উচিত। এক জায়গায় হ্রস্ব ইকার, আরেক জায়গায় দীর্ঘ ঈ কার দেওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, অক্ষর অনেক সময় উলটে যায়। যেমন ন উলটে এইরকম ছাপা হল, তখন উলটে যাওয়া 'ন'কে ঠিক করে দিতে হবে। অতিরিক্ত কোনো অক্ষর যদি ছাপা হয়, তাহলে তা বাদ দিতে হবে।

তৃতীয়ত, একটি শব্দের মধ্যে অনেকসময় ফাঁক থেকে যায়, তখন তা দূর করে কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। 'সংবাদ পত্র', এরকম থাকলে তা করতে হবে 'সংবাদপত্র'। ঠিক একইভাবে যেখানে ফাঁক থাকা দরকার, সেখানে যদি তা না থাকে, তাহলে তা বসাতে হবে। যেমন—'বামফ্রন্টসরকার' হবে 'বামফ্রন্ট সরকার'।

চতুর্থত, মূল পাঠের কিছু অংশ বাদ যেতে পারে গ্যালি প্রুফে। কম্পোজিটার ভুল করে হয়তো কিছু অংশ বাদ দিয়ে কম্পোজ করেছে। তখন বাদ দেওয়া অংশকে পুনরায় সংযোজিত করতে হবে।

পঞ্চমত, ঠিকঠাকভাবে অনুচ্ছেদ বসাতে হবে। অনেক সময় অনুচ্ছেদের ওলট-পালট হয়ে যায়, তখন তা ঠিক জায়গায় বসাতে হয়।

ষষ্ঠত, তারিখ, সালের ও নামের ভুল থাকলে প্রুফরিডিং-এর সময় তা সংশোধন করে ঠিক করা হয়। প্রুফরিডিং হল শেষ চেক পয়েন্ট। ভুল শোধরানোর শেষ জায়গা।

প্রুফ সংশোধনের চিহ্ন: প্রুফ দেখার সময় মার্জিনের সাদা জায়গায় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়। অফসেট ছাপায় কমপক্ষে দু'বার প্রুফ দেখতে হয়। প্রথম প্রুফ দেখার সময় যে-রঙের কালি ব্যবহার করা হয়, দ্বিতীয় প্রুফ দেখার সময় অন্য রঙের কালি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

হরফ বদল করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে এইরকম চিহ্ন দিয়ে, মার্জিনে '/' এই চিহ্ন দিয়ে যে বদলি হরফ চাওয়া হচ্ছে সেটা লিখে দিলেই হবে। যেমন 'কনকাতা' শব্দে 'ন' পাল্টে 'ল' আনতে হবে। মার্জিনে /ল এইভাবে লিখলেই কম্পোজিটার বুঝতে পারবেন প্রুফরিডার কী পরিবর্তন চাইছেন। একটি শব্দ যদি ভুল করে আলাদা হয়ে যায় তাহলে/চিহ্ন দিয়ে তারপর মার্জিনে এই চিহ্ন দিলেই হবে। হরফ ওলট-পালট হলে মূল পাঠেই বসাতে হবে এই ⊔⊓ চিহ্ন। কোন হরফ বা শব্দ বাদ দিতে গেলে/এই চিহ্ন দিয়ে মার্জিনে চিহ্ন d দিতে হবে। এইরকম অসংখ্য চিহ্ন আছে যা প্রুফ রিডাররা কাজের সময় প্রয়োগ করেন ঠিক জায়গায় এবং এই চিহ্ন দিয়ে কম্পোজিটারকে বুঝিয়ে দেন কাঙ্খিত পরিবর্তনটি কী হবে।

২০.৩ গ্রন্থ সম্পাদনা

একটি ভালো বই মানেই উৎকৃষ্ট মানের সম্পাদিত বই। একটি যথেষ্ট উচ্চমানের পরিকল্পিত প্রয়াস। লেখক বই লেখেন, বাস্তবায়িত করেন তার ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে লেখার মধ্যে। কিন্তু এটুকু সম্পন্ন হলেই ভালোমানের গ্রন্থ উৎপাদন হয় না। লেখকের সৃজনকে যথার্থভাবে গ্রন্থে আবদ্ধ করতে, পাঠযোগ্য করে গড়ে তুলতে দরকার একজন দক্ষ গ্রন্থ সম্পাদক।

সংবাদপত্র প্রকাশনায় যেমন সম্পাদনা অত্যন্ত জরুরি। ঠিক তেমনি গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সম্পাদনার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্পাদক জানেন একটি উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ কীভাবে তৈরি হয়। কী কী শর্ত মানলে প্রকাশনার মান বজায় রাখা যায়। মলাট থেকে বাঁধাই, ছাপার মান, সজ্জা সবকিছুই সম্পাদনার মধ্যে পড়ে। শুধু বই ছাপলেই চলবে না, বই ছাপাকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। রুচি ও উপযোগিতার সমন্বয়ে আকর্ষক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করাই সম্পাদনার উদ্দেশ্য।

সম্পাদকের কর্তব্য: লেখক হলেন গ্রন্থের স্রষ্টা। কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদক হলেন গ্রন্থের রূপকার। গ্রন্থের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব তার। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা থেকে মুদ্রণ, বাঁধাই পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত থাকেন। লেখক যখন রচনায় মগ্ন, সম্পাদক তখন সেই সৃজনশীল রচনাকে কত সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা, পরীক্ষা—নরীক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। প্রয়োজনে লেখককেও তিনি পরামর্শ দিতে পারেন পরিচ্ছেদ, ভাষা, লেখার আয়তন ও প্রকাশন সম্পর্কিত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে।

ছাপার আগে রচনাটি খুঁটিয়ে পড়তে হয় সম্পাদককে। একজন দক্ষ সম্পাদক সবসময়ই হলেন একজন ভালো পাঠক। পড়তে পড়তেই তিনি পাঠযোগ্যতার বিচার করেন। লেখাটি কীভাবে উপস্থাপিত হলে পাঠকদের মন জয় করতে পারে, সে সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা থাকে। পড়তে পড়তেই তিনি নোট রাখেন। পড়া শেষ করার পর যদি কোনো অদলবদল প্রয়োজন মনে করেন, তবে তা তিনি লেখককে জানাবেন। লেখক সম্পাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন, সম্পাদকের হাতেই তাঁর বই নিখুঁত ও মনোরম হয়ে উঠবে।

লেখক লিখতে লিখতে অনেক সময় ছোটোখাটো ভুল করেন। বানান ভুল, অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত ত্রুটি, প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কিত ত্রুটি, একই বিষয় পুনরায় উপস্থাপনের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে চোখ এড়িয়ে যায়। সম্পাদকের সজাগ দৃষ্টিতে এই সব ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে এবং তা সংশোধিত হয়। মুদ্রণ প্রমাদ যে কোনো প্রকাশনের পক্ষে খুবই পীড়াদায়ক। যে বইয়ে বানান ভুল থাকে, সে বই সম্পর্কে পাঠকের ধারণাও খারাপ হয়। সুতরাং সম্পাদনার অন্যতম কাজই হল—মুদ্রণ প্রমাদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা। ছাপার কাজেও তদারকি করতে হয় তাকে। কী কাগজে, কী টাইপে ছাপা হবে তা তিনি নির্ধারণ করেন।

অনুচ্ছেদের উপযুক্ত প্রয়োগ পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। খুব বড়ো বড়ো অনুচ্ছেদ হলে অক্ষর

বিন্যাসের ধূসরতা বৃদ্ধি পায়। চোখের পক্ষে তা একেবারেই আরামদায়ক নয়। পাঠক যাতে পড়ার সময় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তার জন্যই ঠিক অনুচ্ছেদের ব্যবহার করা। অনুচ্ছেদ দেওয়ার ফলে সাদা অংশের ব্যবহার হয় এবং তা অক্ষরের ধূসরতা ভাঙতে সাহায্য করে। একটি পৃষ্ঠায় যদি কমপক্ষে একটি অনুচ্ছেদ থাকে তাহলে পৃষ্ঠাসজ্জা মনোরম হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যেন অনুচ্ছেদ ব্যবহারের সাযুজ্য থাকে। শুধুমাত্র নান্দনিক হলেই চলবে না। বিষয়ের দাবির প্রতি আনুগত্য রাখতে হবে। আবার এটাও সত্য যে, অনুচ্ছেদ বিষয়ভাবনাকেও উপযুক্তভাবে মেলে ধরতে সাহায্য করে। একটি বিষয় পরতে পরতে প্রস্ফুটিত হয়, যদি প্রতি পরত অনুচ্ছেদের দাবি রাখে, তাহলে অবশ্যই সেই দাবি মেটাতে হবে। অনুচ্ছেদ বিষয়ভাবনা এবং পৃষ্ঠাসজ্জা দুটি দিকই সার্থকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

কোনো তথ্যগত ভ্রান্তি যদি থাকে তাহলে তা দূর করতে হবে। অনেক সময় লেখক বিষয়-ভাবনাকে ভালোভাবে পরিস্ফুট করার জন্য বিভিন্ন তথ্য ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্য নেন। লেখার সময় সামান্য ভুল-ত্রুটি হতে পারে। হয়তো লেখকের অজান্তে তথ্যগত কোনো ভুল লেখার মধ্যে থেকে যেতে পারে। অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্রের নাম বদলে যায়। সম্পাদক এই ভুল শুধরে দিতে পারেন। সম্পাদনার সময় সম্পাদক এই ত্রুটি সংশোধন করে ঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিবেশন করবেন। এই পরিমার্জনা যে একটি লেখাকে কতখানি সাহায্য করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘষেমেজে ঝকঝকে করে গড়ে তুলতে সম্পাদনার কোনো বিকল্প নেই।

প্রচ্ছদ বিন্যাসেও সম্পাদকের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। গ্রন্থের বিষয় ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রচ্ছদ তৈরি করতে হয়। একজন শিল্পী বিন্যাসের রূপরেখা তৈরি করেন। কিন্তু শিল্পীকে দিয়ে উৎকর্ষ মলাট তৈরি করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সম্পাদকের। গ্রন্থটির দাবি শিল্পীকে বোঝাবেন তিনি। লেখকের ভাবনার সঙ্গে মলাট সৃজনকে মেলানোর দায়িত্ব বহন করেন সম্পাদক।

একই কথা অনেক সময় ঘুরে ফিরে চলে আসে। যেকোনো রচনার পক্ষে তা একেবারেই কাঙ্খিত নয়। সজাগ সম্পাদক পুনরাবৃত্তি দেখলে সন্তর্পনে তা বাদ দিয়ে দেন। লেখক অজান্তে হয়তো পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। ছাপা হয়ে গেলে তা পাঠের পক্ষে হয়ে উঠবে বিরক্তিকর। সম্পাদক তাই সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন পুনরাবৃত্তির দোষ থেকে লেখাকে মুক্ত করতে। পুনরাবৃত্তি যদি না থাকে, তাহলে লেখার উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী যেকোনো বই-এর জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন। সম্পাদনার সময় যে পরিমার্জনা হয়, তাতে একটি লেখা প্রকৃতভাবে মুদ্রণ উপযোগী হয়ে ওঠে। ছাপার মতো করে একটি গ্রন্থকে প্রস্তুত করার জন্যই দক্ষ সম্পাদক প্রয়োজন। একটি ভালো প্রকাশনা মানেই সেখানে রয়েছে সম্পাদকের সযত্ন প্রয়াস—যা রচনাকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত করে তুলবে।

ভালো প্রকাশনা সংস্থা সর্বদাই দক্ষ সম্পাদক রাখার চেষ্টা করেন। বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ফেবার

অ্যান্ড ফেবারের সম্পাদক ছিলেন এলিয়ট। র‍্যানডম হাইসের সম্পাদক ছিলেন জর্জ মিলার। বাংলা প্রকাশনায় সিগনেট এক সময় খুবই হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। দিলীপকুমার গুপ্তের সযত্ন প্রয়াসে সিগনেট বাংলা প্রকাশনার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে সম্পাদনার গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, লেখক নির্বাচনের কাজেও সম্পাদকরা শেষ কথা বলছেন। প্রকাশক যা চান, সেটা লেখকের কাছ থেকে ঠিকঠাক নিয়ে আসাটাই সম্পাদকের কৃতিত্ব। তারপর সেই লেখাকে ঝকঝকে মুদ্রণে পরিণত করা পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব থাকছে।

২০.৪ সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা

সংবাদপত্র সম্পাদনায় সম্পাদকের ভূমিকা প্রসঙ্গ প্রথম ও বর্তমান এককে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তার কর্মতৎপরতা, দক্ষতা, দূরদৃষ্টি, সমাজ ও পাঠক মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান, সার্থকভাবে ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের সহায়ক। সংবাদপত্রের সমস্ত কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার দায় সেজন্য তার ওপরই বর্তায়। কাগজে প্রকাশিত সমস্ত কিছুর জন্য তাঁকে আইনত দায়ী থাকতে হয়। বস্তুত সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রত্যক্ষত জড়িত। তাই সংবাদপত্রের প্রচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পাদকের গৌরব জড়িত থাকে।

সাময়িক পত্র — সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক-সংখ্যায় সংবাদপত্রের থেকে বিপুল হলেও, তার প্রতিটি এককের প্রচার সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সমাজে প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। বস্তুত, সাময়িক পত্রিকার কম থাকার কতকগুলি বাস্তব কারণও আছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতার স্বল্পতা, দৈনিক পত্রিকা পাঠের পর সাময়িক পত্রিকা পাঠের প্রয়োজনীয়তা বোধের অভাবও অন্যতম হেতু। এক সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সাময়িক পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। বর্তমানের প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার বাৎসরিক সুমারিগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে তার সংখ্যাগত পরিমাণ খুব নগণ্য নয়। প্রতি বৎসরই কিছু কিছু উৎসাহী তরুণ সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী ক্ষণজীবী মাসিক-ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এই সব প্রকাশনায় আত্মপ্রকাশের আবেগ যতটা আছে, নিষ্ঠা যতটা আছে, তুলনায় সাহিত্য শিল্পবোধ প্রায়শ অপ্রতুল।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বেশ কতকগুলি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল—যারা চিন্তার জগতে কাব্য ভাবনায়, নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছেন। তাদের মধ্যে *অনুক্ত*, *এক্ষণ*, *কৃত্তিবাস*, *উত্তরসূরী*, *নতুন সাহিত্য*, *সুন্দর*, *সাহিত্যপত্র*, *পূর্বপত্র*, *কবি ও কবিতা*, *প্রাচীন সাহিত্য*, *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*, *প্রবন্ধ পত্রিকা* অন্যতম। সেই সব বরেণ্য সম্পাদক-পরিচালকরা আজ অনেকেই নেই। তার স্থান অধিকার করেছে আশি-নব্বুইর দশক থেকে কতকগুলি ‘বিশেষ সংখ্যা’ নির্ভর পত্রিকা, যথা *কোরক* এবং *মুশায়েরা*, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, *ধ্রুবপদ*, *কৌশিকী*, *চেতনা* প্রভৃতি। এই সব পত্রিকার যারা সম্পাদনা-পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন, তারা সকলেই আধুনিক চিন্তাধারায় সম্পন্ন। চিন্তার জগতে নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধানে রত। এঁদের কোনো কোনো

সংখ্যা প্রয়াত বা জীবিত লেখক-শিল্পী সম্পর্কে নিবিড় অনুসন্ধানী ও তথ্য সংগ্রহমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ গ্রন্থনায় গভীর মনোনিবেশে সমৃদ্ধ। সমস্যা হল, সাময়িক পত্রিকার জগতে এদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় প্রভাব প্রতিপত্তিও তুলনামূলকভাবে কম। প্রকাশনার সংখ্যা ও বাজার দখলের হিসেবে সাময়িক পত্রিকার স্টল অধিকার করে আছে কতকগুলি দৃষ্টি আকর্ষক উজ্জ্বল মলাটের ঝাঁ-চকচকে পত্রিকা—যারা মানে মর্যাদায় কোনোদিক থেকেই স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়।

সাময়িকপত্র সম্পাদনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিল্পকলা — বিষয়ের বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনার অভিনবত্বে, ভাষা শিল্পের সৌকর্যে এবং প্রয়োজনীয় উৎস নির্দেশে — নিবন্ধের গুরুত্ব বাড়ায়। ভালো সাময়িকপত্রিকা সম্পাদনার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের মতো সর্বতোমুখী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন না হলেও, সাময়িক পত্র সম্পাদনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্কতার সঙ্গে তার মনন ও পত্রিকা প্রকাশের কৃৎকৌশল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখতেই হয়। সাময়িক পত্রিকা হল জনৈক সাংবাদিকের ভাষায় "সম্পাদকের একক প্রদর্শনী"। পক্ষান্তরে সংবাদপত্র যৌথ শিল্প — বহু ব্যক্তির সমবেত দক্ষ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিত্যদিনের সংবাদ পরিবেশিত হয়। কিন্তু সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক পত্রিকার বিষয়বস্তু পরিকল্পনা থেকে লেখক নির্বাচন, সম্ভাবনাময় নতুন লেখক আবিষ্কার করে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিয়ে নেওয়া, লেখার প্রয়োজনীয় সম্পাদনা, মুদ্রণ-তদারকি, সহকারী থাকলে প্রুফ সংশোধন, কাগজ নির্বাচন, অঙ্গসজ্জা পরিকল্পনা, লে-অফ ঠিক করা, প্রচ্ছদ ও ছবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া, এমনকি বাঁধাই সবই সম্পাদকের দায়িত্ব।

সংবাদপত্র থেকে সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধন বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। কেননা সংবাদপত্র একদিনের, সাময়িক পত্রিকার নিবন্ধের আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং প্রকাশিত, সাময়িক পত্রিকার কোন ভুলভ্রান্তির প্রতিক্রিয়াও দীর্ঘস্থায়ী এবং পত্রিকা প্রচারে বিঘ্ন ঘটায়। তাই প্রতিটি সংখ্যার জন্য সম্পাদককে বিশেষভাবে ভাবতে হয়। পাঠক পত্রিকা কেনেন বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে। নতুন দৃষ্টিকোণে কোনো বিষয় উপস্থাপিত হলে সেটি সাময়িকীর পাঠককে আকৃষ্ট করে। একটি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাই সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের বিরামের সুযোগ নেই। তাকে পরবর্তী সংখ্যার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কেননা সাময়িক পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সাময়িক পত্রিকা এখনও সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব-নির্ভর।

সাম্প্রতিককালে সংবাদ-সাময়িকীর প্রকাশ পত্রিকা সম্পাদনায় নতুন ধারার সংযোজন ঘটিয়েছে। এখানে এখন নানা ধরনের কর্মীর প্রয়োজন হয়। বার্তা সম্পাদকের প্রয়োজন না হলেও মুখ্য অবর-সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে লেখার মধ্যে অভিনবত্ব ও চমক থাকে। সংবাদ-সাময়িকীতে দরকার হয় কতিপয় চিত্রশিল্পী ও একজন শিল্প নির্দেশক, দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ এর। এই পত্রিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধ অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে আকর্ষক। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় তদনুসারী। নতুন প্রজাতির এই সাময়িকীর আবেদন দিনান্তেই বিস্মৃতিযোগ্য।

পরিশেষে সাময়িকী সম্পাদনার আলোচনা উপসংহারে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে —

১) সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের বহু পূর্বেই সম্পাদক সম্ভাব্য সংখ্যাগুলির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লেখকসূচি নির্দিষ্ট করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন।

২) সম্পাদক তার সৃজনী শক্তি ও কল্পনার সাহায্যে নতুন নতুন আলোচনার বিষয়বস্তুর উদ্ভাবন করবেন।

৩) সম্পাদকের কাজ নতুন লেখক তৈরি করা এবং তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করা।

৪) সাময়িক সম্পাদকের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২০.৫ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন নিয়ম, অঙ্গসজ্জার নীটি, বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এছাড়াও প্রুফ রিডিং-এর কাজ, প্রুফ রিডারের কাজের ধরন, গ্রন্থ সম্পাপদা ও সাময়িকপত্র সম্পাদনার বহুমাত্রিক বিষয়, সম্পাদকের দায়িত্ব, কাজের ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই একক পাঠের মাধ্যমে সম্পাদনা, অঙ্গসজ্জা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হবে।

একক ২১ ❑ সাংবাদিকতা

গঠন

২১.১ উদ্দেশ্য

২১.২ প্রস্তাবনা

২১.৩ সাংবাদিক-সংরূপ

২১.৪ হেডলাইন বা শিরোনাম

২১.৫ সারসংক্ষেপ

২১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা—

- সাংবাদিকতা অর্থাৎ Journalism শব্দটি কীভাবে তৈরি হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।
- সাংবাদিকতা বলতে ঠিক কী বোঝায়, সেটাও জানতে পারবেন।
- সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রেসের স্বাধীনতার ব্যাপারটা কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, স্বাধীনতা বলতেই বা কী বোঝায় সেসব ব্যাপারে আপনি নিজের মতামত তৈরি করে নিতে পারবেন।
- সাংবাদিকতার কাজে দায়িত্ব কতখানি, সে সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা গড়ে উঠবে এখানে।
- সংরূপ বা Genre বলতে কী বোঝায়, সংরূপ বিচারের মান কী কী, তাদের পার্থক্য কোথায় এবং সাংবাদিক হিসাবে আপনি কখন কোন সংরূপটি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন।
- সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেরের অবয়ব নিয়ে বিভিন্ন মতের সন্ধান পাবেন।
- বিভিন্ন সাংবাদিক-সংরূপের দৃষ্টান্ত লক্ষ করতে পারবেন এই এককটিতে। এর ফলে তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ব্যাপারে অবগত হবেন।
- হেডলাইন বা শিরোনামের গুরুত্ব কোথায়, এবং বিশেষ করে মুদ্রিত প্রতিবেদনে শিরোনাম দানের পদ্ধতি কী, সে বিষয়েও একটি ধারণা গড়ে নিতে পারবেন।
- সাংবাদিকতা-যে একালের একটি আকর্ষক ও সম্মানজনক পেশা, তার একটি রূপরেখা সম্বন্ধে

একটি ধারণা গড়ে উঠবে।

- সাংবাদিকতার নানা স্তর, নানা দিক আছে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল রিপোর্ট তৈরি বা প্রতিবেদন রচনা। সেই প্রতিবেদন কীভাবে লিখতে হয় বা তৈরি করতে হয়, তা এখানে জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন, আর নিজে নিজেই তা লিখতে পারবেন কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত করে পাঠাতে পারবেন।

- প্রত্যেকদিন সংবাদপত্রে মুদ্রিত আকারে আমরা যা যা পড়ি, তার একটি অংশ হল প্রতিবেদন। সেই প্রতিবেদনের নিজস্ব-যে রূপ ও রীতি আছে, তা এখানে দেখতে পাবেন এবং হাতে-কলমে প্রয়োগ করতে পারবেন।

- প্রতিবেদনের ভাষা একটু আলাদা ধাঁচের হয়। তার ভঙ্গি, স্বাদ অন্যান্য সাহিত্যিক বা ব্যবহারিক গদ্যরচনা থেকে স্বভাবে, মর্জিতে বা মেজাজে খানিকটা আলাদা। সেই ভাষাভঙ্গিটি শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারবেন।

২১.২ প্রস্তাবনা

প্রেস বা সংবাদপত্রের জগতকে কেউ কেউ বহুমস্তকবিশিষ্ট দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করতে ভালোবাসেন। আবার অনেকেই প্রেসকে মনে করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। যাঁরা যে চোখেই দেখুন না কেন, সংবাদ হল জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত। একে বলা যায় প্রাণরস বা প্রাণশক্তি। কেউ কেউ তাই বলেন, জনগণ যা চায়, তাদের তাই দেওয়া হল সাংবাদিকতার কাজ। উল্টোদিকে কেউ কেউ বলেন, যে-সত্য জনগণের জানা বিশেষ দরকার, তাদের তা জানতে দাও। এই দুই মতবাদের মধ্যে যে-সত্যটিকে কোনোভাবেই আর ঢেকে রাখা যায় না, তা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারটা। সব দেশেই সর্বকালেই এই ব্যাপারটা নিয়ে নানান মতের চাপান-উতোর আছে, ছিল, থাকবেও হয়তো। তবে একথা সত্য, আগেকার দিনে শাসক ও ধর্মযাজকেরা সেই সংবাদই প্রচার করতে দিতেন যা তাদের পক্ষে নিরাপদ। তাদের মতের বিরোধী সবরকম সংবাদই শাসক ও পুরোহিত-মোল্লা-যাজকেরা চেপে দিতেন। কারণ তারা ভয় পেতেন বাইবেলের সেই অমোঘ বাক্যটিকে সত্যই তোমায় মুক্ত করবে। একালের শাসকেরাও মেনে নিতে পারেন না, রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

সাংবাদিকতা-যে সামাজিকভাবেই অপরিসীম মূল্যবান, নির্ভীক চিত্তে উন্নতশির দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং উচ্চতর মর্যাদাপন্ন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান বিশ্বে যেদিন থেকে জীবনের সূচনা, সেদিন

থেকেই মানবসমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে সংবাদ। না, শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যতর প্রাণীজগতেও এর ভূমিকা ন্যূন নয়। কীটপতঙ্গ থেকে জীবজন্তুও বুঝতে পারে কীসে তাদের বিপদ আসছে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা তারা নিজেদের সমাজে এক-এক উপায়ে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। এই যে বিপদের সম্ভাবনা ছড়িয়ে দেয়, সেটাই তো সংবাদ। ঠিক সময়ে ঠিক বার্তার বিকল্প আর কিছু কি হতে পারে? সংবাদের জন্যই তো ঘুরঘুর করেন গুপ্তচর, সোর্স পোষেন রাষ্ট্রদূত, প্রশাসন, সরকারি ও সরকারবিরোধী দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন। শোষণ-শাসন-ত্রাশন অক্ষুন্ন রাখতে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বা পাল্টে দিতে, সকলেই চায় প্রচারযন্ত্রকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ যেদিক থেকেই বিচার করে দেখা যাক না কেন, প্রেস বা সংবাদপত্র-বেতার-দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যম হল সমাজসেবার এক প্রধান হাতিয়ার। সংবাদিকতা সে কারণেই এত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে নানামুখী সাংবাদিক-সংরূপে। এর মধ্যে আবার প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২১.৩ সাংবাদিক-সংরূপ

সাংবাদিকতা শব্দটি এসেছে সংবাদ + ইক + তা থেকে। যার মানে হল সাংবাদিকের কাজ। বিশেষ্য। এটাও আপনি জানেন যে সংবাদ শব্দটির বুৎপত্তি হল সম্ + √বিদ্ (বলা) + অ। অর্থাৎ বিবরণ, বৃত্তান্ত। এই তাৎপর্যেই মনসামঙ্গলে পাবেন—

'পদ্মার সংবাদ সব মৎস্যগণ জানে।'

'আবার, সংবাদ বলতে বোঝায় বার্তা, খবর, সমাচার, সন্দেশবাক্য। কৃত্তিবাস তাই বলেন

'আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।'

কিংবা,

'সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।'

সাংবাদিকতাকে ইংরেজিতে বলে Journalism (জার্নালিজম)। শব্দটি এসেছে লাতিন diurnalis থেকে diurnal হয়ে প্রাচীন ফরাসিতে Journal-এর ভিতর দিয়ে। মধ্যযুগীয় ইংরেজিতে তা Journal হল। এর সঙ্গে ist যুক্ত হয়ে যেমন জার্নালিস্ট বা সাংবাদিক হল, তেমনি ism যুক্ত হয়ে হল জার্নালিজম বা সাংবাদিকতা। অনেকে আবার জার্নালিজম্ শব্দটির শিকড় খুঁজে পান DIURNA-র মধ্যে। প্রাচীন রোমে যে প্রকাশ্য জায়গায় একই নোটিশের একাধিক নকল ঝুলিয়ে বা সেঁটে দিয়ে প্রথাগত ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেনেটের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য খবরও জানিয়ে দেওয়া হত, তাকে বলা হত ACTA DURNA এবং এর ভূমিকা রোমক সমাজে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা ভালো Journalism শব্দটি আদিতে যে অর্থ বোঝাত এখন তা ছাপিয়ে গিয়েছে অনেকখানি, ঘটেছে অর্থের বিস্তার।

প্রশ্ন হল, সাংবাদিকতা বা জার্নালিজম্ বলতে কী বোঝায়? মুদ্রণ বা লিখন, চিত্রণ বা কথন, অথবা পারস্পরিক সংযোগে নানাধরনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা প্রবাহকে তুলে ধরে জনগণের বিভিন্ন স্বরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বিশেষ গুরুত্ব পায় সাংবাদিকতা। সেই সঙ্গে এটি একটি শিক্ষার বিষয় বা জীবিকার উপায়। অন্যদিকে সাংবাদিকতা সমাজসেবার মাধ্যম বা অভিজাত ব্যবসা বা সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক বা আদর্শ বিস্তারের সংগ্রামের সংগঠকের কর্মধারা ও অনুষঙ্গ। বস্তুত, একালে সাংবাদিকতা বলতে বোঝায়, সংবাদ ও সংবাদভিত্তিক আলোচনা, মন্তব্য ইত্যাদি জনগণের কাছে কোনো মাধ্যমের সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া। এই পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটায় যে উপকরণগুলো লাগে বা থাকে, তাতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকেন যারা তারা হলেন সাংবাদিক। সত্য প্রকাশ ও পরিবেশনের তাগিদে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ (N = North, E = East, W = West, S = South > NEWS) অর্থাৎ এই পৃথিবীর চারদিক থেকে খবর জোগাড় করে এবং তার সত্যতা যাচাই করে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করে থাকেন সাংবাদিকেরাই। তারাই সব কিছু জানান। জানার অধিকার সকলেরই জন্মগত অধিকার। ফলে, জনসাধারণের জানার অধিকার যেমন সাংবাদিকতার স্বীকৃতি, তেমনি তা মেনে নিয়ে জানানোর দায়িত্বও সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য। সত্য জানাটা সকলেরই বিশেষভাবে দরকার। তবে সত্যকে মেনে নিতে, জানান দিতে বেশিরভাগ সময়েই ভয় পান শাসকেরা। এই নীতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন সত্য, তেমনি রূঢ় বাস্তব একনায়কতন্ত্রী, একদলীয় শাসনব্যবস্থায়। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, মিশ্র — সব আর্থ-সমাজব্যবস্থাতেই একথা পুরোপুরি খাটে। কখনো কখনো সত্য প্রকাশে বিচলিত হন প্রাপ্তির-রাজনীতিতে-বিশ্বাসী সরকার, বিরোধীরাও। আর মৌলবাদীরা তো চেষ্টাই করেন সত্য-যুক্তি-বিজ্ঞান থেকে যতটা নিরাপদ দূরত্বে ঘেরাটোপের মধ্যে থাকা যায়। ফলে স্বাধীনতার জন্যই আসে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা। তবে সেই স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত থাকে দায়িত্ব, কর্তব্যের বোঝা, এমনকি অঙ্গীকারের বোধ। আর সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টার ভিতরেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সত্যের জোর। পাশাপাশি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হয় যে, সেই স্বাধীনতা কাদের জন্য। এটা কি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বাধীনতা, অথবা সংবাদকে বিকৃত, গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার স্বাধীনতা? অথবা, সাংবাদিকতায় অসুস্থতা আমদানির স্বাধীনতা? আসলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বরাবর ছিল, আছে, থাকবেও। লক্ষণীয় যেটা, তা হচ্ছে, সেই স্বাধীনতা কার স্বার্থরক্ষক? মুষ্টিমেয়ের মুনাফা বৃদ্ধি, শোষণের উপায় বৃদ্ধি বা রাজনৈতিক সুবিধাভোগের স্বাধীনতার স্বার্থে বৃহত্তম জনগণের স্বাধীনতা বিসর্জন কখনওই সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বলে বিবেচিত হয় না, হতে পারে না। হয়তো এ জন্যই অনেকে মনে করেন, একালের গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সমস্যা হল গণমাধ্যম ও তার স্বাধীনতা। সংবাদ হল সেই গণতন্ত্রের হৃদয়, জীবনশোণিত। পাশাপাশি এটাও ভুলে যাওয়া অসম্ভব যে, গণমাধ্যমের বা প্রেসের ক্রিয়াকর্ম সামাজিকভাবেই খুব মূল্যবান, তা যথেষ্ট সম্মানজনক ও দায়িত্বপূর্ণ। জনস্বার্থে সে যেমন সংবাদ দেয়, তেমনি তার ভাষ্যও রচনা করে।

স্বাভাবিকভাবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সাংবাদিকতা কাজটি বেশ জটিল ও দুরূহ। নিজের ওপর পুরোপুরি আস্থা রেখে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে সৎ-নির্ভুল-দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও পরিশীলিতভাবে নিষ্পন্ন করতে হয় সাংবাদিকতার মতো কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে সম্পন্ন করতে

হয় এই ব্রত। সংবাদ জানানো, বোঝানো, ব্যাখ্যা করা, পরিচালনা ও আনন্দদানই শুধু নয়, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক অর্থাৎ প্রেসের গ্রাহককে বিজ্ঞাপিত শিক্ষিত-সংগঠিত-উদ্দীপিত করে তোলাই সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য। সামাজিকভাবে এই ক্রিয়াকর্মটি মোটেও হেলাফেলার নয় বরং মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তা দায়িত্বের পরিচয় বহন করে, আবার যথেষ্ট মর্যাদাসূচকও। সমাজের ভালোমন্দের অনেক কিছুই যে সাংবাদিকতার ওপর নির্ভর করে, তা এখন আর কেউ অস্বীকার করেন না। যেদিন থেকে এই গ্রহে জীবনের সূচনা, এক হিসাবে সেই দিন থেকেই সংবাদ হয়ে ওঠে মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এমনকি পশুজগতেও এর ভূমিকা ন্যূন নয়। বিশেষ করে যখন জীবজন্তুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন তা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে ওঠে মানব জাতিরই স্বার্থে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীবজগতের অবদান কম নয়। তাই সকলেই সঠিক সময়েই চান সঠিক সংবাদ।

কেবল ব্যক্তিজীবনেই নয়, সমাজজীবনের পক্ষেও সংবাদ কল্যাণপ্রদ। রাষ্ট্রদূত ও রাণার, গুপ্তচর ও গণৎকার, নবজাতক ও মৃতদেহ, যুদ্ধবিমান ও ঠেলাগাড়ি থেকে কোনো কিছুই বাদ যায় না সাংবাদিকতার আওতা থেকে। উপরন্তু এর বিশ্বাসযোগ্যতা হওয়া দরকার সবরকম সন্দেহের ঊর্ধ্বে। বাস্তবিকই জনসাধারণের বেসরকারি পরিষেবাদান হল সাংবাদিকতার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনই কখনও শেষ কথা হতে পারে না একজন সাংবাদিকের কাছে। সাংবাদিক যে-খবর, যে-দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেন, তাতে তাকে অবশ্যই জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়। অর্থাৎ পাঠক-শ্রোতা— দর্শকের কাছে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত থাকা সাংবাদিকের প্রাথমিক কর্তব্য। একজন চিকিৎসকের সঙ্গে তার রোগীর যে-সম্পর্ক, অনেকটা সেরকম আস্থাই অর্জন করতে হয় সাংবাদিককে, প্রেসকে তার গ্রাহকদের কাছে। তবে চিকিৎসককে যেখানে মেডিক্যাল ডিগ্রি লাভ করে ও তার পেশাগত সংহিতা মান্য করে কাজ করতে হয়, সেখানে সাংবাদিকতা অনেকটা 'স্বাধীন' বৃত্তি। অবশ্য সাংবাদিককেও মেনে চলতে হয় কিছু বাইরের বিধি-নিষেধ, দেশের আইনকানুন, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি। কিন্তু একজন অসাধু চিকিৎসক খুব জোর যেখানে কয়েকজন রোগীর ক্ষতি করতে পারেন, সেখানে একজন অসৎ সাংবাদিক তার লক্ষ লক্ষ পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মনে বিষ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। একজন ব্যবসায়ী তার খদ্দেরদের দামে ঠকাতে পারেন, এমনকি বাজে মালও গছিয়ে দিতে পারেন, তাতে ক্ষতি হবে মাত্র কিছু সংখ্যক মানুষের কিন্তু সাংবাদিক জেনে-শুনেও যদি মিথ্যা বিবৃতি, বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করেন, তাতে হাজার হাজার মানুষ বিপথে চালিত হয়ে জাতিদাঙ্গা ঘটিয়ে দিতে পারেন, দেশকে ঠেলে দিতে পারেন সর্বনাশের দিকে। তাই যে-সাংবাদিক তার গ্রাহকদের প্রতারণা করেন, তিনি অসাধু ব্যবসায়ীর চেয়ে একজন মারাত্মক মানুষ বলে গণ্য হন। একজন অসৎ শিক্ষক তার ক্লাসরুমের কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ভুল শিখিয়ে বিপথে চালিত করতে পারেন, একজন রাজনীতিবিদ খুব জোর কয়েক হাজার শ্রোতাকে ভ্রান্ত দিক নির্দেশ করে উত্তেজিত করে ভাঙচুর ঘটাতে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকতার সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততাকে পদদলিত করে একজন সাংবাদিক গোটা দেশ-জাতি-সমাজের সর্বনাশ সাধন করতে পারেন। কাজেই সাংবাদিকতার কাজ আকর্ষক, সম্মানীয় হলেও তার দায়িত্ব অপরিসীম।

এই যে সাংবাদিকতা, তার প্রকাশমাধ্যম আবার সরলরৈখিক নয়। বরং বলা যেতে পারে এর প্রকাশমাধ্যম যেমন বিভিন্ন, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গিও বিচিত্রতর। অর্থাৎ সাংবাদিকতায় আমরা নানাবিধ সংরূপ বা জেরের দেখা পাই।

সংরূপ হল একটি বহুল ব্যবহৃত, ব্যাপক তাৎপর্যমণ্ডিত পরিভাষা। সম্ + রূপ = সংরূপ। অর্থাৎ কোনো রচনার বিশেষ ধরনটিই সম্যক রূপ বা মূর্তি বা আকৃতি এবং এটাই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিক সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র বা জ্যঁর। Genre শব্দটির শেকড় রয়েছে লাতিন Genus-এ। তার থেকে Generis, বহুবচনে Genera অর্থাৎ ধরন, রকম, হওয়া বা সত্তা। ফরাসি ভাষার মধ্য দিয়ে এই পরিভাষাটি গৃহীত হয়েছে জার্মান ভাষায় ও ইংরেজিতে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক-একরকম তাৎপর্যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। শিল্পকলার ইতিহাসে যখন আমরা জের-পেন্টিং কথাটি ব্যবহার করি তখন তার মানে গিয়ে দাঁড়ায়, দৈনন্দিন জীবনের চিত্রশোভিত অবিকল প্রতিলিপি। সংগীতের ক্ষেত্রে পরিভাষাটিকে ব্যবহার করি সিম্ফনি, অপেরা, সঙ্গ ইত্যাদি নানারকম কম্প্যাজিশনের শ্রেণিভেদ হিসাবে। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি ছোটো ছোটো নানা ভাগ মেনে নিয়েও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থকর্তাগণ প্রধানত মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা মূলত এই তিনটি পরিচয় দিতে Genre-কে ব্যবহার করেন। সাংবাদিকতায় এর প্রয়োগ অনেকটা সাহিত্যের মতো। বস্তুত সাংবাদিকতা এক হিসাবে সাহিত্যেরই নিকটতম প্রতিবেশী। এমন কি, কেউ কেউ সাংবাদিকতাকে মনে করে সাহিত্যের অন্যতম আদল। বাঙালি কবি বিষ্ণু দে তো তার কাব্যগ্রন্থের নামই দেন ‘সংবাদ মূলত কাব্য’। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি দু-চারটি সাংবাদিক-সংরূপকে বাদ দিলে অধিকাংশ সংরূপেরই অস্তিত্ব মানেন না অনেকেই। আসলে একালে কোনো সংরূপই নিজের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে আর বেঁধে রাখে না, অর্থাৎ সৃজনব্রতী সাংবাদিকেরা সংরূপের ধ্রুপদী ধারণাকে ভেঙে তছ্‌নছ্ করে দিয়েছেন, একের মধ্যে অপরের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে অনেক সময় বুঝে ওঠা দুরূহ হয়ে পড়ে কোন্‌টা সংবাদ প্রসঙ্গ বা নিউজ আইটেম আর কোনটা প্রতিবেদন বা রিপোর্ট।

সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌রের বিচারের মান তিনটি—

- সংরূপের বিষয়,
- সংরূপের কার্যাবলি,
- সংরূপের পদ্ধতি।

আবার সাংবাদিক সংলাপের পার্থক্যটি বোঝা যায়—

- বস্তুর চরিত্রে,
- বাস্তব লক্ষ্যে,

- সিদ্ধান্ত বা উপসংহার এবং সাধারণীকরণের নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে,
- ব্যবহৃত সাহিত্যিক-রীতিটির বৈশিষ্ট্যে,
- বাস্তব প্রতিফলনের পদ্ধতিতে।

সাংবাদিক হিসাবে আপনি যখন নির্দিষ্ট সংরূপটি ব্যবহার করবেন তখন মনে মনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবেন এই ভেবে—

- যা বলতে চান তার মূল্যায়ন করে নেবেন হাতের-নাগালে-পাওয়া জ্ঞান ও তথ্যের সাহায্যে। বুঝে নেবেন কোন্ সংরূপটি আপনার বক্তব্য প্রকাশের সবচেয়ে জোরালো উপযোগী।
- যে সংরূপটি ব্যবহার করবেন, তার জন্য সবরকম সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।
- যে সংরূপই আপনি ব্যবহার করুন না কেন, প্রয়োজনে তার চৌহদ্দি পেরোবেন গ্রাহকদের চিত্তরঞ্জনের স্বার্থে। এক্ষেত্রে মিত্র সংরূপ বা নতুন কোনো স্টাইল আমদানি করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি জরুরি কথা হল, কোন্ কোন্ উপাদানের সমন্বয়ে সংরূপ নিজ নিজ কাজ করে যায়, তা সতত মনে রাখবেন। সেগুলি হল—

- বিষয়বস্তু।

কোন্ ঘটনার কোন্ দিকটা পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে জানাতেই হবে, সেটা নির্ধারণ করে নেবেন প্রথম থেকেই। মনে রাখবেন, প্রতিটি সংরূপই কিছু-না-কিছু তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

- অভিপ্রায়।

কী কারণে গ্রাহকদের তথ্য সরবরাহ করছেন, সেটা পরিষ্কার বুঝে নেবেন। প্রতিটি সংরূপই কোনো-না-কোনোভাবে নিজস্ব লক্ষ্য পূরণ করে।

- পদ্ধতি।

কোনো পদ্ধতি বা উপায়ে আপনি আপনার গ্রাহকদের মধ্যে বিতর্ক উসকে দেবেন, তথ্য জানিয়ে দেবেন, সৌন্দর্যবোধ চারিয়ে দেবেন, শিক্ষার বিস্তার ঘটাবেন ও মনোরঞ্জন করবেন, সেটা মুহূর্তের মধ্যেই স্থির করে ফেলবেন। খেয়াল রাখবেন, প্রতিটি সংলাপের মধ্যেই কিছু না-কিছু নান্দনিক ও মনোরম উপাদান অনিবার্যভাবেই নিহিত থাকে। মূলত সাংবাদিক রচনা দুটি মূল নীতির ওপর গ্রথিত হয়। একটি হল পর্ব আর একটি গঠন পদ্ধতি।

সাংবাদিক-সংরূপের পর্বভাগ

- আদি
- মধ্য
- অন্ত্য

দ্বিতীয় মতটি হল—

সাংবাদিক-সংরূপের গঠন পদ্ধতি

- উন্মোচন বা প্রকট
- সম্প্রসারণ বা বিশদ
- উপসংহার বা সিদ্ধান্ত
- চূড়ান্ত মন্তব্য বা অভিমত

অর্থাৎ

- উন্মোচনে থাকবে উদ্দীপিত ভূমিকা;
- সম্প্রসারণে থাকবে বিশদভাবে বিষয়বস্তু, পরিসংখ্যান বা তথ্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ক্রিয়ার তীব্রতা;
- উপসংহারে থাকবে বিশ্বাসযোগ্য সমাধান;
- চূড়ান্ত মন্তব্য তা অভিমতে বাঞ্ছিত পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের নির্ভুল মুক্তি।

এছাড়াও, প্রতিটি সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেনরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও বিচারের মানদণ্ডে যা যা পাওয়া যেতে পারে বা থাকলে ভালো হয়, সেগুলি একে একে বলা যাক—

- সমকালীনতা বা টাটকা ঘটনা;
- কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূতা;
- সর্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতা;
- প্রচারধর্মিতা;
- ধারাবাহিকতা;
- গণমাধ্যমটির সক্রিয়তা;
- সম্মিলিত সক্ষমতা।

এবারে আমরা কয়েকটি জনপ্রিয় সাংবাদিক-সংরূপের উল্লেখ করি। পাশাপাশি বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে কয়েকটি সংরূপের দৃষ্টান্তও দিচ্ছি।

● সংবাদ প্রসঙ্গ বা নিউজ আইটেম

এই সংরূপটিরই ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সংবাদপত্রে, বেতারে, দূরদর্শনে। সাধারণভাবে কে বা কারা, কী, কখন, কোথায়, কেন, কীভাবে— এই ছ'টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তৈরি হয় এক-একটি নিউজ-আইটেম। অবশ্যই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে হেডলাইন বা শিরোনাম।

● প্রবন্ধ বা আর্টিক্‌ল্

দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ বা আর্টিক্‌ল্ প্রকাশিত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-সংরূপ। এখানে যে সব সময় প্রতিষ্ঠানেরই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হবে, তার কোনো মানে নেই। লেখকের স্বাধীনতা প্রায়শই রক্ষিত হয়, যদি-না তা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বলে বিবেচিত হয়।

● লীডার বা সম্পাদকীয়

চলতি সময়ের কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে অন্তর্দৃষ্টি ফেলে সম্পাদকের কলামে এটি লেখা হয়। এই বক্তব্যকে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য হিসাবেই বিবেচনা করা হয়।

● কমেন্টরি বা মন্তব্য

বিতর্ক উস্‌কে দেওয়ার ক্ষেত্রে কমেন্টরি বা মন্তব্য সংবাদপত্রের অন্যতম জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক-সংরূপ। দৈনন্দিন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যাপার নিয়ে টুকিটাকি মন্তব্য সরসভঙ্গিতেই সাধারণত এখানে উপস্থাপিত করা হয়। তবে কমেন্টরির মর্মমূলে থাকে যুক্তি। সত্যি কথা বলতে কি, রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারই প্রথম তার ডায়েরিতে ব্যবহার ঘটান COMMENTARICI শব্দটি। এখান থেকেই কমেন্টরি শব্দটি এসেছে। বর্তমানে এর ঘটেছে অর্থব্যাপ্তি। যুক্তির সঙ্গে সরসতা মিশিয়ে তির্যকতা আনাই একালের কমেন্টরি বা মন্তব্যের মূলকথা। কখনো কখনো সপ্তাহের বিশেষ সমস্যা নিয়েও মন্তব্য করা হয় পত্র-পত্রিকায়। আবার কখনও কখনও সংবাদপত্র গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় রচনার প্রথাসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে সংক্ষিপ্তাকারে সম্পাদকীয়র বদলে তির্যক পদ্ধতিতে মন্তব্য বা কমেন্টরি ছাপান। কেউ কেউ অবশ্য একে সম্পাদকীয়ই বলে চালাতে চান। সেখানে মন্তব্যের দায় বা দায়িত্ব সম্পাদকের ওপরেই বর্তায়।

● প্রতিবেদন বা রিপোর্ট

চলতি ঘটনা বিষয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে জ্ঞাত করে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট। প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লেখনীতে প্রতিবেদন তৈরি হয় বলে নিউজ-আইটেমের সঙ্গে প্রতিবেদনের আবেদনে তফাত ঘটে যায়। তাছাড়া প্রতিবেদনের ভাষা হয় অনেক প্রাঞ্জল।

● **শিল্পিত প্রতিবেদন বা রিপোর্তাজ**

মূলত সংবাদপত্রের জন্য বিশেষ-এক-রীতিতে-লেখা ঘটনার প্রতিবেদন হচ্ছে রিপোর্তাজ। একেবারে তরতাজা ঘটনা বা বিষয় বা অভিজ্ঞতার শৈল্পিক প্রকাশ এখানে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বিবৃত করা হয়। এতে মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস টের পাওয়া যায়। ফুটে ওঠে বিবিধ দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। তথ্যের উপস্থাপনা সত্ত্বেও সাহিত্যের স্বাদ, নান্দনিক বোধ, অন্তর্জীবনের চিত্রায়ণ, কিংবা স্মৃতি-সত্তার অন্তঃসার রিপোর্তাজকে যেমন দেয় ডকুমেন্টেশনের মূল্য, তেমনি তা হয়ে ওঠে শৈল্পিক সুষমায় বিশিষ্ট। এক হিসাবে রিপোর্তাজ হল সংবাদ ও সাহিত্যের সম্মিলিত রসায়ন।

● **শোকসংবাদ বা অবিচুঅরি**

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুতে তার জীবনালেখ্য ফুটিয়ে তোলার মধ্যে নিবেদিত হয় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি তাকেই বলে শোকসংবাদ বা অবিচুঅরি।

● **সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভ্যু**

প্রশ্ন-উত্তরের ফ্রেমে সাংবাদিক যখন খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিত্বের রূপ ও স্বরূপ, কর্মজীবন, ধ্যানধারণা, কৃতিত্ব ও পাঠ শ্রোতা-দর্শকের কাছে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে উপস্থিত করেন, সেই সাংবাদিক-সংরূপটিই হল সাক্ষাৎকার। এছাড়াও আরও অনেক Genre বা সংরূপের অস্তিত্ব রয়েছে সাংবাদিকের ঝুলিতে। নিত্য নতুন সংরূপও তৈরি হচ্ছে চলমান জীবনের দাবিতে, অভিজ্ঞতার আলোকে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আলেখ্য বা Portrait, অলোচনা or Discussion, সমালোচনা বা Review, টিপ্পনী বা Gloss, পুচ্ছপট বা Tale-piece, স্তম্ভ বা Column, Propayanda-Case, Feuilleton ইত্যাদি সাংবাদিক-সংরূপ বা Journalistic-Genres.

২১.৪ হেডলাইন বা শিরোনাম

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিটি প্রতিবেদনেরই অপরিহার্য অঙ্গ হল তার শিরোনাম বা হেডলাইন। তবে নিছক প্রতিবেদন বা রিপোর্টের ক্ষেত্রেই যে হেডলাইন দিতে হয় তা নয়, খবরের কাগজে ছাপা হয় যেসব রচনা, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, মন্তব্য, নিউজ আইটেম ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা শিরোনাম থাকা বাধ্যতামূলক।

রিপোর্টার বা প্রতিবেদক যখন প্রতিবেদন তৈরি করেন, তখন তারই অবিভাজ্য অংশ হিসাবে একটি শিরোনাম ব্যবহার করেন। অনেক সময় আবার বার্তা সম্পাদক নিজে, কিংবা হেডলাইন ব্যর্থ হয়েছে কিনা দেখার জন্য যিনি ভারপ্রাপ্ত থাকেন, তিনি সেই হেডলাইন অদল-বদল করে দেন বা দিতে পারেন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন সহ-সম্পাদক থাকেন যিনি প্রতিবেদন, নিউজ আইটেম পড়ে নিয়ে যুতসই

শিরোনাম জুড়ে দেন। শিরোনান বা হেডলাইন-যে এত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ অবশ্য অনেক। বাস্তবে দেখা যায়, ব্যস্ততা বা সময়ের অভাবের জন্য পাঠকদের একটা অংশ সংবাদের ভিতরে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার সময় পান না। আবার এমন পাঠকও বেশি পাওয়া যায় না, যারা সবরকম সংবাদ সম্পর্কে সমান আগ্রহী। এর মূলে রয়েছে রুচির ভিন্নতা, শিক্ষার হেরফের, দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র। ভালো লাগা, না-লাগার জেরেই অনেক পাঠক যেসব খবর এড়িয়ে যান, কোনোরকম আগ্রহই বোধ করেন না, সেইসব সংবাদই আবার আরেক দল পাঠক গোগ্রাসে গেলেন, কিংবা তারিয়ে তারিয়ে পড়ে আনন্দ পান। সংবাদপত্রকে কিন্তু নানান রুচির, মতের পাঠকের কথা মনে রেখেই, সমাজের সর্বস্তরের পাঠক-গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করেই সংবাদ পরিবেশনে বৈচিত্র্য আনতে হয়। আর এই বিচিত্র বিজ্ঞাপন পয়লা দফায় ঝলমল করে আকর্ষক হেডলাইনের সহযোগিতায়। তাই খবরের কাগজে শিরোনাম বা হেডলাইন তৈরির ব্যাপারটা কিছুতেই হেলাফেলার নয়।

তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিরোনাম দেওয়ার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যে শিরোনাম-দানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে বা থেকে যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিরোনাম দেওয়ার পিছনে লেখকের মানসিক প্রবণতা বেশি কাজ করে। তাছাড়া নামকরণও হয় নানা ধরনের। কবি, কথাকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, এমনকি চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ তাঁদের নিজ নিজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণ করে থাকেন কখনও বিষয়টির প্রাধান্য মাথায় রেখে, আবার কখনও বাঁক-ঘোরানো মুখ্য ঘটনাটির ওপর সন্ধানী আলো ফেলে। নায়ক-নায়িকার নামেও যেমন শিরোনাম দেওয়া হয়, তেমনি আঙ্গিক, সময়-নির্ভরও নামকরণ করা হয়। নানা-রঙের-দ্যুতি-ঠিকরানো হিরের টুকরোর মতো ব্যঞ্জনাধর্মী বা সাংকেতিক নামও সাহিত্যে কম জায়গা জুড়ে নেই।

‘প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি’

‘মুখ্যমন্ত্রীর ফোন দিল্লিকে, রেল নিয়ে বসবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা’

‘মন্দির মুক্ত, গুজরাটে সেনা, সতর্ক দেশ’

‘গুজরাটের মন্দিরে জঙ্গী হামলা, মৃত ৩০’

‘মহামিছিল জানালো রেল ভাগ মানবো না’

‘শ্রম আইন বদলের বিরুদ্ধে এককাট্টা শ্রমিক সংগঠনগুলি’

‘বাগডোগরাকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার দাবি’।

তাহলে দেখা যাচ্ছে হেডলাইন বা শিরোনাম পাঠককে—

- বিষয় সম্পর্কে আগাম আভাস দেয় বা গাইড করে;
- খবর চালান দেয়, অর্থাৎ বিষয়টিকে ঘিরে তথ্য সরবরাহ করে;
- বর্ণিত ঘটনা বা সমস্যার মূল্যায়ন করে, অর্থাৎ বিষয়টির বিশেষত্ব কী—সেটা মূল্যায়ন করার সুযোগ এনে দেয়;
- দৃষ্টিনন্দন সংবাদপত্র উপহার দেয়, অর্থাৎ হেডলাইন বা শিরোনামে থাকে গ্রাফিক ফাংশন।

এতেই শেষ হয়ে যায় না হেডলাইনের ভূমিকা। বরং হেডলাইন—

- পাঠকের কাছে কিছু নির্দেশ পৌঁছে দেয়;
- পাঠককে সংবাদ দেয়;
- বর্ণিত ঘটনার বা সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে;
- কৌতূহল জাগিয়ে তোলে;
- ঘটনার ভিতরকার ঘটনার সুলুকসন্ধান দেয়;
- পাঠকের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে;
- গভীরভাবে চিন্তা করতে পাঠককে সাহায্য করে;
- সর্বোপরি পাঠককে করে উদ্দীপিত ও সুশিক্ষিত।

সংবাদপত্রে হেডলাইন দেওয়ার দায়িত্ব প্রতিবেদকের ওপর বর্তায় না। সেটি সহ সম্পাদক বা সাব-এডিটরদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই হেডলাইনের জন্য হরফের পয়েন্ট নির্বাচন করতে হয় কলমের মাপ অনুসারে, অর্থাৎ হেডলাইনটি কত কলমের হবে। তদনুযায়ী কত পয়েন্টের শব্দ বসালে তা ওই বরাদ্দ কলমের মধ্য ধরবে।

এছাড়া প্রতিবেদনের উপযুক্ত হেডলাইন রচনার সময়ে কয়েকটি জিনিস ভেবে দেখতে হয়। তা হল, প্রতিবেদনের শিরোনামে সাধারণভাবে—

- অতিশয়োক্তি যা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা ব্যবহার বর্জনীয়;
- অলংকারের আধিক্য অনভিপ্রেত;
- ভবিষ্যদ্বাণী পরিত্যাজ্য;
- অঘটিত ঘটনার আভাস পরিহারযোগ্য;

- বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হেডলাইন বিভ্রান্তি ছড়ায়, তাই তা বাদ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়;
- ঘটনার ইঙ্গিত থাকবে, কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা না থাকলে ভালো;
- যেন কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।
- বর্তমান কালের ব্যবহারই কাম্য।
- অনুজ্ঞাবাচক, আদেশধর্মী শব্দ বর্জনীয়;
- যথাসম্ভব সংখ্যা পরিহার করবেন;
- উক্তি দিলেও উদ্ধৃতিচিহ্ন দেবেন না। [যেমন— 'বন্দি-মৃত্যুতে শাস্তি পাবে পুলিশ ঃ বুদ্ধ']

হেডলাইনের ব্যাপারে আর একটি কথা না বললেই নয়। তা হল, একালে সাংবাদিক-সংরূপের বিশুদ্ধতা পত্র-পত্রিকায় ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে না। একজন কমপ্লিট ফুটবলার যেমন একালে সব পজিশনেই খেলতে পারেন, তেমনি আধুনিক সাংবাদিকেরা মনে করেন জার্নালিস্টিক জেন্‌র-এর কথা না ভেবে সাংবাদিকের লেখাটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিলেই চলবে। এক্ষেত্রে রিপোর্ট, রিপোর্তাজ, নিউজ আইটেম, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সংরূপের বৈশিষ্ট্য ভেবে হেডলাইন ঠিক করার কোনো মানে হয় না। ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে সাংবাদিকতাতেও এসেছে আজ আধুনিকতার ঢল। তাই একালের সাংবাদিকের লেখনীতে হেডলাইনের বিশুদ্ধতা বিলীয়মান। তাদের কলমে যাবতীয় সীমানা ভেঙে চৌচির। লক্ষ্য সকলের একটাই— গ্রাহকসংখ্যা বাড়াও, পাঠকের মন জয় করো, বিজ্ঞাপনের আলোয় ঝলমল করুক পত্রিকা এবং মুনাফার স্বর্গে পৌঁছে দাও নিজের প্রতিষ্ঠানকে।

২১.৫ সারসংক্ষেপ

এই এককে সাংবাদিকতা নামক সংসরূপটির সংজ্ঞা, বিষয়, বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সাংবাদিকতার উদ্ভব, তার ইতিহাস, বিবর্তনের ধারা, সাংবাদিকের মূল দায়িত্ব, নৈতিকতা, কর্তব্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সংবাদ পরিবেশনের মূখ্য আলোচ্য দিকগুলি, সংবাদ রচনার বহুবিধ আঙ্গিক সম্পর্কে শিক্ষার্থী স্পষ্ট ধারণা পাবে এই একক পাঠের মাধ্যমে।

একক ২২ ❑ প্রতিবেদন

গঠন

২২.১ উদ্দেশ্য

২২.২ প্রতিবেদন

২২.৩ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন

২২.৪ সারসংক্ষেপ

২২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা আলোচনা করব-

প্রতিবেশন রচনার বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা কর।

বিষয়গত ভিন্নতার সাপেক্ষে প্রতিবেদন রচনায় যে স্বাতন্ত্র সূচিত হয়, সেই দিকগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

২২.২ প্রতিবেদন

বাস্তবিকই, সাংবাদিকতার আসল মেজাজটি পাওয়া যায়, অনেকের মতে, প্রতিবেদন পেশ করার মধ্যে। প্রতিবেদকের স্মার্টনেস, খবরের ভিতর থেকে খবর বের করে নেওয়ার কুশলতা, সংবাদপত্রই শুধু নয় টিভি, রেডিও ইত্যাদিরও সম্পদ। তবে একথাও যেন আমরা ভুলে না যাই যে, গণমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন কোনো খাপছাড়া বিষয় নয়। সাংবাদিকতায় কোনোটাই খাপছাড়া জিনিস হয় না। সব কিছুর মধ্যেই থাকে এক ধরনের সঙ্গতি। ঐকতানের আমেজ। এমনকি সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ যে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচনা, তা পেশ বা সম্প্রচার করা, তাকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যহীন বা নৈমিত্তিক ব্যাপার বলা ঠিক হবে না।

তাহলে গণমাধ্যমের জন্য প্রতিবেদন লিখতে গেলে আপনি কীভাবে এগোবেন? এক কথায় এর কোনো জবাব হয় না। নেই কোনো বাঁধা গৎ-ও। তবে আপনি ইচ্ছে করলে নিচে উল্লিখিত উপায়গুলি একবার ভেবে দেখতে পারেন। অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে—

- ঘটনার প্রকৃতি বা বিষয়টি কী ধরনের।
- কী অবস্থায় কী কারণে কেমনভাবে ঘটনাটা ঘটল। এক্ষেত্রে ভেবে-চিন্তে এগোবেন, মুহূর্তের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।

- বিষয়টির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমস্যাটা কী, তা বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করতে হবে, সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় তার ইঙ্গিত পারলে জোগাড় করবেন এবং এটা করতে পারেন বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ যাঁকে হাতের কাছে পাবেন তাদের থেকে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি বিষয় অনুসারে এমন কিছু লোক বাছাই করে নেবেন, যাদের সঙ্গে কথা বললে আপনি বেশ কিছু তথ্য পেতে পারেন। এজন্য গণসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি আমলা, পুলিশ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন—
- সমস্যা বা বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে এমন ব্যক্তিটি কে বা কারা?
- তাঁদের মধ্যে আবার বিষয়টি সম্পর্কে কার জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ।
- সমস্যার সুরাহার পথ কে বাতলে দিতে পারেন?

একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, অনেক সময় নোট নিতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। অর্থাৎ সাংবাদিক নোট নিচ্ছেন দেখলে উত্তরদাতা গুটিয়ে যেতে পারেন, খোলামেলা আলোচনা না-ও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য স্মৃতিতে ধরে রাখবেন উত্তর, তার সামনে কিছুই লিখবেন না। বরং তাঁর সঙ্গে মিশবার, কথা বলবার চেষ্টা করবেন বন্ধুর মতো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

- সব কিছু জানা-শোনা-বোঝার পর নিজের ক্ষমতা যাচাই করে ঠিক করে নেবেন ব্যাপারটা প্রতিবেদন রচনার উপযোগী কিনা।
- প্রতিবেদনে আপনি ঘটনা বা বিষয়টির কোন্ দিকের ওপর ঝোঁক দেবেন বেশি সেটাও ঠিক করে নেবেন। এক্ষেত্রে আপনি নিজেকেই নিজে কিছু প্রশ্ন করে মনে মনে জবাব তৈরি করে নিতে পারেন। তা হল—

ক) আমার প্রতিবেদনের কোন্ অংশ পাঠক-দর্শক-শ্রোতাকে বেশি নাড়া দেবে, উন্নতি ঘটাবে, চেতনা বাড়াবে।

খ) কোন্ মানসিকতা কাজ করেছিল ঘটনাটার মূলে?

গ) ঘটনা ঘটার কারণ জানানো হলে পাঠকের-দর্শকের-শ্রোতাদের কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

ঘ) ঘটনাটা পাঠকের কাছে কোন বার্তা পৌঁছে দেবে।

- ঘটনা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি আপনার জানা জরুরি।
- মূল প্রশ্নটির উত্তর বিশদভাবে আপনি জানবার চেষ্টা করবেন।

একের পর এক সমস্ত বা অধিকাংশ জিজ্ঞাসারই যখন জবাব আপনি হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন,

তখনই লিখতে শুরু করবেন নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিবেদনটি। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই খুব দ্রুত সেরে ফেলবেন। রয়ে-সয়ে দেখছি দেখব করে সময় কাটালে রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা যে ফুরিয়ে যায় সেটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন। রিপোর্ট হল গণমাধ্যমের চটজলদি তৈরি খাবার।

এরপর সমস্ত উপকরণ নিয়ে আপনি একে একে নিচের প্রশ্নের উত্তর দেবেন আপনার লেখা প্রতিবেদনটিতে। অবশ্য নিউজ আইটেমের ক্ষেত্রেও এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় সাংবাদিককে। প্রশ্নগুলি হল—

- কে বা কারা?
- কবে, কখন, কোথায়?
- কী?
- কীভাবে?
- কেন?
- কীসের জন্য?

প্রসঙ্গত আসে প্রতিবেদনের বিন্যাস নিয়ে দু-চার কথা। বলাই বাহুল্য, এই বিন্যাসের ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করে বর্ণিত বিষয়ের ওপর। আবার কখনও কখনও তা সাংবাদিকের বিশেষ ঝোঁকের ওপরও দাঁড়ায়। এমন কি, কোনো ব্যাপারে যদি সাংবাদিক বা প্রতিবেদক বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিস্ট হন, তবে তার সেই বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে প্রতিবেদনের বিন্যাস। এর ফলে লাভবান হন সকল পক্ষই। প্রথমত সাংবাদিকের ইচ্ছাপূরণ হয়, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক অনেক অজানা তথ্যের হদিশ পান। তাই—

- প্রতিবেদক হিসাবে প্রথমেই আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে যে, প্রতিবেদনটিতে আপনি কী বলতে বা জানতে বা শোনাতে চাইছেন।
- ঘটনাকে ঘিরে যেসব তথ্য আপনি জোগাড় করেছেন, একটা ধারণাও গড়ে নিয়েছেন মনে মনে, তার থেকে আপনাকে বেছে নিতে হবে, পাঠকের-শ্রোতার-দর্শকের কৌতূহল মেটাতে, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে এবং সমীহ আদায় করতে কী কী আপনি ব্যবহার করবেন।
- প্রাপ্ত ও নির্বাচিত তথ্যগুলিকে কত সুন্দরভাবে, যুক্তিসহ নিপুণতার সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন সেটাই হবে মূল লক্ষ্য। এটা রপ্ত করা খুব সহজ নয়, বেশ অনুশীলন-সাপেক্ষ।

উল্লিখিত বিভিন্ন ধাপকে সচেতনভাবে প্রতিবেদন তৈরির কাজে লাগিয়ে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সত্যিসত্যিই আপনি একজন ঝকমকে রিপোর্টার।

এবারে দেখা যাক প্রতিবেদন কীভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

- প্রথমেই বুঝে নিতে হবে, যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, তার উদ্দেশ্য কী। রিপোর্ট সব সময়েই তৈরি হয় সদ্য-ঘটে-যাওয়া ঘটনার বিস্তৃত সংবাদ নিয়ে। সেখানে ঘটনাটিকে বিশদভাবে প্রত্যক্ষ করানো, মূল্যায়ন ঘটানো ও সাধারণের জানার কৌতূহল মেটানো প্রধান কাজ। যে-গণমাধ্যমে বেশি বেশি করে গ্রাহকের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা থাকে বা গ্রাহককে অধিক সংখ্যক সংবাদ সরবরাহ করে, সেই গণমাধ্যমটি লাভ করে গ্রাহক-সমৃদ্ধি।
- দ্বিতীয় ধাপে পরীক্ষা ও শ্রেণিবিভাজন করে বুঝে নেবেন যে খবরগুলি, বা তথ্যসমূহ আপনি যোগাড় করেছেন, তা প্রতিবেদনের জন্য নির্ধারিত বিষয়টির নিখুঁত ছবি তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট কি না। মনে রাখতে হবে, পাঠক-শ্রোতার কাছে রিপোর্ট এঁকে দেয় ঘটনার বিশদ জীবন্ত বর্ণনা।
- তৃতীয় পর্যায়ে দেখতে হবে আপনি যে-প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সেজন্য সংবাদের তথ্য নির্বাচন নির্ভুল হয়েছে কিনা। আপনি রিপোর্ট করার জন্য যা যা খবর সংগ্রহ করবেন, তার অনেক কিছুই একসময় আপনার মনে হবে অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে আপনি আপনার সংগৃহীত তথ্যগুলি গ্রাহকের কৌতূহল মেটানো ও অনুসন্ধিৎসা বাড়ানোর জন্য ভালোভাবে ঝাড়াই-বাছাই করে নেবেন। এর পরেই প্রতিবেদন তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।
- সংগৃহীত ও নির্বাচিত তথ্যগুলিকে যুক্তি পরম্পরায় ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে পরপর সাজিয়ে ভাষার বুনুনিতে গেঁথে তুলবেন আপনার প্রতিবেদনটি। প্রত্যেক প্রতিবেদনের থাকে একটি ছোট্ট ভূমিকা যাকে বলা হয় Intro। তাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠবে শরীর। সবশেষে উপসংহার। অবশ্য অবয়বকে আপনি পয়েন্ট অনুসারে কয়েকটি ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদে ভাগ করে সাজিয়ে নিতে পারেন।
- Intro বা ভূমিকাটিকে আকর্ষক করে তুলতে মোটেও কসুর করবেন না। বরং এখানেই উসকে দেবেন পাঠকের আগ্রহ। যা বলবেন, তা যেন সরাসরিই পাঠক-শ্রোতা-দর্শক বুঝতে পারেন, এটা খেয়াল রাখবেন। কোনোরকম ভাষার মারপ্যাচ, অলংকারের ঝংকার বা বাগাড়ম্বর ভূমিকায় থাকবে না।

২২.৩ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন

বিষয়বস্তু অনুসারে প্রতিবেদন বিভিন্ন রকমের হয়। এর মধ্যে কয়েক ধরনের প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রতিদিনই থাকে। সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত বিশেষ প্রতিবেদন লেখার জন্য অভিজ্ঞ সাংবাদিক নিযুক্ত করেন। তাঁরা বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই প্রতিবেদন রচনা করেন। আজকাল প্রায় সকল সংবাদপত্রেই সাধারণত যে প্রতিবেদনগুলি দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম হল রাজনীতি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য, অপরাধ, কৃষি, ক্রীড়া, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়।

রাজনীতি:

রাজনীতি সংবাদপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রায় প্রতিদিনই প্রথম পৃষ্ঠার লিড সংবাদ হয় রাজনৈতিক খবর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিডও তৈরি হয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। কাগজ হাতে নিয়ে পাঠককে বেশি সময় ধরে রাজনীতির খবরই পড়তে হয়। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বক্তব্য ও মন্তব্য, প্রথম সারির বিরোধী নেতাদের কার্যকলাপ, প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিয়েই তৈরি হয় রাজনৈতিক খবর।

বহু প্রতিবেদক রাজনীতি বিষয়ক খবর করার জন্য বিশেষভাবে দক্ষ হয়ে ওঠেন। রাজনীতির পালাবদল, টানাপোড়েন, অন্তর্কলহ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থার সন্ধান দেবার চেষ্টা করেন। পাঠক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। সমাজে রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনীতিকে সমাজের মূল চালিকাশক্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। খুব স্বাভাবিকভাবে সব মানুষই চান রাজনীতি সম্পর্কে জানতে। রাজনৈতিক প্রতিবেদন পাঠ করেই তাঁরা জানতে পারেন সাম্প্রতিক রাজনীতির হাল হকিকৎ।

রাজনৈতিক প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু হল রাজনৈতিক দলের গতিবিধি, নেতাদের মন্তব্য, আচার-আচরণ ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ের প্রতি দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক এমন সমস্যা নেই যার সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই। রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয় সম্পর্কেই অবহিত থাকতে হবে। বিশেষ করে অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

একেক দেশে একেক রকমের দলীয় ব্যবস্থা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, আর আমাদের দেশে বহু দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। ভারতে যে সমস্ত রাজনৈতিক সংবাদদাতা রয়েছেন তাঁদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল ও আঞ্চলিক স্তরের দলগুলির কার্যধারা সম্পর্কে জানতে হবে। আমাদের দেশের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হল কংগ্রেস, বি জে পি, সমাজবাদী পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, সি পি আই, সি পি এম ইত্যাদি। আঞ্চলিক দল হল তেলেগু দেশম, ডি এম কে, এ ডি এম কে, আর জে ডি, শিবসেনা ইত্যাদি। প্রতিটি দলের কর্মসূচি আলাদা, কাজকর্মের ধরনও স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক সংবাদদাতা প্রতিটি দলের কার্যধারার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। কর্মসূচি অনুযায়ী দলগুলি কীভাবে কাজ করছে তা অনুধাবন করবেন।

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গণ সংগঠন থাকে। এই গণ সংগঠনগুলি রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যধারাই অনুসরণ করে। ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন হল গণ সংগঠনের দৃষ্টান্ত। ছাত্র পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ হল কংগ্রেস ও বি জে পির ছাত্র সংগঠন। আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি হল কংগ্রেস ও সি পি আই-এর শ্রমিক সংগঠন। রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে এই গণ সংগঠনগুলির কার্যক্রম সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হবে। আর এস এস ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ হল দুটি গণ সংগঠন এবং এদের সঙ্গে বিজেপির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। গণ সংগঠনের কাজকর্মের সঙ্গে রাজনীতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এদের সম্পর্কের বিন্যাস অনেক সময়ই রাজনীতিতে গুরুত্ব পায়। আর.এস.এস-এর সঙ্গে বি.জে.পি-র যে সম্পর্ক তা নিয়ে প্রায়শই খবর হয়।

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জোট রাজনীতি। নব্বই-এর দশক থেকেই জোট রাজনীতির সম্ভাবনা বাড়ছে। আশির দশকের শেষ থেকেই দেখা যাচ্ছিল জোট রাজনীতির উদ্ভব। ভি. পি সিংহের সরকার দাঁড়িয়েছিল জোট রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে। পি. ভি নরসিংহ রাওয়ের সরকারেরও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে যে সরকার প্রথম গঠিত হয় তা টিকে ছিল তেরো দিন। ছোটো ছোটো রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে এই প্রথম কার্যকরী জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরের বার বাজপেয়ী মন্ত্রীসভা টিকে ছিল মাত্র তেরো মাস। ১৯৯৯ সালে তৈরি হয় বি জে পির নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা বা এন. ডি.এ। ২০০৪-এ জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা নির্বাচনে পরাজিত হলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত হয় সম্মিলিত প্রগতিশীল মোর্চা বা ইউ পি এ সরকার। রাজ্য স্তরেও জোট রাজনীতি ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় আছে জোট সরকার। জোট রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন লেগেই থাকে। ছোটো দলগুলি নানারকম চাপ তৈরি করে দর কষাকষি করে। এ সবের মধ্যে প্রচুর খবরের সম্ভাবনা থাকে। রাজনৈতিক প্রতিবেদককে জোট রাজনীতির অঙ্কটাও বুঝতে হবে। প্রতিটি দলের কার্যক্রমের ওপর সতর্ক-দৃষ্টি রেখে পরিস্থিতি বোঝা দরকার। অনেক সময়ই ছোটো দল নানাভাবে নেতৃত্ব প্রদানকারী বড়ো দলের ওপর চাপ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। এ সবই খবরের উপাদান। নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অনেক ভিতরের খবর জানা যায়। প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জোট রাজনীতি রাজনৈতিক প্রতিবেদনে নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে। রাজনীতি আরও জটিল হয়ে উঠছে এবং এই জটিলতা বুঝতে রাজনৈতিক প্রতিবেদন সাধারণ পাঠককে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করছে।

রাজনৈতিক প্রতিবেদনে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শুধু প্রাসঙ্গিক তথ্য দিলেই কাজ শেষ হয় না, উপস্থাপিত তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে হয়। বিশ্লেষণ করে ঘটনার তাৎপর্যকে তুলে ধরেন অভিজ্ঞ প্রতিবেদক। সাধারণ পাঠক সহজভাবে বুঝতে পারেন জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। অনেক সময় নেতৃত্ব প্রদানকারী দলের মধ্যেও বিরোধ দেখা যায়, চরমপন্থী ও নরমপন্থী নেতাদের মতপার্থক্য তৈরি করে সংকট। বি জে পি-তে বাজপেয়ী ও আদবানীর মধ্যে এরকম বিরোধ অনেক সময়ই কাগজে খবর হয়েছে। যদিও রাজনৈতিক দলে অন্তর্বিরোধ থাকেই। রাজনৈতিক প্রতিবেদক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিরোধের তাৎপর্য ও তার ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস ফুটিয়ে তোলেন। প্রথম সারির বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে বহু বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। এ সব নিয়েও প্রতিবেদক বিশ্লেষণধর্মী খবর তৈরি করেন।

রাজনৈতিক প্রতিবেদনের আরেকটি উপাদান হল ব্যাখ্যা। জটিল পরিস্থিতি ব্যাখ্যা ছাড়া বোঝা যায় না। প্রতিবেদক বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেন। যে-কোনো বিষয়কে ভালোভাবে বুঝতে ব্যাখ্যা প্রভূতভাবে সাহায্য করে। বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির বিতর্ক, গুজরাটে দাঙ্গার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মহিলা সংরক্ষণ বিলের আইনগত বৈধতা বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা করতেই হবে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্কের বিন্যাস তৈরি হয় তার স্বরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই

ফুটে ওঠে। পাঠক বিষয়টি সহজভাবে বুঝতে পারে।

একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক প্রতিবেদন লেখা হয়। এই দৃষ্টিকোণ প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত নয়। যে কাগজের হয়ে তিনি লিখছেন সেই কাগজের নীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এই দৃষ্টিকোণ। যেমন গুজরাটের দাঙ্গার ওপর প্রতিবেদনে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ বহু প্রতিবেদককে প্রভাবিত করেছিল। কীভাবে একটি বিষয় উপস্থাপিত হবে তা ঠিক করে এই দৃষ্টিকোণ। কোনো অবস্থাতেই এই দৃষ্টিকোণ পক্ষপাতকে সমর্থন করে না। যথাসম্ভব নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে এই দৃষ্টিকোণকে পরিচালিত করা প্রয়োজন। অপরাধ জগতের সঙ্গে রাজনীতিকদের যোগাযোগের ওপর খবর করতে গেলে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থাকা দরকার। দৃষ্টিকোণটি হতে পারে বিষয়টির প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। পাঠককে সব সময় এই যোগাযোগের কুপ্রভাবের দিকটির কথা বলা প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রতিবেদন এভাবেই জনমত গঠন করে।

মানবাধিকার:

বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এই অধিকারটিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বাধীনভাবে মানুষ জীবনধারণের অধিকার ভোগ করবে। ভারতের সংবিধানেও ১৯ নং ধারায় এই অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালের জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার ঘোষণাতেও মানবাধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘোষণায় বলা হয়েছে ''No one shall be subject to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.'' (Art.12)

তত্ত্বগতভাবে জীবনধারণের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকার করা হলেও, বাস্তবে প্রায়শই এই অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং অধিকার লঙ্ঘন মানবসভ্যতার গভীর সংকট বলে বিবেচিত হয়। সবচেয়ে মর্মান্তিক করুণ সত্য হল মানবাধিকার লঙ্ঘন সর্বদেশে সর্বদাই নিন্দিত। আর যে বিষয় নিয়েই বিতর্ক থাক মানবাধিকার নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। দলমত নির্বিশেষ সকলেই মানবাধিকার লঙ্ঘনকে জঘন্যতম অপরাধ বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিনিয়ত এই অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আর অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উঠে আসছে সংবাদপত্রের পাতায়। এই সমস্ত মর্মান্তিক খবর পড়ে আমরা শিহরিত হই। রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়, সংবাদপত্রে লেখা হয় তীক্ষ্ম সম্পাদকীয়। কিন্তু তারপর ঘটতে থাকে একই ঘটনা। আবার সংবাদ, পুনরায় হই-চই।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে কার্যকরী প্রথম প্রতিরোধ হল বিষয়টি জনসমক্ষে নিয়ে আসা। মানুষের বিপন্নতার কথা মানুষকে জানানো। মানুষ জানলেই প্রশ্ন উঠবে, প্রতিকারের পথ খোঁজার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে। তৈরি হবে জনমত, যা সর্বতোভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রথম কার্যকরী লড়াইটা শুরু করে সংবাদপত্র। সংগ্রামের কথা উচ্চারণ না করেই, মানুষের

কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি পৌঁছে দিয়েই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপানটি তৈরি হয়। জাতিপুঞ্জের সনদে বলা হয়েছে 'Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.' (Art-19)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে, ইতালিতে ও স্পেনে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ইহুদি, কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসারী মানুষদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে ইহুদিদের। ফ্যাসিস্ত জমানায় গণহত্যাই হয়ে উঠেছে নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতিপদে লঙ্ঘিত হয়েছে মানবাধিকার। এসব আমরা জেনেছি সংবাদপত্রের দেওয়া খবরে। সমগ্র পৃথিবীর জনমত ধিক্কার দিয়েছে হিটলার, মুসোলিনি ও ফ্রাংকোকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদের অবসান হয়েছে। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘন শেষ হয়নি। দেশে দেশে রাজনৈতিক শক্তির মদতে, মৌলবাদের প্ররোচনায় মানবাধিকার হয়েছে বিপন্ন।

ভিয়েৎনাম, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, হাঙ্গেরি, বাংলাদেশে, বসনিয়ায় ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। গণহত্যায় লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। নিষ্ঠুর অত্যাচারে বিপন্ন হয়েছে মানুষের জীবন। স্বাধীনভাবে জীবনধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে মানুষ। নিদারুণ এই সমস্ত বাস্তব সত্য আমরা জানতে পেরেছি খবরের কাগজ পড়ে। এই সমস্ত জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছে জনমত। সারা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষ প্রতিরোধে সামিল হয়েছে।

ভিয়েৎনামে যে ভয়ানক ধ্বংসলীলা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী মানুষের কাছে আবেদন রেখেছেন ব্রাট্রান্ড রাসেল তাঁর 'ওয়ার ক্রাইমস ইন ভিয়েৎনাম' গ্রন্থে। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, শিকাগো ট্রিবিউনের মতো বিখ্যাত কাগজের প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে রাসেল তাঁর যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। সংবাদপত্রের যে সমস্ত উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার মূল বক্তব্যই ছিল ভিয়েৎনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলা। আগ্রাসী মার্কিন আক্রমণে কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, নিরপরাধ শান্তিকামী জনজীবন যুদ্ধের ভয়াবহতায় শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই চিত্রিত হয়েছে। মানুষ জানে না কেন তাদের ন্যূনতম মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিধ্বংসী ন্যাপাম বোমায় গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। সদ্যজাত শিশুও সেই আগুন থেকে রেহাই পায়নি। রাসেলের বই ভিয়েৎনাম যুদ্ধ বিরোধী জনমত গঠনে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল। স্মরণ রাখা দরকার যে সমস্ত প্রতিবেদন রাসেল ব্যবহার করেছিলেন তার অধিকাংশই ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপরে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটিই ছিল শান্তিকামী মানুষের ন্যূনতম জীবনধারণের অধিকারের ওপর নির্বিচার আক্রমণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাগজেই এই আক্রমণের খবর নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবেদনে মানবাধিকারের বিষয়টিই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি সার্বজনীন। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় তা আবদ্ধ থাকে না। ইউরোপ,

আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা সমস্ত দেশেই প্রতিনিয়ত মানবাধিকার বিপন্ন হচ্ছে। সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার, পুলিশি হেপাজতে বন্দির ওপর অত্যাচার, দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘু মানুষের ওপর আক্রমণ, শিশু ও নারীদের ওপর বর্বর অত্যাচার হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত। যখনই এমন ঘটনা ঘটে, সংবাদপত্রে তা জায়গা পায়। প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক দল সবাই নড়েচড়ে বসে। মানবাধিকার সম্পর্কে প্রতিবেদনের এটাই সবচেয়ে বড়ো ইতিবাচক দিক। গুজরাট দাঙ্গা, ট্রিমোরে, রয়াণ্ডায় গণহত্যা, বসনিয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের মাধ্যমেই আমাদের গোচরে এসেছে।

সমস্ত সংবাদপত্রই মানবাধিকার নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। সমস্ত দেশের সংবাদপত্রই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। কয়েক বছর আগে ব্রাজিলের রাস্তায় বসবাসকারী অল্পবয়েসী ছেলেদের ওপর নেমে এসেছিল নির্মম পুলিসি আক্রমণ। অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে ব্রাজিলের পুলিস নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নিকেশ করার চেষ্টা করেছিল এই কিশোর অপরাধীদের। খবরের কাগজে এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবেদন পড়ে শিহরিত হয়েছে মানুষ। গুজরাট দাঙ্গার সময় ভারতবর্ষের সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল বিস্তৃত কভারেজ দিয়েছে। এর প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। পার্লামেন্ট থেকে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে এর প্রভাব। বেষ্ট বেকারি মামলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শিশু, নারীদের ওপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ ঘটছে। অবর্ণনীয় অত্যাচার নেমে আসছে শিশু শ্রমিক ও গৃহবধূদের ওপরে। সামান্য অপরাধে শিশু শ্রমিকের ওপর চলে নিদারুণ অত্যাচার। পণের জন্য পুড়িয়ে মারা হয় গৃহবধূদের। সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিনই এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়।

মানবাধিকার প্রতিবেদনের মধ্যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ দুটি দিকই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। যে-কোনো প্রতিবেদনে বর্ণনা থাকে। কী ঘটেছে তা প্রতিবেদক ফুটিয়ে তোলেন বর্ণনার মাধ্যমে। বাক্যের পর বাক্যে ফুটিয়ে তোলা হয় ঘটনার নাটকীয়তা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা অথবা সরকারি সূত্রের উৎস ধরে ঘটনায় যুক্ত সকল অনুষঙ্গকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। পাঠককে জানানো হয় কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হল। ইরাকে আবু ঘ্রাইবে ইরাকি বন্দিদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল তা মানুষ জানতে পারে প্রতিবেদন পড়ে ও টেলিভিশন কভারেজ দেখে। বর্ণনার সঙ্গে থাকে উদ্ধৃতি যা ঘটনার প্রামাণিক সততাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রতিবেদনের আর একটি দিক হল বিশ্লেষণ। মানবাধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন সাধারণত বেশি জায়গা নিয়ে প্রকাশিত হয়। বর্ণনার মধ্য দিয়ে, উদ্ধৃতির প্রয়োগে যে পরিস্থিতি তুলে ধরা হয় তার তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কার্যকারণ ও ঘটনার প্রভাব সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পাঠককে পরিস্থিতি বুঝতে এই বিশ্লেষণ খুবই সাহায্য করে। গণহত্যার ওপর প্রতিবেদনে শুধু ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ থাকে না, কী কারণে ঘটনাটি ঘটলো ও বিভিন্ন স্তরে ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়া কী হল তার উল্লেখও থাকে। প্রতিবেদক ঘটনার তাৎপর্যটিকে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেন। গুজরাট দাঙ্গার ওপর অনেক প্রতিবেদনে বিশ্লেষণের প্রয়াস ছিল।

বর্তমানে সংবাদপত্র শুধু গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী নয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক সুসাম্য, পরিবেশ রক্ষা ও মানবাধিকারকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। সর্বাঙ্গীণ সামাজিক কল্যাণের প্রতি সে দায়বদ্ধ। রাজনৈতিক কূটকাচালি, সংকট, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, দুর্ঘটনা প্রভৃতির বাইরেও সংবাদপত্রের কাজের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। আধুনিক সাংবাদিকতা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে সেগুলি হল লিঙ্গ-বৈষম্য, পরিবেশ ও মানবাধিকার।

মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে সমাজ আজ অনেক বেশি সচেতন। মানবাধিকার সুরক্ষিত করার জন্য তৈরি হয়েছে মানবাধিকার কমিশন। ভারতবর্ষে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে মানবাধিকার কমিশন তৈরি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে রয়েছে এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের মতন সংস্থা। এই কমিশনগুলিতে যে সমস্ত বিষয়গুলি আসে তার অধিকাংশই প্রথম খবর হয় সংবাদপত্রে। তারপর হইচই শুরু হয়। আইনসভা থেকে মানবাধিকার কমিশন পর্যন্ত গড়ায় এই সমস্ত ঘটনার জের। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা থেকে ভিখারি পাসোয়ানের অন্তর্ধান দিনের পর দিন খবর হয়েছে সংবাদপত্রে। জনমত তৈরি হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয় এ বিষয়ে। এটাই মানবাধিকার প্রতিবেদনের একটি ইতিবাচক দিক।

মানবাধিকার নিয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য প্রতিবেদকের বিশেষ প্রস্তুতি প্রয়োজন। মানবাধিকার বিষয়ে অসংখ্য আইন-কানুন রয়েছে। প্রতিবেদককে এই সমস্ত আইন-কানুন সম্পর্কে জানতে হবে। মানবাধিকার রক্ষার জন্য যে সমস্ত বেসরকারি সংস্থা আছে তাদের কার্যক্রম তিনি জানবেন। প্রতিনিয়ত এইসব সংস্থার সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। মানবাধিকার সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাবে এই সংস্থার কাছ থেকে। মানবাধিকার নিয়ে যারা আন্দোলন করছেন তাঁদের কাছ থেকেও সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে। পুলিস, আদালত ও আইনজীবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলা দরকার। কারণ মানবাধিকারের সঙ্গে এঁদের যোগ ঘনিষ্ঠ। যে-কোনো মানবাধিকার বিষয়ে সংবাদ করতে গেলে পুলিশের বয়ান, আদালতের সিদ্ধান্ত ও আইনজীবীদের মতামত অত্যন্ত জরুরি বলে বিবেচিত হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলে প্রতিবেদককে অনেক সময় অনুসন্ধান চালিয়ে বের করে আনতে হয় খবরের উপকরণ। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সরকারি কর্তৃপক্ষ চেপে যেতে চায়। কারণ জানাজানি হলে সরকারি ব্যর্থতাই প্রকাশ হয়ে পড়বে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। মানবাধিকার হরণ হলে বুঝতে হবে সরকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেনি। অনুসন্ধান চালাবার সময় প্রতিবেদককে অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হয়। যারা মানবাধিকার বিপন্ন করার জন্য দায়িত্বশীল তারা কোনো অবস্থাতেই সহযোগিতা করবে না। উপরন্তু পারলে বাধা দেবে। গুজরাট দাঙ্গার সময় প্রতিবেদকরা খবর করতে গিয়ে প্রচুর বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পাওয়া যায় না। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে প্রতিবেদককে আসল খবর বার করতে হয়েছে।

২২.৪ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে প্রতিবেদন রচনার বিভিন্ন মাত্রা, আঙ্গিক, স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক ধারণা তৈরি হবে।

একক ২৩ ❑ প্রতিবেদন রচনা

গঠন

২৩.১ উদ্দেশ্য
২৩.২ প্রস্তাবনা
২৩.৩ মূল বিষয়
২৩.৪ অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
২৩.৫ প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত
২৩.৬ কলাম ও ফিচার রচনা
২৩.৭ সারক্ষেপ

২৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।

- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষক সাংবাদিক-সংরূপ অর্থাৎ Journalistic Gcnre প্রতিবেদন বা Report কাকে বলে।
- প্রতিবেদন পরিভাষাটি যে মূল শব্দের অর্থ বহন করে তৈরি হয়েছে, তার উৎস কোথায় সেটি জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদন শব্দের নানা অর্থ।
- প্রতিবেদকের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।
- প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতিকে কোন্ কোন্ পর্যায়ে ভাগ করা যায়।
- প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য।
- প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি।
- প্রতিবেদন তৈরির সময় প্রতিবেদক হিসাবে কী মান্য।

- প্রকাশিত প্রতিবেদনের দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীরা তাদের আহৃত জ্ঞানকে প্রতিবেদন রচনার সময় কাজে লাগাতে পারবেন।

২৩.২ প্রস্তাবনা

যেদিক থেকেই আমরা বিচার করি না কেন, মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি হল প্রাথমিকভাবেই খিদে মেটানো। টিকে থাকার জন্যে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবৃত্ত করাই তার প্রথম লক্ষ্য। এর জন্যে মানুষ করতে পারে না—এমন কোনো কাজ নেই। ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবৃত্ত করার মতোই আর যে-একটা প্রবল তাগিদ মানুষ ভীষণভাবে অনুভব করে, সেটি হল খবরের খিদে মেটানো। বস্তুত মানবজাতির অস্তিত্বের মতোই প্রাচীন হল তার সংবাদ-অন্বেষা। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও কোন্‌খানে শিকারের পশু পাওয়া যাবে, কেমন করে তার পশ্চাদ্ধাবন হবে, কীভাবে দু-তিন জন মিলে বড়ো বড়ো প্রাণীকে খতম করা যাবে—সেই সংবাদ বিনিময় হত। এর বহু প্রমাণ রয়েছে উত্তর আফ্রিকার প্রস্তরচিত্রণ ও গুহাঙ্কনের মধ্যে।

সভ্যতার ঊষাকালে মানুষে-মানুষে সংবাদ সরবরাহ বা যোগাযোগের উপায় ছিল মূক-বধিরদের মতো ইশারার ভাষা বা ইঙ্গিত-ভাষা; পাহাড়ে, বালিতে কিংবা মৃত্তিকায় অঙ্কিত ভাষা। এখনও ঠিক নিশ্চিতভাবে বলা যায় নি, ঐ সময়ে একে অপরের কাছে নিজেকে বোঝানোর জন্য কতদূর পর্যন্ত মানবিক ভাষা ব্যবহার করত বা হত। যদিও আজ আর আমাদের অজানা নেই যে, ভাষা হচ্ছে মনের আয়না। তার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি পরস্পরকে, বুঝতে পারি মনের অলি গলি, ছুঁতে পারি ইচ্ছা-অনিচ্ছা-আবেগ-অনুভূতি। অবশ্য যতই মানুষ ভাষা তৈরি করুক, তার ক্রমাগ্রসরণ ঘটাক; তবু ভাষা মনের অখণ্ড দর্পণ, না আংশিক আরশি, সে বিষয়ে অনেকেরই সংশয় পুরোপুরি ঘোচেনি। একথাও তো সত্য, ভাষার মধ্যে রয়েছে অবয়বতত্ত্ব, স্বোপার্জন তত্ত্ব ও ব্যবহারিক তত্ত্ব।

যাই হোক, খাদ্যের মতোই মানুষের জীবনে সংবাদের প্রয়োজনীয়তা একান্ত বাস্তব ও অনিবার্য সত্য। জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে সেই সংবাদের চাহিদা পূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই মানুষের। যুগ যুগ ধরেই সংবাদের চাহিদা যেমন প্রতিষ্ঠিত সত্য, তেমনি তার তীব্রতাও উর্ধমুখী। আধুনিক মানুষ তো আধুনিকই নন সংবাদ ছাড়া। এমন কি মানবসভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলিও তো সেকালের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ও সংবাদই নিরন্তর পৌঁছে দিয়েছে, দিচ্ছে, দেবে হাজার-হাজার বছরের পরবর্তী উত্তরসূরিদের কাছে। তাই মানুষ যেমন খাদ্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, তেমনি সংবাদ ছাড়া বাঁচতে পারে না মানুষ। সংবাদের জন্য মানুষের এই অনিবার্য চাহিদা, নিরন্তর হাহাকারই সংবাদপত্রের উৎস। প্রতিবেদন হল তার অন্যতম প্রধান অস্ত্র, সংবাহ সংরূপ।

২৩.৩ মূল বিষয়

প্রতিবেদন কী?

'প্রতিবেদন' শব্দটি একটি পরিভাষা। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করি, যেমন, 'অধিষ্ঠায়কবর্গের নিকট বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন প্রেরিত হইয়াছে'। প্রতিবেদন' শব্দটি ইংরেজি 'Report'-এর বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ। 'রিপোর্ট' শব্দটির শিকড় রয়েছে লাতিন re-portart-র মধ্যে। সেখান থেকে প্রাচীন ফরাসিতে হল reportin, ইঙ্গ-ফরাসিতে reportour, তা থেকে ইংরেজিতে শব্দটি গৃহীত হয়েছে। রিপোর্ট শব্দটির অর্থ হল ফিরিয়ে আনা, আর রিপোর্টার বলতে বোঝায় যিনি রিপোর্ট করেন; সংবাদপত্র, বাক্‌প্রসার, দূরদৃশ্যধ্বনিবহ ইত্যাদির জন্য সংবাদের রিপোর্ট করেন যেসব চাকুরে। 'প্রতিবেদন' শব্দটি বিশেষ্য। অর্থ— বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনপত্র; রিপোর্ট। অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে, প্রতিবেদন শব্দটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নির্বাচিত। মানে হল-: বিবৃতি; সমাচার; বার্তা; বিবরণী report, পাশাপাশি 'প্রতিবেদক' শব্দের অর্থ 'সংঘটিত কার্য বা ঘটনার সংবাদদাতা reportert'।

সংবাদপত্রের মূল বিষয় হল প্রতিবেদন। প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংবাদ পরিবেশিত হয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় রিপোর্ট, বাংলায় তাই হল প্রতিবেদন। সংবাদপত্রে প্রতিবেদন রচনার দায়িত্বে থাকেন রিপোর্টাররা। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এসে রিপোর্টাররা প্রতিবেদন রচনা করেন। তারপর সেই প্রতিবেদন কপি সম্পাদনা- শেষে মুদ্রণযোগ্য হয়ে ওঠে।

রিপোর্টারদের কাজের দুটি স্তর। প্রথম স্তর সংবাদ সংগ্রহ করা। এটাই তাদের প্রধান কাজ। রিপোর্টার এমন খবর জোগাড় করবেন যা তার কাগজের পাঠক চান। অত্যন্ত দ্রুত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর জোগাড় করে আনাই রিপোর্টারদের অন্যতম কাজ। সংবাদ চেনার দক্ষতা তাদের পেশাগত নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। কিন্তু একজন দক্ষ ও সফল রিপোর্টারের শুধু আকর্ষক খবর যোগাড় করে আনলেই কি কাজ শেষ? না। সংবাদ সংগ্রহ করার পর সেই সংবাদকে লিখে ফেলতে হয়। রিপোর্টারদের লিখিত সংবাদই হল প্রতিবেদন। প্রতিটি রিপোর্টারকেই এই প্রতিবেদন রচনায় দক্ষ হতে হয়। এমনভাবে রিপোর্ট লেখা দরকার যাতে পাঠক পড়া মাত্রই সংবাদের বিষয় বুঝতে পারেন। বর্তমানে রিপোর্টাররা হলেন দক্ষ জ্ঞাপক (Coramunicator)। খুব দ্রুত সংবাদকে বোধগম্য করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন তারা। যত দিন যাচ্ছে সংবাদ প্রতিবেদন রচনা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কাজে উন্নীত হচ্ছে। আজকাল শুধু ঘটনার বিবরণ দিলেই চলে না, আধুনিক প্রতিবেদনে থাকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও গভীর বিচারবোধ। অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত। যে-কোনো বিষয়কেই আরও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনেক বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেই রিপোর্টারকে নামতে হচ্ছে অন্তর্তদন্তে। রিপোর্ট রচনার সময় সযত্নে এই তদন্তের ফসলকে বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করা দরকার। বহু তথ্যকে ঠিকভাবে

ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে ব্যবহার করতে হয়। কাজটা একেবারেই সহজ নয়। প্রতিদিনের চেষ্টায়, অভিজ্ঞতায় রিপোর্টার এই দক্ষতা অর্জন করেন।

প্রতিবেদন রচনার বিশেষ কয়েকটি দিক

জ্ঞাপন: প্রতিবেদন রচনার অন্যতম শর্ত হল জ্ঞাপন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক বুঝতে পারবে। সংবাদপত্রের পাঠক সবসময় যে উচ্চশিক্ষিত হবেন, এমন সম্ভাবনা নেই। বরং সাধারণ মানের পাঠক সংখ্যাই বেশি। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করেননি—এমন পাঠকের সংখ্যাও প্রচুর। একটা সাধারণ মানের শিক্ষা থাকলেই কাগজ পড়া যায়। প্রতিবেদন রচনার সময় রিপোর্টারের এ কথা মনে রাখতে হবে। এমন ভাবে লিখতে হবে, যাতে অল্প-শিক্ষিত মানুষেরাও প্রতিবেদন পড়ে সহজে বুঝতে পারে। কেদারনাথের কাছে তুষার ঝড়ে চার বাঙালি পর্যটকের মৃত্যুর ওপর প্রতিবেদনটি দেখলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

কেদারে মৃত ৪ বাঙালি

লখনউ, ২১ অক্টোবর: কেদারনাথের কাছে তুষার ঝড়ে প্রাণ হারালেন কলকাতার চার বাঙালি পর্যটক, আহত হয়েছেন তাদের তিন সঙ্গী, এদের একজন মহিলা। মৃতদের নাম ঃ সন্দীপ সরকার, সমীর চক্রবর্তী, নির্মলচন্দ্র রায় এবং সুধীর ভট্টাচার্য। রুদ্রপ্রয়াগের কাছে জলচৌমাসির পাহাড়ে ট্রেকিং করার সময়ে এই দলটি আজ আচমকা তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে বলে সরকারি সূত্রের খবর। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পি.টি.আই. (আনন্দবাজার পত্রিকা)

প্রতিবেদনটিতে মূল বিষয়টি খুব প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্লাস সেভেন এইটের ছাত্রও পড়ামাত্র বিষয়টি বুঝতে পারবে। সংবাদটিতে যে সমস্ত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি করে।

কী ঘটেছে (What) : তুষার ঝড়ে চারজন বাঙালি পর্যটক প্রাণ হারিয়েছেন। একজন মহিলা সমেত তিনজন আহত।

কোথায় ঘটেছে (Where) :কেদারনাথের কাছে রুদ্রপ্রয়াগে জল-চৌমাসির পাহাড়ে।

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কারা (Who) : চার বাঙালি পর্যটক যারা প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া তিনজন আহত হয়েছেন।

কখন ঘটেছে (When) : নভেম্বরের ২১ তারিখ।

কেন ঘটল (Why) : তুষারঝড়ের জন্য।

কীভাবে ঘটল (How) : জল চৌমাসির পাহাড়ে ট্রেকিং করার সময়ে আচমকা দলটি তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে।

ডেটলাইন: যে-কোনো সংবাদের শুরুতে ডেটলাইন থাকে। রিপোর্টার যেখান থেকে এবং যেদিন খবরটি পাঠাচ্ছেন তা উল্লিখিত হয় ডেটলাইনে। জায়গার নাম ও নিউজস্টোরি পাঠাবার তারিখকে ডেটলাইন বলা হয়। এখানে ডেটলাইন হল লখনউ, ২১ অক্টোবর। ডেটলাইন দেখে পাঠক বুঝতে পারেন কোথা থেকে প্রতিবেদনটি করা হচ্ছে এবং কবে সেটি পাঠানো হচ্ছে। সাধারণত কাগজে যে ডেটলাইন ব্যবহৃত হয় তা আগের দিনের। ওপরের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ২২ অক্টোবর। কিন্তু প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছিল ২১ তারিখ। এই তারিখেই কাগজ সংবাদটি পেয়েছে। পরের দিনের কাগজে সেটি ছাপা হয়েছে মাত্র। আজকে যা প্রকাশিত হচ্ছে, কাগজে তা প্রস্তুত হয়েছে গতকাল রাতে। খবর এসেছে তারও আগে। ডেটলাইন সংবাদকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। পাঠক সংবাদের উৎসস্থল কোথায় তা জানতে পারে।

বস্তুনিষ্ঠা : সংবাদ প্রতিবেদন রচনার অন্যতম ভিত্তি হল বস্তুনিষ্ঠা। যা ঘটেছে তাই বলছেন রিপোর্টার। নিজস্ব ব্যাখ্যা, মতামত সেখানে থাকছে না। নিজস্ব মতামত সরিয়ে রেখে তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন রচনাই হল রিপোর্টারের কাজ। এটা সার্থক ভাবে করতে পারলেই বলা যায়, তিনি বস্তুনিষ্ঠার নীতি মেনে চলছেন। অধিকাংশ ঘটনাই রিপোর্টাররা পরে জানতে পারেন। ঘটনা ঘটার বেশ কিছুক্ষণ বাদে কোনো বিশেষ সূত্র থেকে তারা খবর পান। প্রতিবেদনের মধ্যে সূত্রের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। কোথা থেকে রিপোর্টার খবর পেলেন তা জানিয়ে দেন। সূত্র যেমন— মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আমলা, পুলিস হতে পারে। কখনও সূত্র বেসরকারি হয়। অত্যন্ত গোপন কোনো খবর ফাঁস করার সময় অনেক সময় বিশ্বস্ত সূত্রের উল্লেখ করা হয়। আগের প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার কথা বলতে গিয়ে সরকারি সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রের কথা বললে পাঠকের কাছে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। প্রতিবেদনটি যে মনগড়া নয়, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল সূত্রের উল্লেখ।

সংবাদসংস্থার পাঠানো সংবাদ: সংবাদপত্রে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তার একটা বিরাট অংশ হল সংবাদসংস্থার সরবরাহ করা সংবাদ। আমাদের দেশের একটি বড়ো সংবাদ-সংস্থা হল প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, যাকে সংক্ষেপে আমরা পি.টি.আই. বলি। অন্য আর একটি বৃহৎ সংবাদ-সংস্থা হল ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে ইউ.এন.আই.। বিশ্বের বিখ্যাত সংবাদ সংস্থার মধ্যে অন্যতম এ.পি, ইউ, পি, আই., রয়টার, এ.এফ.পি, ডি.পি.এ ইত্যাদি। সংবাদপত্র যে সংবাদ-সংস্থার কাছ থেকে সংবাদ পায়, সাধারণত প্রতিবেদনের শুরুতে অথবা শেষে, সেই সংস্থার নাম উল্লেখ করে। কেদারনাথের তুষারঝড়ের ওপর যে প্রতিবেদনটি আলোচনা করেছি, সেটি পাঠিয়েছিল পি.টি.আই.। সংবাদের শেষে পি.টি.আই.-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

গতি: প্রতিবেদন রচনার সময় লক্ষ রাখা দরকার যাতে লেখার মধ্যে কোনোরকম শিথিলতা না

আসে। একটি রিপোর্ট শুধু ঘটনা বা ধারণার বর্ণনা নয়, ঘটনার সকল আবেশ ও প্রেক্ষিত যথাসম্ভব বজায় রেখে বিষয়বস্তুকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। পাঠক রিপোর্ট পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করবে ঘটনার উত্তেজনা, আবেগ, নাটকীয়তা। সব সময় এক ধরনের ক্রিয়াশীলতা উপস্থিত থাকবে। সকল ঘটনারই একটা নিজস্ব মাত্রা ও গতি থাকে। রচনা এমন হওয়া দরকার যাতে পাঠকের কাছে এই মাত্রা ও গতি পৌঁছে যায়। একটি দুর্ঘটনার ওপর প্রতিবেদন এমন হবে যাতে, পাঠক দুর্ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

দৃষ্টিকোণ: আজকাল সংবাদ প্রতিবেদন রচনার সময় অনেক সময় একটি বিশেষ দিকের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর যখন সংবাদ লেখা হয়, তখন ওই ঘটনার সমস্ত দিকের ওপর সমান জোর দেওয়া হয় না, এক-একটি কাগজ এক-একটি বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়— ইংরিজিতে একে বলে news angle। বাংলায় তা হল দৃষ্টিকোণ। রিপোর্টার প্রতিবেদন লেখার আগেই এই দৃষ্টিকোণ ঠিক করেন। একটি সংবাদকে বিশেষ পটভূমিতে স্থাপন করাই এর উদ্দেশ্য। রিপোর্টার জানেন পাঠক কী চান। প্রধানত পাঠকের পছন্দের কথা ভেবেই দৃষ্টিকোণ নির্ধারিত হয়। কাগজের প্রভাবও থাকে এই angle বা দৃষ্টিকোণ-এর ওপরে। যেমন কাশ্মীরের খবর পাকিস্তান ও ভারতের কাগজে একই ভাবে পরিবেশিত হবে না। দু-দেশের পাঠকের চাহিদা আলাদা, তাই সংবাদ পরিবেশনেও তারতম্য ঘটে।

অনুচ্ছেদ: প্রতিবেদনে অনুচ্ছেদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেদন ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদে ভাগ করে লেখা ভালো। সংবাদের টাইপ ধূসর। বেশিক্ষণ একটানা পড়া যায় না। অনুচ্ছেদ দিলে পড়তে সুবিধা। একটি অনুচ্ছেদের একটি নিউজ পয়েন্ট থাকবে। তাহলে পাঠক অনায়াসে সংবাদের বিষয় বুঝতে পারবে। একটি পয়েন্টের সঙ্গে আর একটি পয়েন্ট গুলিয়ে যাবে না।

সাহিত্যে অনুচ্ছেদের মাপ নির্ভর করে বিষয়ের উপরে। নতুন কোনো বিষয় শুরু হলে নতুন অনুচ্ছেদ শুরু হয়। নতুন অনুচ্ছেদের অর্থ হল নতুন বিষয়, নতুন ভাবের উপস্থাপনা। সাহিত্যে সাধারণত অনুচ্ছেদ বড়ো হয়। অনুচ্ছেদ এখানে বিষয়নিষ্ঠ। কিন্তু সাংবাদিকতায় সংবাদ পড়তে পাঠককে সাহায্য করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সংবাদের এক একটি পয়েন্টকে ছোটো ছোটো এক একটি অনুচ্ছেদে যদি পরিবেশন করা যায় তাহলে পাঠকের বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হয়। এছাড়া ছোটো অনুচ্ছেদ টাইপের ধূসরতা ভেঙে চোখকে আরাম দেয়। ছোটো অনুচ্ছেদের আর একটি বড় সুবিধা হল পৃষ্ঠাসজ্জার সময় সহজে জায়গা অনুযায়ী প্রতিবেদন কেটে ছোটো করা যায়। সংবাদ প্রকাশনায় পৃষ্ঠাসজ্জা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। প্রতিটি পৃষ্ঠাকে আলাদা করে সাজাতে হয়। প্রতিটি পাতায় যতগুলি সংবাদ প্রতিবেদন এবং অন্যান্য লেখা যাবে, সেগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাতে হয়। পৃষ্ঠাসজ্জার সময় অনেক সময় দেখা যায়, কোনো প্রতিবেদনের জন্য যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, তার তুলনায় প্রতিবেদনের আয়তন দৈর্ঘ্যে বেশি হয়ে যাচ্ছে। তখন তলা থেকে কিছু অংশ ছেঁটে ফেলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনুচ্ছেদ ছোটো হলে একটি-দুটি কম গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বাদ

দেওয়া সহজ হয়। নিচের দিকে কাটলে তো ক্ষতি নেই, কারণ নিচের দিকে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে ইনভারটেড পিরামিড সূত্র অনুযায়ী।

প্রতিটি অনুচ্ছেদ আলাদাভাবে পরিবেশিত হলেও সকল অনুচ্ছেদের মধ্যেই থাকবে একটা ঐক্য। সূচনা থেকে শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সংগীতের ছন্দের মতো প্রতিবেদনের গতি হবে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক। পাঠক অনায়াসে, দ্রুতগতিতে প্রতিবেদন পাঠ করে মূল সংবাদ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

শব্দ চয়ন: সংবাদের ভাষা সাহিত্যের ভাষার থেকে আলাদা। সংবাদের ভাষা মূলত বর্ণনা প্রধান। কার্যকরী জ্ঞাপনই প্রধান উদ্দেশ্য। খবর পাঠককে জানানোই রিপোর্টারের উদ্দেশ্য। সাহিত্যিকের মতো শিল্পরূপ নির্মাণের চেষ্টাও তার নেই, জীবন-জিজ্ঞাসার তাড়নাও নেই। শুধু যে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করছেন তা দ্রুত জানাচ্ছেন পাঠককে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে যে-কোনো বিষয় কাউকে জানাতে হলে শব্দ চয়ন ঠিক হওয়া দরকার। শব্দ নির্বাচনই বিষয় নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। শব্দ নির্বাচন যদি ঠিক হয়, বিষয় দ্রুত প্রকাশ পেতে পারে। কাগজ পড়েন সাধারণ মানুষ। শব্দভাণ্ডার তাদের সকলের বেশি থাকে না। সুতরাং এমন শব্দ ব্যবহার করা দরকার যা পড়ামাত্র মানুষ বুঝতে পারে। সহজ সরল প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করা উচিত। প্রতিদিনের কাজকর্মে কথাবার্তায় যে-ভাষা ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাতেই প্রতিবেদন লিখলে পাঠক সহজে বুঝবে। যেন পাঠককে অভিধান না দেখতে হয়। অপ্রচলিত ও কঠিন শব্দ ব্যবহার করলে পাঠকের পড়ার গতি শ্লথ হবে, সংবাদের বিষয় পরিষ্কার হবে না।

শৈলী: প্রতিবেদনের শৈলী হবে ঋজু, বাহুল্য-বর্জিত। বিশেষণ যথাসম্ভব প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রবন্ধে যুক্তিসিদ্ধ ভাবনাকে সুসংহত করে প্রকাশ করাই লক্ষ্য। শিক্ষিত লোকেরা প্রবন্ধ পড়ে। প্রবন্ধ পড়ার জন্য তাদের একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে। ভাবগম্ভীর ভাষা বুঝতে শিক্ষিত মানুষের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু কাগজ পড়ে সাধারণ মানুষ। বিষয় বোঝার জন্য সময় কম। তাই ভাষাকে সহজ, সরল, ঋজু করা দরকার। তবে সফট নিউজের ক্ষেত্রে আজকাল প্রতিবেদনের ভাষা সাহিত্যের কাছাকাছি চলে আসছে। প্রকাশভঙ্গিতে রূপক, উপমার ব্যবহার বাড়ছে। বর্ণনা সাহিত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠছে। আধুনিক সাহিত্যের ভাষা ঋজু, বাহুল্যবর্জিত। ছোটো ছোটো বাক্যেই শিল্পরূপের নির্মাণ হয় বর্তমান সাহিত্যে। এদিক দিয়ে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে কতটুকু সাহিত্যের মিশেল থাকবে, সেটা বোঝা প্রতিবেদকের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। সাহিত্য একটু বেশি হলেই প্রতিবেদনের বারোটা বেজে যাবে। সাহিত্যের ভার ব্যাহত করবে কার্যকরী জ্ঞাপনকে। মনে রাখা দরকার সাহিত্য ভাবায়, আর প্রতিবেদন জানায়। প্রতিবেদনের মূল ধর্মটুকু অক্ষুন্ন রাখা দরকার।

প্রতিবেদন রচনায় যদি সরল বাক্য ব্যবহার করা হয়, তবে তা সবচেয়ে নিরাপদ। সরল বাক্য সাধারণ মানুষ চট করে বুঝতে পারে। সরল বাক্যে সোজাসুজি বক্তব্য রাখা অনেক সহজ। মারপ্যাঁচ থাকে না। পাঠককে বিষয়টি নিয়ে দু'বার ভাবতেও হয় না।

তবে বিষয় ও ভাবনার ওপরই বাক্য গঠন নির্ভর করে। প্রয়োজনে যৌগিক ও জটিল বাক্যের ব্যবহার অনেক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাক্য যথাসম্ভব কর্তৃবাচ্যে লিখতে হবে। ভাববাচ্য বিষয়কে অনাবশ্যক জটিল করে তোলে। যেমন লেখা চলবে না : পুর কর্তৃপক্ষের দ্বারা আবার হকার উচ্ছেদ শুরু হচ্ছে। লিখতে হবে: পুরকর্তৃপক্ষ আবার হকার উচ্ছেদ শুরু করছে।

তৎসম শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো। দৈনন্দিন কর্মের জায়গায় দৈনিক কাজ, মূল্যের জায়গায় দাম, অগ্নিকাণ্ডের জায়গায় আগুন লাগে লেখা ভালো।

সংবাদ প্রতিবেদনের কপি লিখতে হয় সাদা কাগজের একদিকে যথেষ্ট স্পেস এবং মার্জিন দিয়ে। পাতার একদিকে লেখা হবে, অন্যদিকে কিছুই লেখা হবে না। মার্জিনের জায়গা রাখতে হবে, এবং যথাসম্ভব ফাঁক ফাঁক করে লিখতে হবে। এর কারণ হল প্রতিটি প্রতিবেদনের সম্পাদনা প্রয়োজন। সম্পাদনার সময় আবার অবর-সম্পাদক যদি কাটাকুটি করেন বা কিছু সংযোজন করেন, তার জন্য জায়গা রাখা দরকার। জায়গা থাকলে কাটাকুটি এবং অতিরিক্ত সংযোজন করা সহজ হয়। কম্পোজিটর অনায়াসে কপি পড়তে পারেন। ভুল কম হয়। তবে এখন প্রতিবেদন কমপিউটারে লেখা হয়। কপি সম্পাদনাও হয় কমপিউটারে।

রিপোর্টার প্রতিবেদনের শিরোনাম দেন না। তিনি যেটা দেন তাকে বলে স্লাগ (Slug)। কীসের উপর প্রতিবেদন লেখা হচ্ছে সেটা ওই স্লাগে নির্দেশ করা থাকে। স্লাগ হল একটি প্রতিবেদনকে চিহ্নিত করা। হেডলাইন ঠিক হয় সম্পাদনার সময়। অবর সম্পাদকেরা হেডলাইন বসান।

নিউজ পয়েন্ট ঠিকঠাক সাজানো: সংবাদ সংগ্রহের সময় রিপোর্টার নিউজ পয়েন্টগুলো টুকে রাখেন তার ছোটো নোটবুকে। প্রতিবেদন রচনার সময় এই নোটবুকই তার প্রধান ভরসা। যে-তথ্যগুলো তিনি সংগ্রহ করেছেন সংবাদ কভার করার সময় তার মধ্যেই রয়েছে নিউজ পয়েন্ট। প্রতিবেদন রচনার আগে ভেবে নেওয়া দরকার কীভাবে তিনি নিউজ পয়েন্টগুলোকে সাজাবেন। কোন্ পয়েন্ট আগে আসবে এবং কোন্ পয়েন্ট পরে আসবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে রিপোর্টারের বিচারবোধের ওপর। তবে রিপোর্টার পুরো ব্যাপারটা নিজের ইচ্ছেমতো করতে পারেন না। ঘটনা যা ঘটেছে তার দ্বারাই তার বিচারবোধ অনেকটা প্রভাবিত হয়। সাধারণত চূড়ান্ত পরিণতিকেই একেবারে প্রথমে আনা হয়। কারণ সংবাদের এটাই মূল বক্তব্য। তারপর অন্যান্য বিষয়কে বা পয়েন্টকে গুরুত্ব অনুযায়ী আনা হয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটলে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে ওই ঘটনায় মানুষের ক্ষতি হল কিনা। যদি কেউ মারা যায় তাহলে মানুষের মৃত্যুই সবচেয়ে আগে আসবে। কারণ সেটাই ঘটনাটির চূড়ান্ত পরিণতি। তারপর আসবে কোথায়-কেন কখন কীভাবে ঘটল ইত্যাদি। বিভিন্ন নিউজ পয়েন্ট থেকে সংবাদে মূল বিষয়টি চেনার ক্ষমতাই রিপোর্টারের বড়ো গুণ। একেই বলে সংবাদের নাক।

২৩.৪ অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতিকে অনেকগুলি সূক্ষ্ম স্তরে ভাগ করা গেলেও মোটা দাগে চার পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত বা বিন্যস্ত করা চলে। অবশ্য সর্বত্রই যে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নয়। কোনও কোনও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুবিধামতো পর্যায়গুলো ভাগ করে নেন, করেন কাজের বিলিবণ্টন। দায়িত্বও ভাগ করে দৈনন্দিন কাজ চালান। তবে যে-কটি স্তরে প্রতিবেদকের কাজ ভাগ না করলেই নয়, সেই পর্যায়গুলি এভাবেও বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমত ঘটনাস্থলে উপস্থিতি

↓

সংবাদসংগ্রহ

↓

তথ্যবাছাই (প্রমাণসহ)

↓

পরিবেশন বা বিতরণ ভাবনা

↓

প্রতিবেদন বা কাহিনি নির্মাণ

প্রতিবেদন তৈরির সময়ে প্রতিবেদককে খুবই সচেতন ও দায়িত্ববান থাকতে হয়। অন্তত প্রতিবেদকের কাছে সেটাই অভিপ্রেত। সংবাদের তথ্যে যাতে কোনোভাবেই বিকৃতি না ঘটে, সেটা খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। সততা ও সাহসিকতা হচ্ছে প্রতিবেদকের মেরুদণ্ড। তার সঙ্গে চাই ভাষাজ্ঞান ও শিল্পশৈলী। প্রতিবেদনের ভাষা হবে জীবন্ত। তা হবে বাস্তবধর্মী, সর্বজনবোধ্য অথচ শিল্পিত। এলিয়ে পড়া ভাষাভঙ্গি পাঠককে ঘুম পাড়ায়। কাজেই, ভাষার মধ্যে বলিষ্ঠতাও যেন ছড়িয়ে দেয় হীরের দ্যুতি— এটা নজর রাখতে হবে প্রতিবেদককেই। অকারণ বাগ্‌বিস্তার প্রতিবেদনে পরিত্যাজ্য। চটুল ভাষা প্রয়োগের সময় দেখতে হবে ভাষার সুর কেটে যাচ্ছে কিনা। একই কথা খাটে গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দের আধিক্য ঘটালে। মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্রের পাঠক আর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের পাঠক এক নন। অপশব্দের প্রয়োগ রুচিহীনতার পরিচায়ক, এটাও খেয়ালে রাখা দরকার। প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদককে সব সময়েই জানান দিতে হবে যে রিপোর্টার সমাজের বিবেক, গণতন্ত্রের প্রহরী। তিনি নির্ভীক, বস্তুনিষ্ঠ ও শিল্পী। কাউকে আঘাত দেওয়া প্রতিবেদককে মানায় না, তার কাজের মধ্যে তা পড়ে না। ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক

সংবাদ; যৌন-উত্তেজনা সঞ্চারক সন্দেশ; মাদকসেবনে উৎসাহবর্ধক বা মানসিক বিকৃতি জাগায় বা ছড়ায়, এমন খবরও প্রতিবেদনে জায়গা পাওয়া উচিত নয়। গুজব ছড়ানো থেকেও তিনি নিজেকে বিরত রাখবেন। 'একান্ত ব্যক্তিগত' বা 'ছাপানোর জন্য নয়' এরকম কোনও সতর্কিত বা প্রতিশ্রুত সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশ করা অনৈতিক। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়। উপরন্তু প্রতিবেদন রচনার সময় প্রেস ল', দেশের বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান, দ্বন্দ্বসহ বস্তুনিষ্ঠ সমাজ-উন্নয়নের ধারা, নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দেশ-সমাজ-জাতির বিভিন্ন রীতিনীতি-ঐতিহ্য- আইনকানুন পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন থাকা দরকার। দেশের নিরাপত্তা, জনগণের সংহতি মৈত্রী কল্যাণ প্রাপ্তি বিনষ্ট হয়, এমন কোনও খবরও প্রতিবেদনের বিষয় হওয়া অনুচিত। বরং এধরনের সংবাদ সর্বদা পরিত্যাজ্য। বৃত্তি হিসাবে সাংবাদিকতার কিছু নিজস্ব নৈতিকতাবোধ থাকে, সেগুলি প্রতিবেদকের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। সর্বোপরি প্রতিবেদক হবেন সত্যাশ্রয়ী। চটকদারি সংবাদ পরিবেশন করে সমাজ ও জাতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করার অধিকার কোনও প্রতিবেদকেরই নেই। তাকে হতে হয় সহিষ্ণু। আর প্রতিবেদককে মনে রাখতে হয়, সমস্ত প্রতিবেদনের মর্মবীজ হবেন মানুষ।

এবার সূত্রাকারে উল্লেখ করা যাক সেইসব বৈশিষ্ট্য যা প্রতিবেদনে অভিপ্রেত। তবে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে সব প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে এমনটি আশা করা সমীচীন হবে না। বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রাসঙ্গিকতা
- সর্বজনীনতা
- বিশ্বাসযোগ্যতা
- দায়িত্বসচেতনতা
- বহুগুণতা
- সমকালীনতা
- তৎপরতা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে তাদের ভাগ করতে পারি। অবশ্য প্রত্যেকটি পর্যায়কে আবার অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ ছাড়াও থাকে প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক প্রতিবেদন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন হয় নিম্নরূপে—

- ঘটনা, দুর্ঘটনার প্রতিবেদন
- জনকল্যাণমুখী বা জনস্বার্থবিরোধী কোনো প্রকল্পের বা কাজের প্রতিবেদন

- রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি সভা-সমাবেশ-আন্দোলন-উৎসবের প্রতিবেদন
- ক্রীড়া-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য-পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদন
- সম্পাদকীয় প্রতিবেদন
- বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন
- কোনো কর্মকাণ্ডের তদন্তভিত্তিক প্রতিবেদন।

২৩.৫ প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত

প্রশিক্ষণ ছিল, তবু হিমালয়ের তুষার ঝঞ্ঝায় মৃত্যু ৪ জনের

স্টাফ রিপোর্টার : পাহাড়ে অভিযান করার মতো যথেষ্টই প্রশিক্ষণ ছিল, অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম ছিল না। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর হাতছানি এড়াতে পারলেন না কলকাতার চারজন অভিযাত্রী।

ওই চারজন ভবানীপুরের ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন নামে যে সংস্থাটির সদস্য ছিলেন, সেই সংস্থা ২৪ বছর ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় অভিযান করেছে। এবারেও তাদের ৭ জন অভিযাত্রী হিমালয়ে ট্রেকিং-এর জন্য গত ৬ অক্টোবর কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলেন। তাদের যাওয়ার কথা ছিল কোটমা থেকে কেদারবদ্রী। ৭ দিনের এই দুর্গম পথে এই অভিযাত্রীদের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সংস্থার সম্পাদক সন্দীপ সরকার (৪৯)-এর উপরে। এলগিন রোডের একটি বেসরকারি স্কুলের সহকারী হিসাবরক্ষক অবিবাহিত সন্দীপবাবুর ধ্যান জ্ঞান ছিল পাহাড়। দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে বেসিক এবং অ্যাডভান্স, দুটি কোর্সেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। এর সঙ্গে তার ছিল দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ে অভিযান করার অভিজ্ঞতাও। কিন্তু হিমালয়ের খেপা তুষারঝড়ের কাছে শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়ে গেল।

হিমের পরশ নিয়ে অবশেষে সত্যিই হেমন্ত

বিশেষ সংবাদদাতা : হঠাৎ করেই ফিরে এল হিমেল হেমন্ত। বাতাসে টান টান ভাব। ফ্যান আর ফুল স্পিডে চালাতে হচ্ছে না। খুকখুক কাশি। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা শীতের আমেজ। শরত কালটা এ বার বোঝাই যায়নি। ভাদ্র-আশ্বিন জুড়ে ছিল বর্ষা। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বর্ষা বিদায় নিতেই ভাদ্রের গরমে মানুষ ঘেমে নেয়ে একাকার। এর মধ্যেই হানা দিয়েছিল নিম্নচাপ। তাই হেমন্ত যে এসেছে, তা বোঝাই যাচ্ছিল না। মঙ্গলবার থেকেই আবহাওয়া পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। সকাল থেকেই বইছে উত্তুরে হাওয়া। বুধবার সকালেও উত্তুরে হাওয়ায় পাওয়া গিয়েছে হিমের পরশ।

এ দিকে বঙ্গোপসাগরে ফের হানা দিয়েছে নিম্নচাপ। তাই আজ, বৃহস্পতিবার আকাশ মেঘলা থাকার

সম্ভাবনা। আকাশে মেঘ থাকলে রাতের তাপমাত্রা আর কমবে না। মানুষ আর মেঘবৃষ্টি চাইছেন না। মশার জ্বালায় মানুষকে রাতের বেলায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে মশারির তলায়। এন. টি. পি. সি-র গণ্ডগোলে রোজই চলছে লোডশেডিং। তাই মানুষ শীত চাইছেন। শীতে লোডশেডিং জ্বালাবে না। কমবে মশার হানাও।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদেরা অবশ্য জানিয়েছেন, এখনই গরম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। কয়েকটা দিন ঠান্ডা-গরম মিলিয়ে চলবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

২৩.৬ কলাম ও ফিচার রচনা

সংবাদ ছাড়া অন্যান্য যে রচনা সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল কলাম ও ফিচার। এই লেখাগুলি তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক মতামত নির্ভর রচনা। সাম্প্রতিককালে পাঠকদের কাছে এই রচনাগুলি ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

কলাম:

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কলাম প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকতায় পুরোপুরি ব্যক্তিগত রচনা হল কলাম। একেবারে পারসোনালাইজড রচনা। লেখকের নিজস্ব মতামতই হল এই রচনার সম্পদ। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সমসাময়িক ঘটনা বা ইস্যুকে পর্যালোচনা করেন। নিজের বিচারবোধ, মতামতকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন। পাঠক রচনাটি পড়ে ভাবেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে একটি বিষয়কে বোঝার চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক জন হোয়েনবার্গ (John Hohenberg) কলামকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘‘Column appears at regular intervals on the editorial page of major newspapers and is widely syndicated.’’ কলাম নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশিত হয়। সপ্তাহে একদিন প্রকাশিত হতে পারে। পনেরো দিন অন্তরও একটি কলাম বেরোতে পারে। অশোক মিত্র, খুশবন্ত সিং-এর কলাম টেলিগ্রাফে সপ্তাহে একদিন প্রকাশিত হয়। হিন্দুতে সেবন্তি নাইহানের কলাম, রামচন্দ্র গুহের কলাম পনেরো দিনে একবার প্রকাশিত হয়।

কলাম যিনি লেখেন তাঁকে বলা হয় কলামনিষ্ট। একেকজন কলামনিষ্ট বা কলাম লেখক একেক ধরনের বিষয়ের ওপর লেখেন। কলামনিষ্ট হলেন একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। যে বিষয়ে তিনি কলাম লিখছেন সে বিষয় তিনি খুব ভালোভাবে জানেন এবং বোঝেন তাই বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারেন, মতামত দিতে পারেন। যে সমস্ত বিষয়ের ওপর কলাম লেখা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদি। যেমন অশোক মিত্র অর্থনীতি বিষয় নিয়েই প্রধানত লেখেন। মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিকভাবে রাজনীতিও এসে পড়ে। আনন্দবাজারে গৌতম রায়, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় রাজনীতি নিয়ে লেখেন। আবার কয়েকজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক আছেন যারা সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয় নিয়ে একেবারে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে

আলোচনা করেন। বিশ্লেষণ করে যুক্তি সাজান। পাঠকরা তাঁর বিচারবোধের পরিচয় পান। কখনও সহমত হন। কখনও হন না। কলামনিস্ট সর্বদাই চেষ্টা করেন যুক্তিতর্ক দিয়ে পাঠককে বোঝাতে। তার নিজের মতের পক্ষেই পাঠককে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

স্পষ্টভাবে নিজের মতটা ব্যক্ত করলেও পাঠককে জোর করে প্রভাবিত করার কোনো রকম চেষ্টা তাঁরা করেন না। শুধু জানিয়ে দেন যুক্তি দিয়ে তাঁর অবস্থানের সঠিকতা। মতামত জানানোর পাশাপাশি তাঁরা একটি উপরি পাওনা দিতে চান। সেটা হল মজা, আনন্দ। প্রতিটি লাইনে এমন উপমা ব্যবহার করবেন, এমনভাবে যুক্তি সাজাবেন, এমন শব্দবন্ধ প্রয়োগ করবেন যা পাঠ করে পাঠকের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দেখা দেবে। কলাম পাঠ করাই হয়ে উঠবে এক মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা। সত্যি কথা বলতে গেলে এটাই কলামের সম্পদ। আর্ট বাখওয়াল্ডের কলাম, বুশবন্তসিং-এর কলাম, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলাম এই কারণেই জনপ্রিয়।

কলাম রচনার আঙ্গিক সংবাদ রচনার আঙ্গিক থেকে আলাদা। সংবাদ রচনা হয় উলটো পিরামিড রচনারীতি অনুসরণ করে। সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আগে, তারপর তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবেশিত হয়। কলাম রচনায় কিন্তু এই রচনারীতি অনুসরণ করা হয় না। রিপোর্টারের চেয়ে কলামনিষ্টের স্বাধীনতা অনেক বেশি। কীভাবে বিষয়বস্তুকে উপস্থিত করবেন, এটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। সাধারণ সাহিত্য রচনার নীতিই এক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য গল্প বলার মতো হঠাৎ শুরু করা হয়। কী বিষয় জানার জন্য পাঠক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এরপর সুন্দর রচনাশৈলী দিয়ে তাঁর বিষয় ভাবনা মেলে ধরবেন কলামনিষ্ট। বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য এমনভাবে অবতারণা করবেন যা পাঠককে ভাবাবে এবং একই সঙ্গে দেবে আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

কলামের মধ্যে চিন্তার গভীরতা থাকে। James M. Neal এবং Suzanne S Brown বলেছেন, কলামের মধ্যে থাকবে 'depth of thought and persuasive presentation'। কলামনিষ্টের অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ভাবনাই কলামের সম্পদ।

চিন্তা উদ্রেককারী ভাবনা কলামের মধ্যে নিহিত থাকে বলেই কলামের প্রতি সাধারণ মানুষের এত আকর্ষণ। একটি কলাম পাঠ মানেই আরও অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত হয়ে ওঠা। অত্যন্ত সরসভাবে এই ভাবনার নির্যাস কলামনিষ্ট পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। খুসবন্ত সিং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে যখন একের পর এক মন্তব্য করে চলেন তখন তা পড়ে আমরা শুধু জানি না, সকল ধর্মের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠি। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি করে উপলব্ধি করি। আর্ট বাখওয়াল্ড মণিকা লিউনেস্কি ও বিল ক্লিন্টনের সম্পর্ক নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তার কলামে। পড়ে যেমন মজা পেয়েছি তেমন সচেতন হয়েছি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অপব্যবহার সম্পর্কে।

কলামনিষ্ট সর্বদাই চাইবেন পাঠকের মনের ওপর ছাপ ফেলতে। যুক্তি দিয়ে, তির্যক মন্তব্য দিয়ে পাঠকের মন জয় করবেন। যে বিষয় নিয়ে লিখছেন তার গভীরে প্রবেশ করবেন। গভীর মননই তাঁর মূলধন। এমন মাত্রা থাকবে লেখায়, যা পাঠ করে মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করবে। শিক্ষিত পাঠককে বলামাত্রই কোনো কিছু গ্রহণ করানো যায় না। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে, মননশীলতা দিয়ে পাঠকের মনে রেখাপাত করে পাঠককে তিনি নিজের অবস্থানের সপক্ষে নিয়ে আসবেন।

ভাষার উপর থাকবে কলামনিষ্টের অসামান্য দখল। রচনাশৈলী হল কলামনিস্টের ইউ এস পি। একেকজন একেকভাবে তর্ক করেন। খুশবন্ত সিং, আর্ট বাখওয়াল্ড, অশোক মিত্র প্রত্যেকেই একেবারে নিজস্ব শৈলীতে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। একেকজনের একেকরকম স্টাইল। এই প্রকাশভঙ্গিই কলামকে অনন্য চরিত্র দেয়। আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করে বলে কলামনিষ্টদের বলা হয় 'blue eyed boys of newspaper'। সব কাগজই চায় আভিজাত্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে। যে কাগজে যত বেশি কলামনিষ্টরা লিখবেন সেই কাগজের তত বেশি আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রতিটা কাগজই চাইছে এক্সক্লুসিভ হয়ে উঠতে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আধুনিক সংবাদপত্র কলামের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে।

কলামনিস্টের গুণাবলি:

যে-কোনো দক্ষ সাংবাদিকের মতো কলামনিষ্টকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কী ঘটছে সেটা ভালোভাবে বুঝতে না পারলে, বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা যাবে না। পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজন বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। যে-কোনো বিষয়কেই বিশ্লেষণ করে সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হতে হয়। কলামনিস্টের তাই পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, একজন ভালো কলামনিস্টের তীক্ষ্ম বিচারবোধ থাকা দরকার। এটা থাকলেই তিনি সঠিক যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্য করতে পারবেন। পাঠককে বোঝাতে পারবেন একটি সমস্যা বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু কী। পাঠক যদি বোঝে তবেই তাঁর ভাবনার অংশীদার হতে চাইবে।

তৃতীয়ত, বহু তথ্যের মধ্যে থেকে শুধু প্রাসঙ্গিক তথ্যটুকু তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করবেন। তথ্যের প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলেই একটি রচনাকে পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়। মনে রাখা দরকার বেশি তথ্য হলে লেখা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। ক্লান্ত পাঠক লেখা পড়ার উৎসাহ হারাবেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা অধিক তথ্যের সমাবেশ রচনাশৈলীর স্বতঃস্ফূর্ততাকে নষ্ট করবে।

চতুর্থত, কলামনিস্টকে অবশ্যই গভীর মননশীল হতে হবে। তবে তাঁর এই গভীর চিন্তাশীল মননকে খুব সহজভাবে তুলে ধরা দরকার। লেখা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মনে অনুরণন উঠবে। পাঠকের সামনে খুলে যাবে নতুন জানলা।

পঞ্চমত, রচনাশৈলী হল কলামনিস্টের পরিচয়। লেখা পড়েই বোঝা যাবে কার লেখা। পাঠক এই শৈলীর

সঙ্গে পরিচিত থাকেন। লেখকের উপমার ব্যবহার, তির্যক মন্তব্যের ঝিলিক, বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যধর্মী রচনার ঔজ্জ্বল্য দেখে পাঠক চিনতে পারেন কলামনিস্টকে। অশোক মিত্র একভাবে লেখেন খুশবন্ত সিং অন্যভাবে পরিবেশন করেন। রচনাশৈলী হল তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়।

পরিশেষে যেটা বলা প্রয়োজন সেটা হল কলামনিস্টরা হবেন এক একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ। যিনি রাজনীতি নিয়ে কলাম লিখবেন, তিনি রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, খেলাধুলা নিয়ে যারা কলাম লিখবেন তাদের ওই সব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকবে। অভিজ্ঞতা কলামকে সমৃদ্ধ করে। পাঠকরা জানেন তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ফলে তার মতামতের, বিচারবোধের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

ফিচার:

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রে যে সমস্ত বিষয় প্রতিদিন প্রকাশিতহয় তার মধ্যে অন্যতম হল ফিচার। সংবাদে যেমন নতুনত্ব থাকে, ফিচারের মধ্যেও থাকে এক বিশেষ অভিনবত্ব যা দ্রুত মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সংবাদ যেমন নতুন কিছু জানায়, ফিচারও নতুন কিছু বলে, নতুন কোনো তথ্য সরবরাহ করে। তবে সংবাদের সঙ্গে ফিচারের একটা মৌলিক পার্থক্য হল সংবাদের মতো ফিচারকে টাটকা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সংবাদ একটু বাসি হলেই তার গুরুত্ব কমে। মানুষের কাছে কোনো আবেদন থাকে না। ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরবে সংবাদের গুরুত্ব তত হ্রাস পাবে। ফিচার এমন নয়। প্রয়োজন মতো ফিচার ছাপা যায়। দেরি হলে ক্ষতি হয় না।

ফিচার একটু বড়ো জায়গা নিয়ে প্রকাশিত হয়। দেড়-দু'হাজার শব্দে তৈরি হয় ফিচারের ইমারত। সঙ্গে থাকে ছবি, যা বিষয়ের উপস্থাপনাকে বর্ণময় ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। একটি বিষয়কে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করা হয় ফিচারে। অনেক তথ্য, মতামত ও বিচারবোধ থাকে ফিচার রচনায়। লেখক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখেন, পর্যালোচনা করেন। লেখার মধ্যে তাঁর বিচারবোধও থাকে। পরিবেশিত বিষয়ের সঙ্গে লেখকের যোগ অনেক গভীর। তাই ফিচারে অনিবার্যভাবে লেখকের নাম থাকে। অর্থাৎ ফিচার সর্বদাই বাই লাইনে লেখা হয়।

ফিচারের একটি বৈশিষ্ট্য হল মানবিক আবেদন। প্রধানত বর্ণনামূলক রচনার মধ্যে মানুষের মন, হৃদয় ছুঁয়ে যাবার উপাদান থাকতে পারে। মানুষের সংগ্রাম, ব্যথা-যন্ত্রণা, সাফল্যকে কেন্দ্র করে ভালো ফিচার রচনা হতে পারে। মসিদুর রহমান যখন ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ছিলেন তখন তাঁকে নিয়ে ফিচার লেখা হয়েছিল। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা মসিদুরকে দমাতে পারেনি। মনের জোর, দৃপ্ত অঙ্গীকারে তিনি কীভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন বিপদসংকুল ইংলিশ চ্যানেল পেরোবার জন্য তা পাঠকদের সামনে আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। মানুষের জীবনকেন্দ্রিক এরকম বহু মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ বিষয় নিয়ে ফিচার লেখা হয়েছে। যে-কোনো ফিচারই চায় মানুষকে নতুন অভিজ্ঞতা দিতে। ফিচারপাঠ সংবাদপাঠ নয়। সংবাদপাঠের চেয়েও বেশি কিছু পাওয়া যায় ফিচারে। একটি বিষয়কে গভীরভাবে জানা, বোঝা, উপভোগ করা সম্ভব ফিচারে। কলকাতার পুরনো খাবারের দোকান নিয়ে ভালো ফিচার তৈরি হতে পারে। পাঠকের স্মৃতি উসকে দিয়ে মন মাতানো

রসনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে ফিচার। ঢাকার খাবারের দোকান নিয়ে অমিতাভ মালাকার আনন্দবাজারে একবার অসাধারণ ফিচার লিখেছিলেন। ঢাকার কাবাব, বাখরখানি, পরোটা, ইলিশমাছের রকমারি রান্নার কথা ওই রচনায় যে কারুকার্য তৈরি করেছিল তার তুলনা নেই।

ফিচারের আঙ্গিক সংবাদ রচনার আঙ্গিক থেকে একেবারে আলাদা। সংবাদ প্রধানত উল্টো পিরামিড নীতি অনুসরণ করে লেখা হয়। প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং তারপর ক্রমশ কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবেশন করা হয় উল্টো পিরামিড আঙ্গিকে। ইনট্রো পড়লেই জানা যায় খবরের মূল বিষয় কী। ফিচারে কিন্তু সাহিত্য রচনার আঙ্গিক মেনে চলা হয়। বর্ণনা, নাটকীয় উপস্থাপনা বেশি গুরুত্ব পায়। হৃদয়, মন ছুঁয়ে যায় এমন বাক্যরচনা প্রাধান্য পায় ফিচারে।

ফিচার লেখকের থাকবে ঝরঝরে গদ্য লেখার ক্ষমতা। সহজসরল শব্দ, সঠিক উপমার ব্যবহারে ও ছোটো ছোটো বাক্যরচনায় তিনি হবেন দক্ষ। উপস্থাপনায় থাকবে নাটকীয়তা, একটু চমক। মাঝে মাঝে কৌতুকরস ঝিলিক দিয়ে উঠবে। একটু পড়ে পাঠক আরও একটু পড়তে চাইবেন। খিদে উসকে দেওয়ার মতো রচনাশৈলী আয়ত্ত করতে হবে লেখককে। মনে রাখতে হবে ফিচার কিন্তু কোনো অবস্থাতেই রম্যরচনা নয়। রম্যরচনার স্বাদ, লেখার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও ফিচার কিন্তু পুরোপুরি সংবাদধর্মী রচনা। রম্যরচনা হল সাহিত্য। লেখকের কল্পনাকে আশ্রয় করেই তৈরি হয় রম্যরচনা। ফিচার হল বাস্তব। সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় ফিচার। ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষাৎকার নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে লিখতে হয় ফিচার। বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলা ফিচারের একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতামত, অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। ফিচার রচনাকে বিশ্বাসযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে সাক্ষাৎকার।

ফিচারের শ্রেণিবিভাগ:

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফিচার লেখা যায়। বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী ফিচারকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখা যায়। এই শ্রেণিবিভাজন ফিচারকে বুঝতে ভালোভাবে সাহায্য করে। কখনো ব্যক্তি, কখনো ঘটনা অথবা বিষয় ফিচার রচনায় বিষয়বস্তু হয়।

ফিচারের শ্রেণিবিভাজন হল এইরকম: (১) সংবাদ ফিচার, (২) মানবিক আবেদন মূলক ফিচার, (৩) ধর্মবিষয়ক ফিচার, (৪) ভ্রমণ-ফিচার, (৫) বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে ফিচার, (৬) ফোটোফিচার।

(১) সংবাদ ফিচার: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে কেন্দ্র করে ফিচার তৈরি হতে পারে। ধনঞ্জয়ের ফাঁসি ছিল এক বড়ো খবর। ওই খবরকে কেন্দ্র করে অনেক কাগজেই ফিচার লেখা হয়েছিল। বধূ নির্যাতন খবর হয়। বধূ নির্যাতন নিয়ে ফিচার লেখাও যায়। ওই ফিচারে অনুসন্ধান চালিয়ে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় ফিচার রচনার স্টাইলে সংবাদ লিখতে পারে সাংবাদিক। সফট নিউজের পরিবেশন করা হয় ফিচার রচনার আঙ্গিকে। এ ধরনের ফিচারকেও বলা হয় নিউজ ফিচার বা সংবাদ ফিচার।

সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে সংবাদ ফিচার ছাপা হয়। যাই বড়ো খবর হয়ে উঠছে তাই নিয়েই তৈরি হচ্ছে সংবাদ ফিচার। শহরে যদি অপরাধের ঘটনা বেশি ঘটতে থাকে তাহলে ওই বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হবে সংবাদ ফিচার। ইভটিজিং বাড়লে ইভটিজিং নিয়ে ফিচার লেখা হয়।

(২) মানবিক আবেদনমূলক ফিচার: যে বিষয় মানুষের হৃদয় মন ছুঁয়ে যায়, আবেগকে প্রভাবিত করে, তাই হল মানবিক আবেদনজনিত বিষয়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যর্থতা, জয়-পরাজয় নিয়েই তৈরি হয় মানবিক আবেদনমূলক ফিচারের পটভূমি। একটি মাত্র পা নিয়ে যখন কেউ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে তখন তা হয়ে ওঠে মানবিক আবেদনমূলক ফিচারের বিষয়। এই ফিচার পড়ে আমরা যত না অবহিত হই, তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্দীপ্ত হই। আবার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া অসহায় মানুষের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করেও ফিচার লেখা হয়। মানুষের কষ্ট, হতাশা, লড়াই আমাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

(৩) ধর্মবিষয়ক ফিচার: ধর্মকে কেন্দ্র করে বহু লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ধর্মবিষয়ক ফিচার হল অন্যতম বিষয়। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, কুম্ভমেলা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে অনেক ফিচার লেখা হয়। মানুষ এই সব ফিচার অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ে অবহিত হয় এবং আনন্দ পায়।

(৪) ভ্রমণ ফিচার: ভ্রমণ নিয়ে সাধারণ মানুষের অসীম আগ্রহ। দূরের অজানা জগৎ সম্পর্কে জানতে চায় মানুষ। ভ্রমণকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ফিচার লেখা হয়, তাই মানুষকে অজানা জগতের খবর জানায়। কৌতূহলের অবসান করে। সব কাগজেই নিয়মিত এই ভ্রমণ ফিচার প্রকাশিত হয়। আকর্ষণীয় ছবিসহ এই ফিচারে ভ্রমণের বর্ণময় আস্বাদ পাওয়া যায়। পাহাড়, সমুদ্র, নগর জীবন নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তথ্য, অভিজ্ঞতা নির্ভর এই সমস্ত ফিচার রচনা দ্রুত মানুষের মন জয় করতে পারে।

(৫) বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে ফিচার: বিখ্যাত মানুষের কথা জানতে মানুষের আগ্রহ বেশি। যে মানুষ যত বিখ্যাত, সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও ততখানি। বিশেষ করে চলচ্চিত্র, সংগীত ও খেলোয়াড়দের ঝলমলে জীবন কাহিনি জানতে সাধারণ মানুষের অনেক কৌতূহল। সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ এটা ভালোই বোঝেন। তাই বর্তমানে সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ফিচারের সংখ্যা বাড়ছে। অমিতাভ বচ্চন, শচীন তেন্ডুলকর, রবিশংকরকে নিয়ে বহু ফিচার লেখা হয়েছে। এখন পেজ থ্রি সাংবাদিকতায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই প্রধান আকর্ষণ। তাঁদের জীবনের নানান দিক অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করা হয় ফিচারে। পাঠক এই সব লেখা পাঠ করে যত না অবহিত হন তার চেয়ে বেশি উপভোগ করেন।

(৬) ফটো ফিচার: একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেকগুলি আলোকচিত্র অর্থপূর্ণভাবে সাজালে একটি কোলাজ তৈরি হয়। গল্পের আভাষ ধীরে ধীরে বোঝা যায়। আলোকচিত্রের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত বিষয়টির তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। প্রবল বর্ষণে কলকাতার জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত এবং অচল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি কয়েকটি নির্বাচিত আলোকচিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বোঝানো সম্ভব। ক্যাপসান দিলে বিষয়টি আরও সহজে বোঝা যাবে। শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে 'বানভাসি কলকাতা'।

ফিচার রচনার কৌশল:

ফিচার রচনার আঙ্গিক সংবাদ রচনার আঙ্গিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সংবাদ রচনা হয় ইনভারটেড পিরামিড স্টাইলে। প্রথমে থাকবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তারপর আস্তে আস্তে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হবে। ব্যস্ত পাঠক একটি দুটি লাইন পড়েই আসল খবরের সন্ধান পান। কিন্তু ফিচার লেখা হয় অন্যভাবে। সাহিত্য রচনার আঙ্গিকই অনুসরণ করা হয়। বর্ণনামূলক কাহিনি বলার মেজাজ বজায় রাখার চেষ্টা থাকে। সংবাদ রচনার মতো দু-এক লাইনেই প্রধান বিষয় পরিবেশন করা হয় না। সাসপেন্স ধরে রেখে ধীরে ধীরে বিশেষ প্রেক্ষাপটে একটি বিষয়কে পরিবেশন করা হয়।

ফিচারের ইস্ট্রো লেখার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের ওপর। একটু নাটকীয়ভাবে শুরু করতে পারলে পাঠকের আকর্ষণ ভালোভাবে ধরা যাবে। একটি মন্তব্য, ঘটনা দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করলে পাঠকের টান টান মনোযোগ ধরে রাখা যাবে। বধূহত্যার ওপর ফিচারে একটি বধূহত্যার করুণ কাহিনি দিয়ে শুরু হতে পারে। পাঠক প্রথমে পাবে গল্পের আভাষ। কিন্তু একটু পরেই পাবে প্রচুর প্রাসঙ্গিক তথ্য ও বিবরণ যা তৈরি করবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষিত, তারপর বিষয়টিকে চমকপ্রদ ও নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করবে।

একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফিচার লেখা হয়। ফিচার লেখক আগে থাকতেই এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে। অনেক সময় একটি সমালোচনার ছায়া প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত থাকে। বধূহত্যার ওপর ফিচার লিখতে গিয়ে এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ ফিচার লেখক বজায় রাখেন।

ফিচার লেখা কোনো অবস্থাতেই প্রবন্ধ লেখা নয়। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়, রিপোর্টিং-এর মতো সরাসরি বক্তব্য হাজির করতে হবে। মানুষকে জানাতে হবে। বর্ণনামূলক রচনা লিখতে হবে। লেখকের পর্যবেক্ষণকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে তা করতে হবে আকর্ষণীয় ভাবে। যাতে পাঠক লেখাটি পড়তে আগ্রহ বোধ করে।

উত্তর সম্পাদকীয় :

উত্তর সম্পাদকীয় হলো ছোটো নিবন্ধ, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় রচনার পাশে পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী স্থানে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। আয়তন চার কলাম, শব্দ সংখ্যা ১০০০ থেকে ১২০০। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই লেখেন। সম্পাদকীয় রচনার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। সম্পাদকীয় হলো সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর, মতামত, তা বিশ্লেষণ যাই থাকুক না কেন সেটা সংবাদপত্রের নিজস্ব। যে কোনো বিষয়ে সংবাদপত্রের অবস্থান সেখানে উঠে আসে। কিন্তু উত্তর-সম্পাদকীয় রচনায় যিনি লিখছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত প্রতিফলিত হয়। এটাই উত্তর-সম্পাদকীয় রচনার বিশিষ্টতা বা সম্পদ বলা যেতে পারে। সাধারণত সাম্প্রতিক রাজনীতি, সামাজিক ঘটনা ও সমস্যা উঠে আসে এই ধরনের লেখায়। তবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, খেলাধূলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি শিল্প যে কোনো বিষয়ই উঠে আসতে পারে লেখায়। পাঠককে নতুন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিতি করিয়ে দেওয়াই এই রচনার উদ্দেশ্য।

পাঠকের চিন্তায় প্রভাব ফেলতে চায় লেখক। তাঁর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এখন হবে যাতে পাঠক নতুন ভাবনার খোঁজ পান। একটি বিষয়কে ভালোভাবে জানতে পারেন। জানা এবং বোঝা হাত ধরাধরি করে চলে। রচনা যদি পাঠকের মননে ছাপ ফেলতে পারে বা কোনোভাবে ভাবনাকে উস্‌কে দিতে পারে। তাহলেই বলা যাবে উত্তর সম্পাদকীয় রচনা সফল, এটাই তার সার্থকতা।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্য:

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের সম্পর্ক খুব কাছের। একেবারে হাত ধরাধরি করে চলার সম্পর্ক। চলচ্চিত্রের মধ্যে থাকে একটি আখ্যান যার উৎস সাহিত্য। প্রায় সব সফল ও সার্থক চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে গল্প বা কাহিনিকে আশ্রয় করে। বিখ্যাত সাহিত্য কীর্তিকে নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে এবং ঐ ছবি চিরায়িত চলচ্চিত্রের মর্য্যাদা পেয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী হল সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি। ভারতীয় সিনেমায় এই ছবি ইতিহাস তৈরি করেছে। পুডোভকিন গোর্কির মাদারকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। এরকম বহু বিখ্যাত সাহিত্য বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের হাতে পড়ে অসামান্য চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে। গল্প-উপন্যাসের বর্ণনা, চরিত্রের টানাপোড়েন, পরিস্থিতির নাটকীয়তা চলচ্চিত্রে গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। দর্শককে দিয়েছে শিল্পবোধের সূক্ষ্ম অনুভব। সাহিত্যপাঠে যে অভিজ্ঞতা পাঠক পায় তেমনই অসামান্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে সাহিত্যের চিত্ররূপ দেখে। তারাশঙ্করের 'জলসাঘর', 'অভিযান', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহানগর', রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় অসামান্য চলচ্চিত্র হয়ে দর্শকের মন জয় করেছে।

চলচ্চিত্র যে সবসময় বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তিকে আশ্রয় করে তৈরি হবে এমন নয়। চলচ্চিত্রকার অনেক সময় তৈরি করে নেন কাহিনির বিন্যাস, তারপর ঐ গল্প উঠে আসে চিত্রভাষায়, শট থেকে শটে, ধ্বনির মিশ্রণে নির্মিত হয় চিত্ররূপ। নায়ক, পিকুর ডায়েরিতে রয়েছে নিঃসঙ্গতার গল্প। দুটি ছবিই দু'ধরনের নিসঙ্গতা ফুটিয়ে তুলেছে। নায়কে রূপালী পর্দার প্রথম সারির এক নায়কের বিপন্নতা, নিসঙ্গতা দৃশ্যপরম্পরায় ফুটিয়ে তোলেন পরিচালক। এক অপরিচিত ব্যক্তির কাছে অকপটে নায়ক বলেন নিজের জীবন কাহিনি, সাফল্য, ব্যর্থতা, বিপন্নতার গল্প। শটের পর শটে ট্রেন যাত্রার প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় অনবদ্য চিত্রকল্প যা আমাদের দিয়ে যায় গভীর অনুভব। 'পিকু' ছবিতে পিকু ছবি আঁকে, রঙ করে। মা বাবার রাত্রে ঝগড়া করে। মা অবৈধ প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। পিকুর নিঃসঙ্গতা এক অন্য মাত্রা পায়। সত্যজিৎ রায়ের নিজের কথায় 'আমি মূল গল্পটি আগে বহুবার পড়ি, তারপর স্থির করি তার সারবস্তু কোথায়, তারপর গল্পটি সরিয়ে রাখি।' এরপর সত্যজিৎ গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনাকে অনুসরণ করে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব চিত্রভাবনা যা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে আমাদের যত না মুগ্ধ করে তার চেয়ে বেশি ভাবায়। সত্যজিৎ রায়ের চিত্রভাষা গল্পের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে যায়। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ভাষা একেবারে আলাদা। চলচ্চিত্র নিজের প্রয়োজন অনুসারে সাহিত্যকে ব্যবহার করে। সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ছবির জন্য বেছে নিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। বাংলা—সাহিত্যের এক অসামান্য কীর্তি। 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতি ও মানুষের অবস্থান তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বিষয় নির্বাচনে। 'পথের পাঁচালী'তে আমরা পাই মানুষের আশা আকাঙ্খা নিয়ে বেঁচে থাকার গল্প। আর এই গল্পের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে গ্রামবাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক নৈসর্গের মধ্যে। বিভূতিভূষণ কলমের আঁচরে যে কাব্য প্রতিমা তৈরি করেছেন, সত্যজিৎ তাকে ভিত্তি করে নিজের মতো করে দৃশ্যপট তৈরি করেছেন।

সবসময়ই যে তা সাহিত্য পাঠের নির্দেশ মেনে চলেছে এমন নয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'পথের পাঁচালী' বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপু-দুর্গার কাশফুলের বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি দেখার দৃশ্য। 'পথের পাঁচালী'র ওপরে তৈরি প্রায় বহু পোস্টারেই কাশফুলের বন, অপু-দুর্গার দৌড় এবং ধোঁয়া উড়িয়ে রেলগাড়ির ছুটে যাওয়ার ছবি দেখি। দেখা মাত্রই যে কেউ বুঝতে পারি এটা 'পথের পাঁচালী'-র পোস্টার। কিন্তু মজার বিষয় হল অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখার ব্যাপারটি বিভূতিভূষণের উপন্যাসে কোথাও ছিল না। সত্যজিৎ রায় এই দৃশ্যকল্পটি নিজেই ছবিটির প্রয়োজনে তৈরি করেছেন। এই দৃশ্যকল্প পথের পাঁচালী ছবির সম্পদ। অসাধারণ ভিসুয়াল এফেক্ট তৈরি করে। সম্পূর্ণভাবে চলচ্চিত্রকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্যই সত্যজিৎ রায় এই চিত্রকল্প ব্যবহার করেছিলেন। এতে সাহিত্যের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা হয়েছে আরও সমৃদ্ধ।

আনা কারেনিনা তলস্তরের প্রবাদপ্রতীম রচনা। প্রথম যুগে আনা কারেনিনার সমালোচনা করেছিলেন ভার্জিনিয়া উলফ। তিনি লেখেন চোখ এবং মাথা এক সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে না। আনা কারেনিনার মনের সৌন্দর্য্য একেবারেই ফুটে ওঠে না ছবিতে। চলচ্চিত্রে শুধু ভেসে ওঠে দাঁত, মুক্তো আর ভেলভেট। কারেনিনার মনের গহীনে যাবার কোন চেষ্টাই ক্যামেরা করে না। উলফের কাছে এটাই ছবির সীমাবদ্ধতা। তিনি চেয়েছেন সিনেমাকে নিজের প্রয়োজন মতো ইমাজারি তৈরি করতে দিতে হবে। নিজের ভাষায় সে পরিস্থিতিকে প্রকাশ করবে। তাহলেই সিনেমা সম্পূর্ণ নিজের মতো করে শিল্পরূপ নির্মাণ করতে পারবে।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্য উভয়ই আধুনিক মানুষের প্রিয় শিল্প। সাহিত্য বয়েসে অনেক প্রবীণ। চলচ্চিত্র সে তুলনায় অনেক নবীন। সাহিত্য শুধুমাত্র একজন মানুষের সৃষ্টি। তিনি লেখক, উপন্যাস এবং ছোটগল্প দুটি ক্ষেত্রেই লেখক রচনা করছেন কল্পনা এবং বাস্তববোধের মিশেল ঘটিয়ে জীবনের আখ্যান, যা পাঠ করে আমরা আনন্দ পাই। অনুভবে পাই শিল্পরূপের সন্ধান। চলচ্চিত্র কিন্তু পরিচালকের সম্পূর্ণ একার প্রয়াসের ফল নয়। বহু মানুষের অবদানে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। পরিচালক সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেন, নির্দেশে দেন কীভাবে তৈরি হবে শটের পর শট সাজিয়ে মন্তাজ। কোন সন্দেহ নেই তিনি হলেন ছবির স্রষ্টা। কিন্তু সাহিত্যের স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর কাজের ধারার প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালি, কলম, মন, লেখে তিন জন। এই তিন জন রয়েছে এক জনের মধ্যে, তিনি লেখক। চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে পরিচালকের সঙ্গে থাকেন চিত্রনাট্যকার, ক্যামেরাম্যান, সংগীত পরিচালক, সম্পাদক, মেকআপ ম্যান, শিল্প-নির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ইত্যাদি বহু মানুষ। এছাড়া মানুষের পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা। এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ছবি তৈরি হচ্ছে। পরিচালকের প্রযুক্তি বিষয়েও ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। সাহিত্যিককে বহু মানুষের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখতে হয় না। 'পথের পাঁচালী' যখন বিভূতিভূষণ লিখেছেন তখন তিনি একাই তৈরি করেছেন এই চিরায়ত শিল্পরূপটি। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছেন বহু মানুষের সমন্বয়ে। বংশী চন্দ্র গুপ্ত, সুব্রত মিত্র, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সবশেষে রবিশঙ্করের ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২৩.৭ সারসংক্ষেপ

এই এককে প্রতিবেদন সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি প্রতিবেদন রচনার বিভিন্ন আঙ্গিক, রিপোর্টারের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বেশ কিছু উৎদাহরণের সাহায্য প্রতিবেদন রচনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদন রচনা, সংবাদপত্র পরিচালনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ফিচার ও কলামের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য, বিভিন্ন ফিচারের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনার প্রকাশ পেয়েছে এই এককে। সংবাদ রচনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রাথমিকপর্বের ধারণা তৈরিতে এই এককগুলির ভূমিকা অবশ্য উল্লেখ্য।

প্রশ্নাবলী :

ক) বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১. সম্পাদনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. প্রতিবেদক, মুখ্য প্রতিবেদক, বিশেষ প্রতিবেদক, অবর-সম্পাদক, মুখ্য অবর-সম্পাদকের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. সম্পাদনার নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. পাঠ্যবিষয় হিসাবে সাংবাদিকতার বিশেষত্ব আলোচনা করুন।

৫. প্রতিবেদন রচনা সাংবাদিকের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা আলোচনা করুন।

৬. প্রতিবেদন তৈরির ধাপগুলি নিজের ভাষায় লিখুন।

৭. কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি শোকসংবাদ তৈরি করুন।

৮. প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৯. প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, আলোচনা করুন।

১০. 'পুলিশের সততা'—এই শিরোনাম ব্যবহার করে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি কল্পিত প্রতিবেদন রচনা করুন।

১১. ফিচার কাকে বলে? কোন কোন প্রকার ফিচার সংবাদপত্রে দেখা যায়? আলোচনা করুন।

১২. সংবাদপত্রে প্রকাশিত চলচ্চিত্র সমালোচনার গুরুত্ব কী? সম্প্রতি আপনার দেখা একটি চলচ্চিত্রের সমালোচনা করুন।

১৩. 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ভাষা একেবারে আলাদা'— আলোচনা করুন।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১. সম্পাদনার প্রয়োগ কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে?

২. সংবাদপত্রের খবর সংগ্রহের সূত্রগুলি উল্লেখ করুন।

৩. শিরোনাম রচনার গুরুত্ব কী?

৪. প্রুফ সংশোধন কে করেন?

৫. সাংবাদিকতা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন।

৬. 'NEWS' শব্দটির 'N', 'E', 'W', 'S'- হরফগুলি কোন কোন অর্থের কথা বোঝায়?

৭. রিপোর্টাজ বলতে কী বোঝেন?

৮. প্রতিবেদন শব্দটি কোন ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ?

৯. পি.টি.আই.-এর পুরো নাম কী?

১০. একজন ভালো প্রতিবেদকের যে-কোনো দুটি বিশেষত্ব উল্লেখ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. *সংবাদ প্রতিবেদন*—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

২. *প্রতিবেদন কৌশল*—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৩. *বিষয় সাংবাদিকতা*-—ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৪. *সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র ভাবনা*—ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৫. *সংবাদ ও সাংবাদিকতা*—কৃষ্ণ ধর

৬. *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা*—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭. *সাংবাদিকতার গোড়ার কথা*—এফ.ফ্রেজার বন্ড

৮. *সংবাদপত্রের রূপায়ণ*—শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৯. *গণ-জ্ঞাপন*—পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১০. *Professional Journalism* —M.V. Kamath

১১. *The Press* —H.W. Steed

১২. *Journalism*—Vladimir Hudec

১৩. *Mass Communication*—R.K. Chatterjee

১৪. *A History of Indian Journalism*—Mohit Moitra

নোটস্

নোটস্